Banglar Renaissance

সম্পাদনা : অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল : কার্তিক ১৩৬০
প্রকাশক : রেণুকা সাহা
দীপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর : দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স
৪/১/ই বিডন রো কলকাতা ৭০০০০৬

আঠারো উনিশশতকের
পথিকৃৎ চিন্তাবিদদের
উদ্দেশে

বিষয়সূচি

☐ বিষয়সূচি

☐ ইংরাজি প্রবন্ধগুলি অসীনকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

প্রকাশিত অন্যান্য বই

পল লাফর্গ

সম্পত্তির বিবর্তন

চার্লস ডারউইন

ডিসেণ্ট অব ম্যান

লুইস হেনরী মর্গ্যান

এনসিয়েণ্ট সোসাইটি

(দুই খণ্ডে)

রমেশচন্দ্র দত্ত

পিজ্যাণ্ট্রি অব বেঙ্গল

নির্মাল্য নাগ

শিল্প চেতনা

এন. এম. গোরচাকভ

স্তানিস্লাভস্কীর নাট্য পরিচালনা (রোমাণ্টিক নাটক)

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ)

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

গত দেড়শ বছরের রাজনৈতিক ছবির ইতিহাস,
ইস্তাহার, দলিল-নথিপত্র ও ছবির সংকলন

সন্তোষকুমার বসু

ভারতশিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ

অমিয় রায়চৌধুরী

চার্লি চ্যাপলিন—সিনেমা ও জীবন

গোলাম কুদ্দুস

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে

(বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

একলব্য

সম্বোধন

গেব্রিয়েল পেরী

রাতপ্রভাতের গান

বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে

১
ভূমিকা

বাংলার রেনেসাঁসের প্রকৃতি

ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের সূচনা হয় যা বাংলার রেনেসাঁস নামেই পরিচিত। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে প্রায় একশ বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাংলা অনেক এগিয়ে ছিল। তাই ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাকে তুলনা করা যায় ইউরোপিয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালির ভূমিকার সঙ্গে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাঙালীরা যে একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, তা মূলত আধুনিক কালে বাংলায় বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্যগত এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের এই বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। আজকের দিনে যখন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে অনৈক্যের বিপদ, তখন আমাদের অতীত কীর্তিকে স্মরণ করা, বিভিন্ন সংগ্রাম ও সাফল্যের পর্যালোচনা করাটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে ওঠে। এইসব কীর্তি, সংগ্রাম ও সাফল্য আমাদের এক গৌরবময় ঐতিহ্য, অথচ এগুলোকে আমরা প্রায় বিস্মৃতই হতে চলেছি।

পাঁচটি পর্যায়

এখানে আমরা শুধু ঘটনাবলীর একটা ভাসাভাসা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি এই বিষয়টি নিয়ে লিখিত কিছু সুপরিচিত গ্রন্থ থেকে। কিন্তু অন্যদের কাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ কোন পর্যালোচনাও বিষয়টির ভূমিকা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ-রকম একটা প্রাথমিক পর্যালোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য যুগটিকে আমরা পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি। পর্যায়গুলোর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে কমবেশি যথেচ্ছভাবেই।

১। ১৮১৫-৩৩ : সহজতম সূচনাবিন্দুটা হচ্ছে ১৮১৫ খিষ্টাব্দ, যখন রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তাঁর জীবনের আসল কাজগুলোয় গুরুত্বসহকারে হাত দেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে

ইংল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় এই পর্যায়টি। তিনিই ছিলেন এই পর্যায়টির অবিসংবাদি কেন্দ্রীয় চরিত্র।

২। ১৮৩৩ ৫৭ঃ রামমোহনের মৃত্যু থেকে শুরু করে ভারতীয় বিদ্রোহের সূচনা পর্যন্ত।

৩। ১৮৫৭-৮৫ঃ ভারতীয় বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।

৪। ১৮৮৫-১৯০৫ঃ কংগ্রেসের সূচনা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত।

৫। ১৯০৫-১৯ঃ বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন এবং নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয় পর্যন্ত।

২

১৮১৫-৩৩

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

আমাদের সমাজব্যবস্থার নিশ্চল, অধঃপতিত ও পচ্-ধরা অবস্থা সম্বন্ধে তীক্ষ্ম সচেতনতা, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন ঘটানোর আকাঙ্খা, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যের প্রাচীন প্রজ্ঞা উভয়ের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং চারপাশের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য বহুমুখী অক্লান্ত প্রচেষ্টা—এগুলোই ছিল রামমোহন রায়ের জীবন ও চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য।

সাফল্যের পরিমাণ ও গুণের ক্ষেত্রে অথবা কাজকর্মের পরিধির ব্যাপারে তাঁর সমসাময়িক কোন ব্যক্তিই রামমোহনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। নতুন চিন্তাভাবনা যে এক জীবনদায়ী প্রেরণার ভূমিকা পালন করতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা খুঁজে পাই তাঁর রচনাপত্রে। সাম্প্রতিককালে যাঁরা তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে আমাদের দেশে রেনেসাঁসের তাৎপর্য উপলব্ধি করার ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতারই প্রমাণ দিচ্ছেন।

সংশ্লেষণ

নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম চিন্তাধারার একটা সংশ্লেষণ ঘটিয়েছিলেন রামমোহন। তরুণ বয়সে বেনারসে থাকার সময় তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্য। পাটনায় থাকার সময় গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেছিলেন ফারসি ও আরবী ভাষা। বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে, “সমতলে এবং পার্বত্য অঞ্চলে” ভ্রমণকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে, এমনকি তিব্বতের বৌদ্ধ মতবাদ ও জৈন মতবাদের সঙ্গেও।

পরবর্তীকালে ইংরেজ চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেও তিনি আয়ত্ত করেন নিপুণভাবে। খ্রিষ্টিয় ধর্মীয় রচনাপত্রেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং সেই কারণে ইংরেজ ও আমেরিকান একেশ্বরবাদীদের শ্রদ্ধাও তিনি অর্জন করেছিলেন। বেন্থাম এবং রস্কো-র মতো অগ্রসর চিন্তানায়করা তাঁকে নিজেদের সমকক্ষ সতীর্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সম্মান জানিয়েছেন ফরাসী পণ্ডিতরাও ;

কিন্তু রামমোহন কোনদিনই নিজের দূরকল্পনার বন্ধডোবায় আবদ্ধ চিন্তাবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর দেশের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষক। মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্ভুল দিশাকে সামনে রেখে তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য নিরন্তর কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তিনি।

হিন্দু একেশ্বরবাদের পক্ষসমর্থন

বাল্যকাল থেকেই অযৌক্তিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর ছিলেন রামমোহন। সমালোচনার দাপটে উত্যক্ত হয়ে উঠতেন তাঁর মা-বাবা। কিছুটা বড় হয়ে ওঠার পরই তিনি পরিবারের থেকে আলাদা থাকতে শুরু করেন, কারণ তাঁর পরিবর্তিত অভ্যাস ও মতামতের সঙ্গে পরিবারের অমিল দেখা দিতে শুরু করে। তাঁর বয়স যখন ত্রিশের কোঠায়, তখনই তিনি ফারসি ভাষায় রচনা করেন 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার' (Gift to Monotheists)। এই রচনায় তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে সমস্ত ধর্মেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে একেশ্বর-বাদের দিকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ চিরদিনই তাদের নিজের নিজের বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ, উপাসনাপদ্ধতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিয়ে এসেছে এবং তার ফলে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম পৃথকই থেকে গেছে।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর ১৮১৫ সালেই তিনি গড়ে তোলেন 'আত্মীয় সভা'। এই সভার সূত্রে তাঁর চারপাশে জড়ো হয় কিছু অভিজাত ও নয়া-মধ্যবিত্ত উদারনীতিবাদী। রংপুরে কিছুদিন সরকারি পদে চাকরি করার সময় নিজের ঘনিষ্ঠদের নিয়ে যেভাবে আলোচনা-সভার আয়োজন করতেন, এখন কলকাতাতেও এঁদের নিয়ে ঠিক সেভাবেই নিয়মিত আলোচনা-সভার আয়োজন করতে শুরু করেন রামমোহন।

অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা ও করুণার দরুন প্রাচীন হিন্দুধর্মের আধুনিক বিকৃতিগুলোকে নীরবে সহ্য করে যেতেন রামমোহনের সমসাময়িক বিদ্বান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। কিন্তু রামমোহন এই বিকৃতিগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সাহসভরে। খোদ হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেই যে একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে, তা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে তিনি একটা সংক্ষিপ্তসার সহ বেদান্তের প্রামাণ্য বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং প্রধান পাঁচটি উপনিষদও অনুবাদ করেন বাংলাভাষায়। ফলস্বরূপ ১৮১৭ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে শঙ্কর শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর মতো গোঁড়া পণ্ডিতদের সঙ্গে এক প্রবল বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় তাঁকে। এই সময় তিনি এক গুচ্ছ বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলোয় নিজের বক্তব্যকে চমৎকারভাবে সপ্রমাণিত করেন তিনি।

যে পুরোহিততন্ত্র মানুষের সামনে প্রচার করত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্তিপূজার স্থূল ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থগুলোকে মাতৃভাষায় অনুবাদের চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত

করত, 'তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন রামমোহন। তাঁর এই প্রতিবাদ আমাদের প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি দেখিয়েছিলেন যে নির্বিচার ভক্তি সাধারণ মানুষের চরিত্রে একটা হীনতার জন্ম দিয়েছে। তাই মানুষকে এই "চাপ এবং দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ঘটানো"-কে নিজের কর্তব্য বলেই মনে করেছিলেন তিনি।

একেশ্বরবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা এবং সম্ভাব্যতার পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি মূর্তিপূজার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছিলেন, বলেছিলেন "এই মূর্তিপূজা সমাজের বিন্যাসটা ধ্বংস করে দেয়" এবং নৈতিক সংস্কারের কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এইসব যুক্তি পেশ করার সময় রামমোহন জোর দিতেন সাধারণ বুদ্ধির ওপর এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতেন অন্য নানান জনগোষ্ঠীর কথা। যে-কোন ধর্মগ্রন্থেই ভুল থাকতে পারে, এবং প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করার অধিকার মানুষের সহজাত, বিশেষত সেই প্রথা যদি "নীতিহীনতা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংস করার প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে ওঠে," তাহলে তো বটেই। এই হচ্ছে আমাদের দেশের রেনেসাঁসের যিনি পথিকৃৎ, তাঁর অবিস্মরণীয় শিক্ষা।

খ্রিশ্চান ধর্মের উদারনৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা

শুধুমাত্র একেশ্বরবাদকে নতুন করে তুলে ধরার মধ্যেই রামমোহনের নয়া-উদারতাবাদ সীমাবদ্ধ ছিল না। খ্রিশ্চান ধর্ম ও রীতিনীতি তখন আমাদের দেশে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এই ধর্ম ও তার রীতিনীতিকেও নতুন চোখে যাচাই করেন তিনি।

১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'যীশুর অনুশাসন' (Precepts of Jesus)। এই রচনায় তিনি যীশু খ্রিষ্টের নৈতিক বাণীর থেকে খ্রিশ্চান ধর্মের নির্দিষ্ট মতবাদকে ও অলৌকিক গালগল্পগুলোর ওপর বিশ্বাসকে আলাদা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, খ্রিশ্চান ধর্মের যা নৈতিক শিক্ষা, তা তার আধিবিদ্যক ঈশ্বর-তত্ত্বের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বক্তব্য শুনে খ্রিশ্চান ধর্ম-প্রচারকরা এই দুঃসাহসী অখ্রিশ্চানটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে রামমোহন ১৮২০ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে 'খ্রিশ্চানদের প্রতি আবেদন' শীর্ষক তিনটি নিবন্ধ লেখেন। খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকরা যে মানুষের একেবারেই অপরিচিত নানান অন্ধবিশ্বাস ও রহস্যময় বিষয়ের প্রচার করতেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। খ্রিশ্চান ধর্মের মূল শক্তি যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার নিদর্শন সম্বলিত খ্রিষ্টের জীবন-কাহিনীর বদলে ধর্মপ্রচারকরা বেশি করে জোর দিতেন খ্রিষ্টের চরিত্রের ওপরে—এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল রামমোহনের লেখনীতে। নিজের রচনা-পত্রে তিনি তাঁর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন বহু-ঈশ্বরবাদের ওপর। তাঁর

বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে শ্রীরামপুর মিশনের অ্যাডাম নামক জনৈক মিশনারি পরিণত হয়েছিলেন একেশ্বরবাদীতে।

১৮২১-২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত 'ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে' (Brahmanical Magazine) তিনি ভারতবর্ষের সর্বোত্তম ঐতিহ্যগুলোর প্রতি নিজের গভীর ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেন। সেইসঙ্গেই তিনি স্বদেশের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানান ধর্মান্তরণের কাজে ব্যাপৃত খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে, যারা "এদেশের দরিদ্র, ভীরু ও নিরহংকার বাসিন্দাদের" অধিকারে হস্তক্ষেপ করছিল এবং যুক্তিতর্কের পথ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছিল এদেশীয় ধর্মকে বিদ্রূপ করা আর ধর্মান্তরিতদের সামনে বিভিন্ন পার্থিব লাভের টোপ তুলে ধরার পন্থা।

হিন্দু একেশ্বরবাদের উন্নত চিন্তার পক্ষে দাঁড়িয়ে খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের মতবাদের বিভ্রান্তিগুলো উদ্ঘাটন করতে শুরু করেছিলেন রামমোহন। এত চমৎকারভাবে এই কাজটা করেছিলেন তিনি যার ফলে ইংরেজ ও আমেরিকান একেশ্বরবাদীরাও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রতি। এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় রামমোহনকে লেখা তাঁদের চিঠিপত্রের মধ্যে এবং রামমোহন সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন প্রশংসাসূচক মন্তব্যের মধ্যে।

খ্রিশ্চান ধর্মের প্রকৃত আদর্শের বিরোধী ছিলেন না রামমোহন। ভারতবাসীর ওপর এই আদর্শের এক শুভ প্রভাব আছে বলেই মনে করতেন তিনি। বাইবেলের সুসমাচারগুলোর বাংলা অনুবাদের কাজে শ্রীরামপুরের কয়েকজন মিশনারিকে তিনি সাহায্যও করেছিলেন। ১৮২১ সালে তিনি গঠন করেন 'একেশ্বরবাদী কমিটি' এবং অ্যাডামকে একজন খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকের ভূমিকাতেই রাখার ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের উপাসনামূলক কাজকর্ম, বিদ্যালয় এবং ছাপাখানা চালানোর কাজেও সাহায্য করতে থাকে এই কমিটি। স্কটিশ মিশনারি ডাফ্ যখন ১৮৩০ সালে 'ঈশ্বরহীন' শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, তখন তাঁকেও নানাভাবে সাহায্য করেন রামমোহন। কিন্তু মিশনারিদের উপদেশের আধিবিদ্যক দুর্বোধ্যতা এবং তাদের প্রচারের মধ্যে অন্তর্নিহিত অশোভনতাকে মেনে নিতে রাজি ছিল না তাঁর যুক্তিবাদী আধুনিক মন। তাঁর প্রগাঢ় শিক্ষা ও গভীর মনন তাঁকে এমনকি খ্রিশ্চান ধর্মের মতো একটা বিদেশী ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যেকার আধুনিক মানবতাবাদী প্রবণতারও অন্যতম পথিকৃতে পরিণত করেছিল।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন

রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু কেবলমাত্র সমালোচনামূলক বা নেতিবাচক ছিল না। হিন্দু একেশ্বরবাদের সর্বোত্তম ঐতিহ্যগুলোর ভিত্তিতে একটা বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। 'বিনম্র অভিভাবন' (Humble Suggestions, ১৮২৩) রচনায় তিনি ঘোষণা করেন একেশ্বরে বিশ্বাসী প্রতিটি

মানুষই তাঁর সমধর্মী। ১৮২৫ সালে রচিত 'উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি' (Different Modes of Worship) রচনায় তিনি ভিন্নধর্মের মতামত সম্বন্ধে গভীর সহনশীলতার ওপর জোর দেন।

আত্মীয়সভার আলোচনায় কিংবা একেশ্বরবাদী কমিটির অনিয়মিত কাজকর্মে সন্তুষ্ট হতে পারেননি রামমোহন। তাই তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট ব্রাহ্মসভা নামে এক নতুন একেশ্বরবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এক নিয়মিত উপাসনাগৃহ, যাকে আমরা রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই উপাসনাগৃহের দলিলেই সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রথম নীতিগুলো নির্দিষ্ট করা হয়। বাংলার জীবনযাত্রায় এই আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের ভূমিকা পালন করে গেছে।

"সতীপ্রথা"-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম

রামমোহন শুধুমাত্র দার্শনিক, সমালোচক বা ধর্ম-সংস্কারকই ছিলেন না। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক অনমনীয় যোদ্ধা এবং সামাজিক কারণে নির্যাতিতদের মুখপাত্র। সতীদাহ অর্থাৎ হিন্দু বিধবাদের পুড়িয়ে মারার অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক সংগ্রামই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জোর করে সতীদাহ বন্ধ করলে যে তীব্র গণ্ডগোল দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল, সে ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন এবং কিছুটা ভীত ছিল ইংরেজ শাসকরা। এই প্রথার "অপব্যবহার"-এর বিরুদ্ধে যে আইন তারা চালু করেছিল, তা ছিল নিতান্তই অকার্যকর, এমনকি ঐ আইনের মধ্যে এই দানবিক প্রথার একটা নীরব সমর্থনই সুপ্ত ছিল।

১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার সতীদাহের ঘটনা সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮২৯-এর মধ্যে প্রকাশিত তিনটি রচনায় এই হত্যাপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় রামমোহনের কণ্ঠে। সর্বোত্তম ধর্মীয় গ্রন্থাদি থেকে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করেন তিনি। সেই সঙ্গেই জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন মানুষের বিচারশক্তি এবং শুভবুদ্ধিকে। মর্যাদাহীন হিন্দু নারীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচণ্ড সমালোচনা করেন হিন্দু পুরুষদের সমবেদনাহীন মনোভাবের।

অবশেষে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন বেণ্টিঙ্ক। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গোঁড়া হিন্দুরা। সেই সময় সরকারের হাত শক্ত করার জন্য রামমোহন একটা ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করেন এবং ৩০০ জন হিন্দুর স্বাক্ষরিত একটা বিবৃতি প্রকাশ করেন। ১৮৩০ সালে 'যুক্তিসমূহের সারাংশ' (Abstract of Arguments) নামে একটি নিবন্ধও প্রকাশ করেন তিনি। বেণ্টিঙ্কের প্রদত্ত আদেশ যাতে কোনভাবেই প্রত্যাহৃত না হয়, তার জন্য পার্লা-

মেন্টের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন রামমোহন।

নতুন শিক্ষা

শিক্ষাগত সংস্কারের ব্যাপারেও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন রামমোহন। ১৮১৬ সালের সেই আলোচনাগুলোর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, যেগুলোর ফল হিসেবেই ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি স্থাপিত হয়েছিল সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজ। কিন্তু তাঁর "ধর্মবিরোধী" দৃষ্টিভঙ্গী এবং মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার অজুহাতে তাঁকে কমিটিতে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন অর্থবান গোঁড়া হিন্দুরা। নতুন আলোক লাভ করার জন্য উদগ্রীব এ দেশের তরুণদের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষা পেঁছে দেওয়ার এই প্রথম সাচ্চা প্রচেষ্টাটি যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয়, তার জন্য তৎক্ষণাৎ কমিটি থেকে সরে দাঁড়ান রামমোহন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি নিজে একটা অ্যাংলো-হিন্দু বিদ্যালয়ও চালাতেন। জানা যায়, এই বিদ্যালয়ের পাঠসূচীর মধ্যে ছিল বলবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা, ভল্‌তেয়ার ও ইউক্লিড। ১৮২৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত মহাবিদ্যালয়। এখানে তিনি প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্প ও বিজ্ঞানকে মেলানোর চেষ্টা করতেন। ১৮২৩ সালে তিনি স্কটল্যান্ড অ্যাসেম্বলির চার্চের কাছে আবেদন করেন যোগ্য শিক্ষক পাঠানোর জন্য। বাংলায় স্কটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করার জন্য ১৮৩০ সালে বাংলায় আসেন ডাফ। তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন রামমোহন।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা তাঁর ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বরের সুবিখ্যাত চিঠিটি। এই চিঠিতে তিনি একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ওপর জোর দেন। মূলত রামমোহনের এই চিঠিটিকেই সরকারি কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন বেণ্টিঙ্ক এবং মেকলে—অবশ্য অনেক দেরিতে, ১৮৩৫ সালে। ঐ চিঠিতে রামমোহন আবেদন করেছিলেন যে প্রাক্‌-বেকনীয় পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ব্যাকরণ আর আধিবিদ্যক গবেষণার মত ধ্রুপদী বিষয়ের বদলে কার্যকরী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করা হোক, কারণ ঐ-সব গবেষণাকে আয়ত্ত করার জন্য ছাত্ররা প্রায় বার বছর ধরে কয়েকটি মৃত ভাষায় কাল্পনিক শিক্ষা নিয়ে কসরৎ করতে বাধ্য হয়।

রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়গুলোতে তখন যে ব্যবস্থা চালু ছিল, তারই বিরুদ্ধে এই কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন রামমোহন। ঐ-সব কলেজে তখন শুধুমাত্র সংস্কৃত, আরবী বা ফারসী ভাষাই পড়ানো হত। প্রাচ্যভাষাবিদদের কাছে—যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহী ইউরোপিয় পণ্ডিতরাও—এই ব্যবস্থাটা খুবই পছন্দসই ছিল। কিন্তু রামমোহন পাশ্চাত্য থেকে নতুন শিক্ষা আবাহনের পথ প্রস্তুত করে চলেছিলেন, যে শিক্ষা

এ দেশের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা করেছে এবং আমাদের জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করেছে এক নতুন লক্ষ্যে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবেও রামমোহনের নাম উচ্চারিত হয়। মিশনারি কেরি এ প্রচেষ্টা আগেই শুরু করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিত যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সেখানকার বাংলা বিভাগের প্রধান পদে কেরি নিযুক্ত হন ১৮০১ সালে। গদ্যের প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে একটা অনির্দিষ্ট প্রাকৃতভাষার স্তর থেকে একটা নিয়মিত সুনির্দিষ্ট ভাষায় উন্নীত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন কেরি এবং সে কাজে নিজের চারপাশে জড়ো করেছিলেন বেশ কিছু পণ্ডিতকে।
১৮০১ সালে কেরি প্রকাশ করেন 'কথোপকথন', (Book of Dialogues), ঐ সালেই প্রকাশ করেন 'বাংলা ব্যাকরণ' এবং ১৮১৫ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে প্রকাশ করেন একটি 'অভিধান'। ছাপার জন্য বাংলা হরফেরও ব্যবস্থা করেন তিনি এবং ১৮১৮ সালে প্রকাশ করেন প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ।' তাঁর পরিমণ্ডলের অন্যতম পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০২-১৭ সালের সময়কালে গদ্যরীতি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।
এই ক্ষেত্রটিতেও পথিকৃতের ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান রামমোহন। ১৮১৫ সাল থেকে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন অনুবাদ, ভূমিকা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি—সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীতে যেগুলি সমৃদ্ধ—বাংলা গদ্যকে এক নতুন উৎকর্ষতা দান করেছিল এবং প্রমাণ করেছিল যে গুরুগম্ভীর বিষয়কে চমৎকারভাবে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষাও অচল নয়। বাংলাভাষায় লিখিত রামমোহনের বিতর্কমূলক রচনাগুলিতে সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলার জন্য তাঁর আকাঙ্খাটা ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। সংবাদপত্রের জন্য লিখিত তাঁর রচনাগুলিও একইরকম শিক্ষামূলক। নিজের রচনাপত্রে তিনি পাশ্চাত্যের ধাঁচে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতেন। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্থটি আধুনিক বিশেষজ্ঞদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে।

জাতীয় সচেতনতা এবং সংস্কারের জন্য সংগ্রাম

জীবনের নতুন আদর্শে উদ্দীপ্ত রামমোহন সামন্ততান্ত্রিক যুগের একান্ত উপযোগী নিষ্ক্রিয়তার ঐতিহ্য থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিলেন। বেদান্ত সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ঘটানোর জন্য এবং সমাজের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই এ আন্দোলন

তিনি শুরু করেছেন। কোন মাধ্যমের সাহায্য না নিয়ে নিজেই ঈশ্বরের উপাসনা করার ব্যাপারটাকে তিনি দেখতেন পুরোহিততন্ত্রের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তির প্রতীক এবং মানুষের পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ উপলব্ধি করার উপায় হিসেবে। তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল সমাজকাঠামোর ওপর মূর্তিপূজার অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, "যে জাতিভেদপ্রথাই হচ্ছে আমাদের অনৈক্যের মূল কারণ।"

স্বদেশের মধ্যে থেকে সংস্কারক হিসেবে কাজ করতে হলে "জাতিচ্যুত" তকমাটা যে কিছুতেই গায়ে এঁটে নেওয়া চলবে না, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ১৮২৭ সালে তিনি 'বজ্রসূচী'-র অনুবাদ করেন। রচনাটিতে জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা বিধৃত হয়েছে। ১৮২৮ সালে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে এই জাতিভেদ প্রথাই মানুষকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে এবং "মানুষের রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য" ধর্মীয় সংস্কারসাধন একান্তই জরুরী, কারণ ধর্মের চলতি ব্যবস্থাটা "মানুষের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার পক্ষে খুব একটা মানানসই নয়।"

ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে জন্ম নিচ্ছে এক স্বাধীন ভারতবর্ষ—এ দৃশ্য যেন চোখের সামনে দেখতে পেতেন রামমোহন। ফরাসীদেশীয় জ্যাকেমোঁ-র সঙ্গে সাক্ষাতকারে, স্যাণ্ডফোর্ড মার্টনের সঙ্গে আলোচনায় এবং ক্রফোর্ডকে লেখা ১৮২৮ সালের ১৮ আগস্টের চিঠিতে নিজের এই ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। রামমোহন অনুভব করেছিলেন যে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে এবং এই শ্রেণীর নেতৃত্বেই গড়ে উঠবে স্বাধীনতার সর্বাত্মক আন্দোলন।

সংবিধানগত প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারেও রামমোহন এদেশের অন্যতম পথিকৃত। ১৮২৩ সালের সংবাদপত্র সংক্রান্ত অধ্যাদেশের (Press Ordinance) বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে একটি স্মারকলিপি এবং কিং ইন কাউন্সিলের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই আবেদনপত্রে অবাধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন রামমোহন। আবেদনপত্রটির সুললিত ভাষা আমাদের মিল্‌টনের 'অ্যারিঅপ্যাগাইটিকা'-র (Areopagitica) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৮২৭ সালের জুরি আইনের (Jury Act) অন্তর্নিহিত বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং ১৮৩০ সালে খাজনাহীন জমির ওপর কর বসানর জন্য সরকারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধনের প্রাক্কালে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন রামমোহন। কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারের বিলুপ্তি এবং রপ্তানির ওপর বিপুল শুল্কের অবসান দাবী করেছিলেন তিনি। দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির বিবাদ চলার সময় রামমোহন সম্রাটের পক্ষে থেকে আবেদন জানান ইংরেজদের জাতীয় বিশ্বাস ও ন্যায়বোধের কাছে এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-জনমতের কাছে।

জনমত গড়ে তোলার জন্য একটি বাংলা আর একটি ফারসী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন রামমোহন—১৮২১ সালের শেষ দিক থেকে 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং ১৮২২ সালের প্রথম দিক থেকে 'মিরাত-উল-আখবার'। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র সংক্রান্ত অধ্যাদেশের প্রতিবাদে শেষোক্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। চলতি ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছে এই দুটি পত্রিকায়।

কোন কিছুকে ন্যায্য মনে করলে তার সমর্থনে নির্ভীকচিত্তে উঠে দাঁড়াতে কখনোই কুণ্ঠিত হতেন না রামমোহন। 'নারীদের প্রাচীন অধিকার' (Ancient Rights of the Females, ১৮২২) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি বিধবা মা এবং অবিবাহিতা বা বিধবা কন্যাদের আইনগত যাবতীয় ব্যাপারে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীলতার তৎকালীন নিয়মের বিরোধিতা করেন এবং নারীদের জন্যও সম্পত্তির অধিকার দাবি করেন। পুরুষদের বহুবিবাহের রীতিও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। নারী-পুরুষের জন্য সমান, সমদর্শী আইনের প্রবক্তা রামমোহন তাঁর আরেকটি রচনায় সম্পত্তির অবাধ হস্তান্তরের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রচনাটির নাম 'বংশগত সম্পত্তিতে হিন্দুদের অধিকার' (Rights of Hindus over Ancestral property, ১৮৩০)।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বিদেশেও পাড়ি দেন দুঃসাহসী রামমোহন। ১৮৩১ সালে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থা, রায়তদের অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবৃতি তিনি পেশ করেন ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের কাছে। কৃষকদের দুরবস্থা এবং জমিদারী অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে। তিনি দাবি করেন—খাজনার নির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করতে হবে, প্রকৃত কৃষকদের জন্য স্থায়ী কর-নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং গঠন করতে হবে একটা কৃষকবাহিনী। শাসন-তান্ত্রিক সংস্কারের একটা কর্মসূচী পেশ করেন তিনি, যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সংবিধানগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সরকারি বিভাগের (services) ভারতীয়করণ, বিচারবিভাগের থেকে শাসন-বিভাগকে পৃথক করা, জুরিদের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছিল এই কর্মসূচীতে।

আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও যোগাযোগ

রামমোহনের চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর

প্রগাঢ় উৎসাহ এবং পৃথিবীর সমস্ত জায়গার প্রগতিশীল আন্দোলন সম্বন্ধে উপলব্ধি ও মমত্ববোধ। যুবক বয়সে রংপুরে থাকার সময়ই ইউরোপিয় রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন তিনি। তাঁর বন্ধু এবং উপরওয়ালা ডিগ্‌বি জানিয়েছেন—প্রথমদিকে নেপোলিয়নকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন রামমোহন, কিন্তু সম্রাট মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করছেন অনুভব করার পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে।

গত শতাব্দীর বিশের দশকে তাঁর সংবাদপত্রগুলোতে চৈনিক প্রশ্ন, গ্রীসের সংগ্রাম এবং গ্রামের বাইরে থাকা জমিদারদের শাসন ও এক-দশমাংশ খাজনার চাপে নুয়ে পড়া আয়ারল্যাণ্ডের দুর্দশা প্রভৃতি চলতি বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা থাকত। ১৮২১ সালে নেপ্‌লসের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ শুনে নিজের সমস্ত পূর্বনির্ধারিত কাজ বাতিল করে দিয়েছিলেন বিষণ্ণ রামমোহন। ১৮২৩ সালে স্পেন-অধিকৃত আমেরিকায় বিপ্লবের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল রামমোহন ঐ বিপ্লবের সম্মানে একটি গণভোজের ব্যবস্থা করেন।

তাঁর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিধিটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে—স্প্যানিশ ভাষায় লিখিত নতুন সংবিধান সম্বলিত একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁর নামে। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের সংবাদ শোনার পর "তিনি আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে ভাবতেন না বা কথা বলতেন না।" ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পথে কেপ টাউনে বিপ্লবের তেরঙা ঝাণ্ডা লাগানো কিছু ফরাসী রণতরী তাঁর নজরে পড়ে এবং তিনি ঐ রণতরীগুলি পরিদর্শনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন—যদিও সে সময় একটা দুর্ঘনার দরুন তিনি সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে অল্প সময় থাকার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে সাহায্য করেছিলেন রামমোহন।

বিপরীত দিক থেকে আসা একটি জাহাজ তাঁদের জাহাজের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানিয়ে যায়—ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে সংস্কারবিষয়ক বিলটি (Reform Bill) অনুমোদিত হতে চলেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রামমোহন। ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকদের তিনি অভিনন্দন জানান "সংস্কার হোক বরাবরের জন্য" বলে। ইংল্যাণ্ডের সংস্কারপন্থী আন্দোলনকে তিনি "ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রাম" বলে মনে করতেন। সংস্কারবিষয়ক বিলটি বাতিল হয়ে গেলে ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত যোগযোগ ছিন্ন করার কথাও ভেবে রেখেছিলেন তিনি।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ আদান-প্রদানের সমর্থনেও সরব হয়েছিলেন রামমোহন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবাদের সমাধান করার জন্য একটি ইঙ্গ-ফরাসি কংগ্রেসের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের জাতীয় সচেতনতায় প্রায়শই যে সঙ্কীর্ণতার ছায়া দেখা গেছে, তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং স্বাধীনতার প্রতি গভীর ভালবাসার কাছে এ-সব সঙ্কীর্ণতা ছিল নিতান্তই অর্থহীন।

রামমোহন রায়ের সহযোগীরা

বাংলার রেনেসাঁসে রামমোহনের পথিকৃৎসুলভ ভূমিকা, তাঁর নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং আজকের দিনে তাঁকে হেয় করার বিক্ষিপ্ত কিছু প্রচেষ্টা—এইসব কারণেই রামমোহন রায়কে নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করতে হল আমাদের। কিন্তু রামমোহন নিজেও ছিলেন তাঁর যুগেরই ফসল। এ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি তথ্যই যথেষ্ট—তাঁর চারপাশে সবসময়ই কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সহযোদ্ধাকে পেয়েছেন রামমোহন। রংপুরের মণ্ডলী, ১৮১৫ সাল থেকে শুরু হওয়া আত্মীয় সভা, ১৮২৮ সালের ব্রাহ্মসভা এবং সামাজিক অথবা সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন—এগুলি অনিবার্যভাবেই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু সংখ্যক উৎসাহী মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে সেই সময়টা পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্টই পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল।

ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)

নতুন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের সহযোগী হিসেবে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলেন একজন অ-ভারতীয় মানুষ। এই ক্ষেত্রটিতে তিনি এক অবিনশ্বর কীর্তি রেখে গেছেন। মানুষটির নাম ডেভিড হেয়ার। ১৮০০ সালে একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসেবে এ-দেশে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে এ-দেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে (মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ চার দশক ধরে, এ-দেশেই ছিলেন ডেভিড হেয়ার)। বাংলার বুকে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা চালু করার দাবিও জোরদার হয়ে উঠছিল। কলকাতায় শেরবার্ন অথবা ড্রামণ্ডদের মতো কয়েকটি ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন বিদ্যালয় এই দাবি পূরণ করার জন্য যৎসামান্য প্রচেষ্টা করেছিল। সরকার কেবলমাত্র একটি সংস্কৃত কলেজ কিংবা একটি মুসলিম মাদ্রাসা চালাত, যেখানে শুধুমাত্র প্রাচীন বিষয়ই পড়ানো হত। এমনকি ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেটাকেও সরকারের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পরামর্শদাতারা ব্যয় করতেন দেশীয় ধ্রুপদী শিক্ষার কাজেই।

নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কলকাতার ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন ডেভিড হেয়ার। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৮১৬ সালে তিনি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টকে রাজি করান এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার ব্যাপারে। এই আলোচনার ফল হিসেবেই ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজ, যা আজও টিকে আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে। বেশ কিছু বছর ধরে এই পথিকৃৎসম প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মে সোৎসাহে অংশ নিয়েছেন ডেভিড হেয়ার, প্রতিদিন কলেজ

পরিদর্শনে গেছেন, পালন করেছেন পরামর্শদাতার ভূমিকা। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনা ও প্রকাশ করার জন্য ১৮১৭ সালে তিনি গঠন করেন স্কুল বুক সোসাইটি এবং নতুন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ও মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৮ সালে গঠন করেন স্কুল সোসাইটি। আশান্বিত তরুণরা কিভাবে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকত আর বৃত্তি পাওয়ার আশায় কিভাবে ছুটত তাঁর পালকির পিছু পিছু, সে ব্যাপারে অনেক গল্পই শোনা যায়।

ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর ডেভিড হেয়ার তাঁর পুরো সময়টাই ব্যয় করতে থাকেন নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যের পিছনে। কলকাতা শহরে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদিন পরিদর্শনে যেতেন তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করতেন, তাদের খাওয়াতেন, অসুখ হলে পরিচর্যা করতেন। কলকাতার পুরো একটা প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা এ-দেশের এই মহান বিদেশী বন্ধুটিকে ভালবাসত, ভক্তি করত। ১৮৪২ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই মানুষটি, তখন তাঁর সেই মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল কলকাতার ঐ শিক্ষিত যুবকরা।

নারী শিক্ষা

এ দেশে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে স্কুল সোসাইটি উদ্যোগ নেয় এবং এর স্বপক্ষে প্রচার চালায়। এই প্রচারের ফলে ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৮২১ সালে তারা মিস কুক্‌কে পাঠায় ভারতবর্ষে। চার্চ মিশনারি সোসাইটির সাহায্যে মিস কুক্ এখানে দশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে মানবপ্রেমিক ইংরেজদের অর্থসাহায্যে গড়ে ওঠা বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি আরও কয়েকটি বিদ্যালয় চালু করে। এ ব্যাপারে সহানুভূতিশীল অনেক ভারতীয়ও এই সোসাইটিকে যথেষ্ট অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। কলকাতার বাইরে ১৯-টি বালিকা বিদ্যালয় চালু থাকার কথা আমরা জানতে পারি অ্যাডাম্-এর ১৮৩৪ সালের 'রিপোর্ট' থেকে। অবশ্য এগুলোর অধিকাংশই চলত মিশনারিদের উদ্যোগে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) এবং অন্যান্যরা

রামমোহন রায়ের ভারতীয় সহযোগীদের মধ্যে সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পরবর্তীকালে যাঁকে 'প্রিন্স' নামে অভিহিত করা হত। তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন শেরবার্ন'স স্কুলে। আইনের শিক্ষা পেয়েছিলেন ব্যারিস্টার ফার্গুসনের কাছ থেকে। প্রথমে জনৈক লবণ এজেন্টের দেওয়ান হিসেবে এবং পরে কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানির মালিক হিসেবে বিস্তর অর্থসঞ্চয় করেন দ্বারকানাথ। বাণিজ্যের সঙ্গে

যুক্ত নতুন অভিজাতশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবেই তাঁকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ। রামমোহনের সহযোগীদের মধ্যে তিনি ছাড়াও ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, যিনি ১৮৩১ সালে 'রিফর্মার' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এছাড়াও ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত চন্দ্রশেখর দেব, ছিলেন ব্রাহ্মসভার প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তী। বেশ কিছু বন্ধু ও অনুগামীকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিলেন রামমোহন। উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছিল গোটা শহর।

রামমোহনের রক্ষণশীল সমালোচকরা

তবে এই দুঃসাহসিক জেহাদে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সকলকে বা অধিকাংশকে কিন্তু রামমোহন নিজের পাশে পাননি। প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিরোধিতার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। গ্রামের বাড়িতে রামমোহনের বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা তাঁকে একঘরে করে দেয়। সেই সময় কলকাতার নগরজীবনকে নিজের পক্ষে অধিক সুবিধেজনক বিবেচনা করে তিনি সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। অতঃপর জীবনের বেশির ভাগ অংশটা কলকাতা শহরেই কাটিয়েছেন তিনি। কলকাতা শহরেও তাঁকে ব্যঙ্গ করে লেখা বেশ কিছু অশ্লীল গান চালু হয়েছিল। শোনা যায়, রাস্তার ছোট ছোট ছেলেরাও নাকি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এইসব গান গাইতে। প্রকাশ্য রাজপথেও কখনো কখনো লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে রামমোহনকে। ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত ভদ্রলোকদের চাপে কিভাবে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল হিন্দু কলেজের কমিটি থেকে, তা তো আমরা আগেই দেখেছি। যে বিরক্তিকর মামলাগুলো রামমোহনকে বারবার উত্যক্ত করেছে এবং তাঁর জীবনের বহু বছর যার পিছনে অপব্যয় হয়ে গেছে, সেগুলো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভেরই ফল—এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন। তাই জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই নিজের আচার-আচরণের ব্যাপারে তাঁকে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে চলতে হত। এই চাপ না থাকলে হয়ত এতটা সতর্ক হওয়ার কোন দরকার হত না তাঁর।

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭)

"ধর্মবিরোধী" মানুষটির সঙ্গে বিতর্কে গোঁড়া পণ্ডিতদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন শোভাবাজার রাজবাড়ির বংশধর এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের স্বীকৃত প্রধান রাধাকান্ত দেব। চিরায়ত সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত রাধাকান্ত ১৮১৯ সালে একটি সংস্কৃত জ্ঞানকোষ (encyclopaedia) সংকলনের কাজ শুরু করেন।

এই কাজটি তাঁর সুগভীর জ্ঞানেরই সাক্ষ্য বহন করে। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়াশীল আবেদনপত্রটি রচিত হয়েছিল (১৮২৯ সালে), তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাধাকান্ত। ১৮৩০ সালে গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় সংগঠন 'ধর্মসভা'-র নেতা হন তিনি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যই গড়ে উঠেছিল এই সংগঠনটি। রক্ষণশীল ধনীরা জড়ো হন রাধাকান্তর চারপাশে। ধর্মসভার অধিবেশনের দিনে এইসব ধনীদের গাড়িতে রাস্তা আটকে যেত।
এ-সব সত্ত্বেও রাধাকান্ত কিন্তু পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার নির্ঝরিণীপ্রতিম হিন্দু কলেজে প্রচুর দান ছিল তাঁর। স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য এবং অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি। নারীশিক্ষার স্বপক্ষে তিনি নিজেই একটি বই লিখেছিলেন এবং নারীশিক্ষা প্রসার আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

রামমোহনের অন্যান্য সমালোচকরা

রংপুরে থাকার সময়ই রামমোহনের কাজকর্মে গোঁড়াপন্থী সমালোচকরা তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন তিনি। প্রতিভাবান পুরুষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় রামমোহনের 'বেঙ্গলি' পত্রিকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর বিরোধিতা করে 'সম্বাদ চন্দ্রিকা' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ভবানীচরণ। চিরাচরিত সহজ-সরল অভ্যাস পরিত্যাগ করে যে-সব নারী-পুরুষ জীবনের নতুন পথের দিকে ঝুঁকছিল, তাদের নিন্দায় ১৮২৫ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বারবার মুখর হয়েউ ঠেছেন ভবানীচরণ।
প্রখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন ছিলেন আরেকজন গোঁড়াপন্থী নেতা—যদিও রাধাকান্ত দেবের মতো তিনিও হিন্দু কলেজের মতো নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আসলে রামমোহনের রক্ষণশীল সমালোচকরা ঠিক অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। যেমন, যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার রামমোহনের বিরুদ্ধে বিতর্কে নেমেছিলেন, তিনি সেই ১৮১৭ সালেই বিরোধিতা করেছিলেন সতীদাহ প্রথার। তবু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, সেকালে এই রক্ষণশীল সমালোচকরা রামমোহনের জীবনসাধনার যুগান্তকারী তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যেমন আজও ব্যর্থ হয়ে চলেছেন তাঁদের আধুনিক উত্তরসূরিরা।

নয়া চরমপন্থার অভ্যুদয়

রামমোহনের জীবদ্দশাতেই অতি-চরমপন্থী একটি প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের চৌহদ্দী থেকে উদ্ভূত এই চরমপন্থাই বিখ্যাত হয়েছিল ইয়ং

বেঙ্গল আন্দোলন নামে। আন্দোলনটি কিছুদিনের জন্য সমাজে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন কিন্তু সমর্থন করতে পারেন নি এই আন্দোলনকে। ফরাসি বিপ্লব এবং ইংরেজ চরমপন্থার ঐতিহ্যজাত এই আন্দোলনের মধ্যে মুক্ত বা অবাধ চিন্তার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই মুক্ত চিন্তার ব্যাপারটা আহত করেছিল রামমোহনের রুচিবোধ আর ঈশ্বরবিশ্বাসী ভাববাদকে। ইয়ং বেঙ্গলের তরুণরাও রামমোহন সম্বন্ধে খুব একটা ভাল ধারণা পোষণ করত না। তাদের মুখপত্র 'এনকোয়্যারার' রামমোহনের আন্দোলনকে ঘৃণাভরে অভিহিত করেছিল "আধা-ধর্ম আধা-রাজনীতি" বলে। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মূল প্রেরণাদাতার ভূমিকায় ছিলেন বাংলার রেনেসাঁসের এক অত্যাশ্চর্য চরিত্র জনৈক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। নাম তাঁর ডিরোজিও।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)

ডিরোজিওকে বিস্ময়বালকই বলা চলে। ড্রামণ্ড নামক জনৈক স্কটিশ ভদ্রলোক কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে যে প্রাইভেট বিদ্যালয়টি চালাতেন, সেই বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করেন ডিরোজিও। কবি, পণ্ডিত এবং বেপরোয়া মুক্তচিন্তক (free thinker) হিসেবে ড্রামণ্ডের কিছুটা পরিচিতি ছিল। সম্ভবত তাঁর কাছ থেকেই ফরাসি বিপ্লব প্রসূত অপ্রতিরোধ্য স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন ডিরোজিও, চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের এবং যাবতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক দুর্বার আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলে তাঁকে।

কিশোর বয়সেই দার্শনিক কাণ্টের ভাবধারার চমৎকার সমালোচনা করতে পারতেন ডিরোজিও। তাঁর কবি প্রতিভাও বিকশিত হয় অল্প বয়সেই। 'ফকির অফ ঝুঙ্গিরা' (Fakir of Jhungeera) কবিতাটির মধ্যে দেশপ্রেমের এক উদ্দীপ্ত প্রকাশ দেখা যায়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যা ছিল একান্তই দুর্লভ। ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই উঁচু শ্রেণীর বেশ কিছু ছাত্রকে চুম্বকের মতো নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন তিনি। এই ছাত্ররা তাঁকে ভক্তি করতে শুরু করে এবং আবিষ্ট হয় মুক্ত চিন্তার নেশায়।

অবাধে বিতর্ক করা এবং যে-কোন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য এই ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন ডিরোজিও। তাঁর বাড়িতে অবাধ অধিকার ছিল সমস্ত ছাত্রের। মুক্তির প্রতীক হিসেবে তারা পরম উল্লাসে গ্রহণ করত নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন ডিরোজিও। সংগঠনের মাসিক মুখপত্র ছিল 'এথেনিয়াম'। এই পত্রিকায় তাঁর ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি আর তাঁর বন্ধুরা হিন্দু ধর্মকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন।

কলেজের সেরা ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল ডিরোজিওর চারপাশে। এরা যাবতীয়

প্রাচীন প্রথাকে উপহাস করত, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অস্বীকার করত, দাবি করত নারীশিক্ষার এবং নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করার জন্য আশ্রয় নিত মদ্যপান ও গোমাংস ভোজনের। শঙ্কিত কলেজ কর্তৃপক্ষ রামকমল সেনের অনুরোধে যুবকদের মাথা-খাওয়া বিপজ্জনক মানুষটিকে ১৮৩১ সালের ২৫ এপ্রিল বরখাস্ত করেন। সেই বছরই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান ডিরোজিও, কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের মনের আকাশে অমলিন হয়ে থাকে তাঁর স্মৃতি।

ইয়ং বেঙ্গল

ডিরোজিওর ছাত্ররা যৌথভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। ১৮৩১ সালেই তাঁরা ইংরিজি ও বাংলায় দুটি মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন—'এনকোয়্যারার' আর 'জ্ঞানান্বেষণ।' কয়েকজন ডিরোজিওপন্থীর খ্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণের সংবাদে চমকে উঠেছিল সারা কলকাতা। এঁদের মধ্যে দুজন, মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩২ সালেই নিজেদের ধর্মান্তরণের কথা ঘোষণা করেন।

৩
১৮৩৩-৫৭

ডিরোজিওপন্থীরা

ডিরোজিওপন্থীদের কাজকর্মে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তৎকালীন সমাজ। কিন্তু ডিরোজিওপন্থীরা একটা সুদৃঢ় বনিয়াদ ও ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন-বিশিষ্ট কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন একটি গোষ্ঠী।

ডিরোজিওপন্থীরা ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় সমবেত কিছু বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের একটি দল। সাধারণ মানুষের মধ্যে এঁরা একটা উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ইতিবাচক উপাদান খুব একটা ছিল না, কোন সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল মতাদর্শ গড়ে তুলতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁরা। পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিঘাতেই আন্দোলিত হয়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু জনসাধারণ আর তাদের অধিকার সম্বন্ধে যে ধারণার জন্ম দিয়েছিল ঐ বিপ্লব, তা তাঁরা ঠিক মতো আত্মস্থ করতে পারেননি।

এই বুদ্ধিদীপ্ত যুবকেরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকেছেন তাঁদের শিক্ষকের স্মৃতির প্রতি, ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে অটুট রেখেছেন নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে স্বপক্ষে টেনে আনার উপযুক্ত কোন বিকাশমান চিন্তাধারার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা প্রমাণ করতে পারেননি নিজেদের। সেই সময়ে কিছুটা প্রভাববিস্তারে সমর্থ হলেও পরবর্তীকালে তাঁরা হারিয়ে গেছেন "পিতা ও সন্তানহীন একটি প্রজন্ম"-র মতো।

ডিরোজিওপন্থীদের প্রারম্ভিক কার্যকলাপ

তবে বেশ কয়েক বছর ডিরোজিওপন্থীরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুটি মুখপত্র প্রকাশ করতেন তাঁরা—'এনকোয়্যারার' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ।' ১৮৩৪-৩৫ সালে এঁদেরই একজন রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহনের মৃত্যু, কোম্পানির সনদপত্রের সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন জনসভায় চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে তাঁরা টিকিয়ে রেখেছিলেন প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। সেই সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে মত-বিনিময় করার জন্য গড়ে তুলেছিলেন আর একটি সংগঠন: এপিস্‌টোলারি অ্যাসোসিয়েশন (লিপি-লিখন সভা)।

ইংল্যাণ্ডের চরমপন্থী কার্যকলাপ সম্ভবত তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ ১৮৩৮ সালে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General Knowledge) এবং ১৮৩৯ সালে গঠন করেন 'কলাবিদ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান' (Mechanics Institution)। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে, তা তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে থাকে। একদিকে মাথা তোলে খ্রিশ্চান ধর্ম, মধুসূদন দত্ত (হিন্দু কলেজের এই উজ্জ্বল ছাত্রটি ১৮৪৩ সালে নিজের আদি ধর্ম ত্যাগ করেন) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের (প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র) মতো ব্যক্তিরা খ্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেন ; অন্যদিকে, মদ্যপানের যে অভ্যাসকে ডিরোজিওপন্থীরা মুক্তির প্রতীক হিসেবে মনে করতেন, সেই অভ্যাসটি ডিরোজিওপন্থী মুক্ত-চিন্তার মহত্তর আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলতে শুরু করে।

তবে, ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের চেতনায় প্রকৃত আলোড়ন তুলেছিল কয়েকটি বিশেষ বিষয়। যেমন, সুদূর মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থা, জুরিদের দ্বারা বিচার অনুষ্ঠিত করার অধিকারের সম্প্রসারণ, ইংরিজিকে আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত কুলিদের জোর করে খাটানো ইত্যাদি। এর ফলে ডিরোজিওপন্থীরা আকৃষ্ট হতে শুরু করেন আরও সক্রিয় রাজনীতির দিকে। অবশ্য ১৮৩৩ সালের নতুন চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের জন্য সরকারি পদের দরজা খুলে যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সরকারি চাকরিতে যোগ দেন।

ইয়ং বেঙ্গলের রাজনীতি

১৮৪২ সালে 'বেঙ্গলি স্পেক্টেটর' নামে একটি নতুন মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন ডিরোজিওপন্থীরা। এই পত্রিকায় সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেত অর্থনীতি ও রাজনীতি। সামাজিক ও সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়ের চর্চা ছাড়াও—এইসব বিষয়ে ডিরোজিওপন্থীরা নানান প্রবন্ধ লিখে পাঠ করতেন—'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-টি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মঞ্চেও পরিণত হয়। ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজের ঘরে সংস্থার একটি সভা চলার সময় জনৈক বক্তার "প্ররোচনামূলক মন্তব্য"-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন, কিন্তু সভার চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্য নাকচ করে দেন। সেদিন ঐ সভার চেয়ারম্যান ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের থেকে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন তারাচাঁদ। একসময় তিনি ছিলেন রামমোহনের সহযোগী, কিন্তু পরবর্তীকালে যোগ দেন ইয়ং বেঙ্গলে। 'ক্যুইল' (Quill) পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন

তারাচাঁদ। তাঁর নাম অনুযায়ী ডিরোজিওপন্থীদের তখন 'চক্রবর্তী গোষ্ঠী' নামে অভিহিত করা হত।

দাসপ্রথা-বিরোধী প্রচারের জন্য বিখ্যাত জর্জ টমসনের বক্তৃতা দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে ১৮৪৩ সালে ডিরোজিওপন্থীরা কয়েকটি জনসভার আয়োজন করেন। এইসব সভায় বক্তৃতা দেন জর্জ টমসন এবং তার ফসল হিসেবে টমসনের অনুপ্রেরণায় ও ইয়ং বেঙ্গলের পরিচালনায় গড়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক সংস্থা : বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৩ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে। এর উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের বৈধ অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সুচিন্তিত প্রচেষ্টা চালানো। এ সংগঠনে যে-কেউই যোগ দিতে পারত।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' অথবা এই নতুন সংগঠন—কোনটাই খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। যদিও এই অল্পদিনের মধ্যেই তারা একটা রাজনীতিমনস্কতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ডিরোজিওপন্থীদের অন্যতম রামগোপাল ঘোষ, যিনি ছাত্র অবস্থা থেকেই সুবক্তা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি এই-সময় একজন নিয়মিত বক্তার ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। ১৮৪৭ সালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁকে চিহ্নিত করা হয় 'ভারতের ডিমস্থিনিস' নামে। ১৮৪৯-৫০ সালে একটা নতুন বিল্ আসে, যা তথাকথিত কালা বিল (Black Bill) নামেই পরিচিত। এই বিলের লক্ষ্য ছিল এদেশের ইউরোপিয় বাসিন্দাদেরও স্থানীয় আদালতের আইনগত এক্তিয়ারে নিয়ে আসে। তার আগে পর্যন্ত ইউরোপিয়দের বিচার করার অধিকার ছিল শুধুমাত্র কলকাতার সুপ্রিম কোর্টেরই। এদেশের ইউরোপিয়রা এই বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই সময় ঐ প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে 'রিমার্কস অন দ্য ব্ল্যাক অ্যাক্টস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে আরও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন রামগোপাল।

১৮৫১ সালে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডিরোজিওপন্থীরা গড়ে তোলেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। রাজনৈতিক উন্মাদনার এই বছরগুলিতে কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের সাংস্কৃতিক ব্যাপারে উৎসাহ মোটেই কমে যায় নি। ১৮৫৭ সালে ইয়ং বেঙ্গলের দুজন সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার বাংলা ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকা সহজ-সরল ভাষায় লেখা চালু করার উদ্যোগ নেয়, যে ভাষা বুঝতে সমাজের সাধারণ মহিলাদেরও কোন অসুবিধে হবে না। আসলে তখনকার বাংলা গদ্যে ভীষণ রকম সংস্কৃত-ঘেঁষা যে ধরনের মার্জিত লিখন-শৈলী চালু ছিল, তার বিরুদ্ধেই একটা প্রতিবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই 'মাসিক পত্রিকা।'

ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধাররা

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কর্ণধার হিসেবে মোটামুটি দশজনকে চিহ্নিত করা যায়।

এঁদের মধ্যে সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-৫৫)। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করার আগে থেকেই তারাচাঁদ ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাছাড়াও তিনি ছিলেন রামমোহনের মণ্ডলীর একজন সদস্য এবং ব্রাহ্মসভার প্রথম সম্পাদক। সম্পাদক, অভিধান-রচয়িতা এবং ছোটখাট সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কিছুটা বিখ্যাত হয়েছিলেন তারাচাঁদ। ১৮৩৪ সালে তাঁকেই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা বলে মনে করা হত। ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধারদের মধ্যে সবথেকে কট্টর ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)। তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধুর উচ্ছৃংখল আচরণের শাস্তি হিসেবে ১৮৩১ সালে তিনি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। পরের বছর তিনি দীক্ষিত হন খ্রিশ্চান ধর্মে এবং তাঁর পত্রিকা 'এনকোয়্যারার'-এর পৃষ্ঠায় ব্যঙ্গ করেন হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে। ১৮৩৭ সালে খ্রিশ্চান মিশনারির কাজ নিলেও নিজের র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে আসেননি। কৃষ্ণমোহন ছিলেন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। একটি জ্ঞানকোষ (encyclopaedia) রচনা করেছিলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। কোন সংগঠন বা সভার সভাপতি হিসেবে প্রায়শই তাঁর নামই প্রথমে বিবেচিত হত।

ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮)। সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং পরিণত হয়েছিলেন গোটা গোষ্ঠীটার কেন্দ্রবিন্দুতে। ইয়ং বেঙ্গলের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেই যুক্ত থাকতেন রামগোপাল। চমৎকার বক্তৃতা ক্ষমতা এবং কালা বিল বিতর্কে ইউরোপিয়দের দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁকে সারা দেশে সুপরিচিত করে তুলেছিল।

প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮)। একবার একটি নিম্ন আদালতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পবিত্র গঙ্গাজলের নামে শপথ নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পালিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। পরবর্তী জীবনে একজন অত্যন্ত সৎ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন রসিককৃষ্ণ।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) নিজের ছাত্রাবস্থাতেই অন্য ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির উদ্বোধনের সময় থেকেই এই লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ —প্রথমে সহকারি গ্রন্থাগারিক, পরে যথাক্রমে গ্রন্থাগারিক, সম্পাদক এবং কিউরেটর হিসেবে। গ্রন্থাগারটিকে তিনি তাঁদের গোষ্ঠীর মননগত চর্চার একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তৎকালীন সমস্ত সাময়িক পত্রে প্রায়শই প্রকাশিত হত প্যারীচাঁদের লেখা। বেশ কিছু কমিটির তিনি ছিলেন সক্রিয় সদস্য।

তাঁর উৎসাহ ছিল বহুমুখী। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত 'এগ্রিকালচারাল মিসেল্যানি'-র (Agricultural Miscellany) সম্পাদনা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল নজির।

প্যারীচাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) ছিলেন সরকারি বিভাগের দিনলিপিকার, গণিতজ্ঞ, হিসাববিদ এবং জরিপকারী। ঐ বিভাগের দরিদ্র কুলিদের অধিকারের স্বপক্ষে তাঁর সাহস ভরে রুখে দাঁড়ানোর ফলে সাহেবের খেয়ালখুশি মতো বাধ্যতামূলক বেগার খাটার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল কুলিরা। প্রচলিত রীতি অনুয়ায়ী তাঁর সঙ্গে এক নিতান্ত অল্পবয়সী বালিকার বিবাহের কথা উঠলে সেই প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। এই পর্যায়ের শেষদিকে প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ এই দুই বন্ধু বাংলা গদ্যে সহজ কথ্যভাষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে ছিলেন ঋষিপ্রতিম রামতনু লাহিড়ীও (১৮১৩-৯৮)। ১৮৫১ সালে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর উপবীত পরিত্যাগ করলেও সকলেই তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত—এমনকি সাধারণ মানুষরাও। সারা জীবনই তিনি প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন আর সেই সঙ্গেই একজন সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে সারাটা জীবনই তাঁকে সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গে।

এর ঠিক বিপরীত মেরুতে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭)। এই বুদ্ধিদীপ্ত ডিরোজিওপন্থী যুবকটি ছিলেন অত্যন্ত ধনবান। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় যখন বেথুন কলেজ ফর উইমেন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই কলেজের জমিটি দান করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জনই। ডিরোজিওপন্থীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি, প্রচলিত যে-কোন রীতি অস্বীকার করতে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না। ইয়ং বেঙ্গলের যাবতীয় কাজ-কর্মেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। একটি সামাজিক কুৎসার ফলে তিনি কলকাতায় একঘরে হয়ে পড়েন এবং তখন উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন।

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০) খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর জন্মস্থান কোন্নগরের একজন পরম হিতৈষী হিসেবে, সৎ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে এবং পরবর্তী পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা হিসেবে। আরেকজন ডিরোজিওপন্থী সরকারি কর্মচারী হরচন্দ্র ঘোষও (১৮০৮-৬৮) সততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এছাড়া আর একজন ডিরোজিওপন্থী (যাঁর নাম জানা যায়নি) সন্ন্যাসী হয়ে পশ্চিম ভারতে চলে গিয়েছিলেন এবং কাথিয়াওয়াড়ে স্থানীয় রাজাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ইয়ং বেঙ্গল পর্যায়ের চরিত্র

বাংলার বুকে ডিরোজিওপন্থীরা যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন, তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য। নিজেদের অর্থাৎ ডিরোজিওভক্ত গোষ্ঠীটুকুর বাইরে কোন আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পারেননি, এমনকি তাঁদের নিজস্ব গোষ্ঠীটাও কোন তাৎপর্যপূর্ণ আদল নিয়ে টিকে থাকতে পারে নি। গোষ্ঠীর সদস্যরা এক সময় অবশ্যম্ভাবীরূপেই জড়িয়ে পড়েছিলেন জাগতিক কাজকর্মে ও ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায়। মনে রাখা দরকার ইয়ং বেঙ্গলের অধিকাংশ সদস্যই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, স্বাভাবিকভাবেই জীবিকা অর্জনের একটা দায় তাঁদের ছিলই। একশ বছর আগে বাংলার মাটিতে পাশ্চাত্য ধাঁচের র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল আর তাই ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেকার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা কখনোই কোন সুদৃঢ় বনিয়াদ খুঁজে পায়নি।

ডিরোজিওপন্থীদের যে একমাত্র প্রলক্ষণটি তৎকালীন সমাজের অনেকে অনুকরণ করার চেষ্টা করত তা হল চালু সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করা। কিন্তু এ ব্যাপারেও তেমন কোন বলিষ্ঠ বিদ্রোহ কিংবা সাহসী প্রতিবাদ দেখা যায়নি, বরং প্রথাগুলোকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক দুর্নীতি এবং সেক্ষেত্রে প্রকৃত ডিরোজিওপন্থীরা তাঁদের যে সততা ও সাহসের জন্য আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তার বিন্দু-বিসর্গও ছিল না তাঁদের নকলকারীদের মধ্যে।

নরমপন্থী সংস্কারকরা

যে-সব নরমপন্থী সংস্কারক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রামমোহনের কাছ থেকে এবং ইয়ং বেঙ্গলের খামখেয়ালিপনাকে যাঁরা ঘৃণার চোখে দেখতেন, তাঁরা কিন্তু নিজেদের জমিটুকু ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিলেন। এই পর্যায়ের প্রথম দশকটায় একেবারে ঢাকা পড়ে গেলেও ১৮৪৩ সালের পর এঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ১৮৪৩ সালে এই নরমপন্থীদের নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পঞ্চাশের দশকে তাঁরা সহযোগী হিসেবে পান বিদ্যাসাগরের মতো এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে।

১৮৩৩-৪৩

রামমোহনের ঐতিহ্যটা প্রথমদিকে কিছুটা দুর্বলভাবেই বজায় রেখেছিলেন তাঁর পূর্বতন সহযোগীরা। এঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন ঠাকুর পরিবারের প্রধান দ্বারকানাথ ঠাকুর। ঠাকুর বংশের আর একজন সদস্য প্রসন্নকুমার 'রিফর্মার' পত্রিকাটি চালাতেন। এই পত্রিকাটি ছিল ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে র‍্যাডিক্যাল

মতাদর্শবাহী 'এনকোয়্যারার' পত্রিকার নরমপন্থী প্রতিরূপ। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহটি নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে ছিল এবং এর পিছনে প্রধান কৃতিত্বটা ছিল ঐ উপাসনাগৃহের যাজক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের। অনুগ্র দেশপ্রেম ও নৈতিক উৎকর্ষতা বিষয়ে 'নীতিদর্শন' (১৮৪১) নামে একটি প্রবন্ধ সংকলনেরও লেখক ছিলেন রামচন্দ্র।

ঠিক সংশোধিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী না হলেও সাধারণ নরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষ নামে আরেকজন বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যেও। হিন্দু কলেজের পুরনো ছাত্র ছিলেন কাশীপ্রসাদ। পুরোপুরি ডিরোজিওপন্থী ছিলেন না তিনি। ইংরিজিভাষায় দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখতেন এবং ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন কাশীপ্রসাদ। আরেকজন সহযোগী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল এই লেখকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নিজস্ব স্থান অধিকার করে আছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি সবথেকে সুপরিচিত বাংলা পত্রিকা হয়ে ওঠে এবং ১৮৩৯ সালে পরিণত হয় প্রথম বাংলা দৈনিকে। সে সময় শিক্ষিত সমাজে 'সংবাদ প্রভাকর' যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, তার প্রধান কৃতিত্বটা পত্রিকার এই প্রতিভাধর সম্পাদকেরই প্রাপ্য।

সহজাত কবিপ্রতিভা এবং অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক লেখনীর ক্ষমতাবিশিষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালী কবিদের ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাংলায় যে লোক-কবিতাকে তখনকার শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিরা শুধুমাত্র ঘৃণাই করতেন, সেইসব লোক-কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি।

নিজেদের সমকালীন র‍্যাডিক্যালদের মতো নরমপন্থীরাও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে তাঁরা 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের কাজ কিন্তু শুধুমাত্র সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৩৭-৩৮ সালে গড়ে ওঠে 'ভূম্যধিকারী সভা' (Land holders' Association)। পুরুষানুক্রমে নিষ্কর জমির ওপর খাজনা বসানোর বিরুদ্ধে পুরনো আন্দোলনটা নতুন করে শুরু করে এই সংস্থা। যে-কোন ধরনের জমি মালিকরাই এই সংগঠনের সদস্য হতে পারত।

রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বারকানাথ ঠাকুরও ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ সালে বিদেশে যান। দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান ইংল্যাণ্ডে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক বাঙালী মেডিক্যাল ছাত্রদের প্রথম দলটিকে। জর্জ টমসনকে তিনিই নিয়ে আসেন এ দেশে, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের

সদস্যরা সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দ্রুত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বিভিন্ন সভায় তাঁকে উপস্থিত করে বক্তা হিসেবে।

রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

ধর্মসভা এবং ব্রাহ্মসভার মধ্যে ছোটখাট বিবাদ লেগে থাকলেও রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটা তাঁর মৃত্যুর পর আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রামমোহনের সংগ্রামী মনোভাব আর বহুমুখী নতুন চিন্তাভাবনার ছাপ তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। সমাজের চোখে তাঁরা আর তেমন কোন বিপদ হিসেবে গণ্য হতেন না। পরিস্থিতিও পাল্টে গিয়েছিল ততদিনে, বহু কিছু সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীল ইয়ং বেঙ্গলই হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু। এর ফলে রক্ষণশীল সমাজপতিদের দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোরতাও অনেক কমে এসেছিল। ভূম্যধিকারী সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। বর্ষীয়ান পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার রামায়ণ-মহাভারতের পুরনো বাংলা অনুবাদগুলির পরিমার্জন ও অংশত পনর্লিখন করেছিলেন এবং ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুর প্রেস থেকে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

১৮৪৩ সালে নরমপন্থী সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, তার প্রধান স্থপতি ছিলেন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে নিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের পরিমণ্ডল থেকে। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর মানসিক গঠনগত পার্থক্যও ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য আর নতুন চিন্তাভাবনার একটা চমৎকার ভারসাম্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল একান্ত ধর্মপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে। রামমোহনের মতো বহুমুখী ঔৎসুক্য এবং প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর না থাকলেও রামমোহনের অনমনীয় মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐকান্তিকতাটা লাভ করেছিলের দেবেন্দ্রনাথ।

নিজের রাজকীয় পৈতৃক প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা থেকে কিছুটা আকস্মিকভাবেই অন্য দিকে মোড় ফিরেছিলেন যুবক দেবেন্দ্রনাথ। নিজের চারপাশে তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন কিছু সমমনস্ক মানুষকে। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভাই'-ই হয়ে উঠেছিল এঁদের আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার মননশীল চর্চার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই সভা। উন্নত জীবনাদর্শ, মতামত প্রকাশের উৎকর্ষতা এবং চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভা।

১৮৪০ সালে এই সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় এর সুবিখ্যাত মুখপত্র—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।' তত্ত্ববোধিনীর অর্থ সুগভীর চিন্তাভাবনা উপলব্ধি করা এবং তা ছড়িয়ে দেওয়া। এই নামের মর্যাদা যথাযথভাবেই রক্ষা করেছিল পত্রিকাটি। এর মধ্যেই নিহিত ছিল নতুন এক চিন্তাগত আন্দোলনের বীজ, যে আন্দোলন ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলনের থেকে কম আকর্ষণীয় কিন্তু অনেক বেশি সুদৃঢ় ছিল।

অতঃপর মুমূর্ষু ব্রাহ্ম সমাজে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা শুরু করেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রায় কুড়িজন বিশ্বস্ত সহযোগীকে নিয়ে তিনি ৭ই পৌষ (ডিসেম্বর ১৮৪৩) তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে রামমোহনের ধর্মমতে দীক্ষিত হন। শান্তিনিকেতনে তাঁর জগদ্বিখ্যাত পুত্রের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আজও প্রতি বছর পবিত্রভাবে উদ্‌যাপিত হয় এই দিনটি। দেবেন্দ্রনাথ, যাকে পরবর্তীকালে অভিহিত করা হত মহর্ষি বলে, তাঁর নেতৃত্বে পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্ম সমাজ রামমোহন কর্তৃক সূচিত সংস্কৃত ধর্মের আরব্ধ কাজ হাতে তুলে নেয়। তবে ইয়ং বেঙ্গলের চরম ইংরেজিয়ানার বিরোধিতা করার জন্য আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর খুব বেশি জোর দিতে হয় এই পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্ম সমাজকে। এই শেষোক্ত বিষয়টা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে ১৮৪৫ সালে, যখন মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রচার-অভিযান সংগঠিত করেন দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর এই ধর্মান্তরণ-বিরোধী প্রচারাভিযান তাঁদেরকে রাধাকান্ত দেবের মত বষীয়ান রক্ষণশীলদের ঘনিষ্ঠ করে তোলে। অন্যদিকে এই প্রচারাভিযানের ফলে তাঁদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন ডিরোজিওপন্থীরা। একটি সুবিখ্যাত প্রবন্ধে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্ম মতবাদকে মধ্যপন্থীদের আশ্রয়স্থল বলে বর্ণনা করেন। রামগোপাল ঘোষ সংস্কারপন্থীদের চিহ্নিত করেন ভণ্ড হিসেবে। রামতনু লাহিড়ী বলেন যে "বেদান্তবাদীরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিখুন" এবং তাঁরা বাইবেলের প্রত্যাদেশের ব্যাপারটার মুখোমুখী হতে ভয় পাচ্ছেন। অর্থাৎ এঁদের সম্বন্ধে রামতনু লাহিড়ীর ধারণা খুব একটা ভাল ছিল না। ধর্মান্তর সম্বন্ধে তিনি বলেন যে নিজের ইচ্ছেমতো যে-কোন ধর্ম বাছাই করার ব্যাপারে প্রত্যেকের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা উচিত।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬)

দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। তাঁর শিক্ষামূলক রচনাগুলি ভীষণরকম মননধর্মী হওয়া সত্ত্বেও আজও মানুষের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে তিনি আলোচনা শুরু করেছিলেন বহিঃস্থ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এবং

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষামূলক রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে ১৮৫৫ সালে তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন। কিন্তু এর কুড়ি বছর পরেও শ্রুতিলিখন দিয়ে ভারতবর্ষের ধর্ম সম্প্রদায়গুলির এক উৎকৃষ্ট ইতিবৃত্ত রচনার কাজে ব্রতী হতে দেখা গেছে অক্ষয়কুমারকে।

ব্রাহ্মদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মননগত বিদ্রোহটাই সম্ভবত তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রাহ্ম মতবাদ, অনুচ্চারিতভাবে হলেও, তখন পর্যন্ত বিশ্বাস করত বেদের অভ্রান্ততায় এবং নিজের একমাত্র তত্ত্বগত ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করত বেদান্তকে।

ঠিক এই ব্যাপারটাই ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছিল ডিরোজিওপন্থীদের। নিজের মননগত সততা দিয়ে তাঁদের বক্তব্যের যৌক্তিকতাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয়কুমার এবং ধীরে ধীরে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথকেও টেনে আনতে পেরেছিলেন স্বমতে। ১৮৫০ সালে নাগাদ ব্রাহ্ম সমাজ একটা সাচ্চা একেশ্বরবাদী আন্দোলনের চেহারা নেয় এবং একমাত্র তত্ত্বগত আশ্রয় হিসেবে প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির ওপর এতদিনের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)

সুদৃঢ় নরমপন্থী সংস্কার আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নিজের কৃতিত্বে তিনি অর্জন করেছিলেন সারা বাংলার শ্রদ্ধা, ইতিহাসের পাতায় পেয়েছেন এক গৌরবময় আসন। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ সন্তানটি পড়াশোনা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিতের পদ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধাপে ধাপে উন্নীত হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে—১৮৫১ সালে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষাতেও নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। এই দুই সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির এক চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

যে-কোন প্রতিভাধর মানুষের মতো মৌলিকতা আর বীরোচিত সচ্চরিত্রতার শক্তি—এই উভয় গুণই খুঁজে পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সহজভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার একটা নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে রচনা করেছিলেন কয়েকটি প্রাথমিক স্তরের পুস্তক। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর রচনা এক দিকচিহ্নের ভূমিকা পালন করেছে। চমৎকার এক লিখনশৈলী গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যা কিছুটা আড়ম্বরপূর্ণ ও একটু বেশি

মার্জিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৮৪৭ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে বাংলা ভাষায় কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন বিদ্যাসাগর। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই পুস্তকগুলি ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। এইসব পুস্তকের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেন ভারতীয় মহাকাব্য ও লোককথা থেকে এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন উপকথা ও জীবনী থেকে। তাঁর 'বর্ণপরিচয়' আজও ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র পণ্ডিত বা বিদ্বানই ছিলেন না। শিক্ষা-সংস্কারক হিসেবে তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন অব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীদের জন্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ছাত্ররা যাতে কিছুটা ইংরেজি শিক্ষাও পেতে পারে, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসক হিসেবে সরকারি পরিদর্শকের কাজে আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এবং ৪-টি জেলায় মোট ৩৫-টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০-টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি আজ তাঁর নামে চিহ্নিত, সেই প্রতিষ্ঠানটির একেবারে শুরু থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি পরিণত হয় পুরোপুরি ভারতীয় শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে ওঠা উচ্চ শিক্ষার একটি বেসরকারি, ধর্মনিরপেক্ষ ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন বিদ্যাসাগর। কিছুদিন বেথুন স্কুলের সম্পাদকও ছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে সমাজ সংস্কারের যে চমৎকার ঐতিহ্যটা ক্রমশই ভোঁতা হয়ে পড়ছিল, তা আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলেন বিদ্যাসাগর এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেন মানুষের সামনে। ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ না করলেও তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে একান্ত গোঁড়া আবার ইয়ং বেঙ্গলের থেকেও কট্টর এই সুপণ্ডিত মানুষটিই ছিলেন নির্যাতিতদের জন্য রামমোহনের সামাজিক জেহাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যগুলির প্রকৃত উত্তরসূরি।

১৮৫০ সালেই বিদ্যাসাগর মুখর হয়ে উঠেছিলেন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। ১৮৭১-৭৩-এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রচার চালিয়েছেন পুরুষদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে। তবে তিনি সবথেকে স্মরণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ১৮৫৫ সালে। ঐ বছর সামাজিক কুসংস্কারের চরম বিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়েও মুক্তকণ্ঠে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য রামমোহনের মতো তিনিও হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করেন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে। তবে ঠিক রামমোহনের মতোই তাঁর ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল হতভাগ্য ও নির্যাতিতদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ এবং মানবতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। ১৮৪২ সালে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ বিধবা-বিবাহের

স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রচারের ফলেই এই প্রশ্নটা একটা প্রকৃত বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে আইন পাশ হয়, যদিও সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা এই বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে আদৌ রাজি ছিল না।

শেষত, নিজের চারিত্রিক শক্তি ও উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর সাহায্যে মানুষের মনে এক চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আজও তাঁর সম্বন্ধে নানান গল্প মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। যেমন—সরকারের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের ব্যাপারে কতটা স্বাধীনচেতা ছিলেন বিদ্যাসাগর, উপরওয়ালার অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে কিভাবে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি, কত উদার-ভাবে তিনি সাহায্য করতেন গরীব দুঃখীদের, সাধারণ মানুষের কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যেখানে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় আদিবাসীদেরও সঙ্গে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সহযোগীরা

বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮)। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও ১৮৪৯ সালে নারীশিক্ষার জন্য রচিত বেথুন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫০ সালে নারীশিক্ষার স্বপক্ষে জোরালো যুক্তিসম্বলিত একটি রচনা লেখেন তিনি এবং ঐ বছরই লেখেন শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার একটি বই। বাংলাভাষায় একেবারে প্রথম যে কটি শিশুপাঠ্য বই লেখা হয়েছে, এটি তার অন্যতম।

এই পরিমণ্ডলেরই সদস্য ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০)। কালীপ্রসন্নকে বিস্ময়বালক বললে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫৩ সালে প্রায় বাল্যাবস্থাতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' এবং সে সভার কাজ পরিচালনা করেন যোগ্যতার সঙ্গে। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে ১৮৫৬ সালে তিনি ৩ হাজার জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। বিধবা-বিবাহের পর সমাজ যখন কাউকে একঘরে করে দিত, তখন তাদের আর্থিক সাহায্যও করতেন কালীপ্রসন্ন। ১৮৫৬ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সঙ্গে একটি নাট্যশালাও চালু করেছিলেন তিনি। তবে কালীপ্রসন্নর কর্মজীবনের বেশির ভাগ অংশটাই আমাদের আলোচ্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

যে 'কালা আইন' বিতর্কে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গল নেতা রামগোপাল ঘোষ, সেই বিতর্ক দেশে এক প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই রাজনৈতিক উত্তেজনার ফল হিসেবেই ১৮৫১ সালে গড়ে উঠেছিল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।' চরমপন্থী, নরমপন্থী, এমনকি রক্ষণশীল

সমস্ত গোষ্ঠীই যোগ দিয়েছিল এই সংগঠনে। চরমপন্থী 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' আর নরমপন্থীদের 'ভূম্যধিকারী সভা'—দুটো সংগঠনেরই বিলোপ ঘটানো হয় এবং এই নতুন সংগঠন ভারতবর্ষের স্বার্থ ও ভারতীয়দের অধিকার রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলে এক নতুন সুসংহত ঐক্য। আগের দুটো সংগঠনে যে-কেউ সদস্য হতে পারত। কিন্তু এই নতুন সংগঠনের সদস্য হতে পারত কেবলমাত্র ভারতীয়রাই। সংগঠনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যান্য মহানগরীগুলির উদ্দেশে প্রেরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠিত প্রচার-আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

১৮৫৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদপত্রে সংশোধন আসন্ন হয়ে উঠছে অনুভব করে এই সংগঠন ভারতীয়দের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৫২ সালে রচিত এই স্মারকলিপিটির খসড়া রচনা করেন প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৩ সালে যখন সংগঠনের মুখপত্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' চালু হয়, তখন তার সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই। ব্রাহ্ম মতবাদ সম্বন্ধে ইংরিজিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন তিনি। এই স্মারকলিপিতে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয় যা পরবর্তীকালে একাধিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। স্মারকলিপিতে লিখিত দাবিগুলির মধ্যে ছিল—নীলচাষ ও লবণ উৎপাদনের ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটানো, ভারতীয় শিল্পগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য মঞ্জুর করা, বিভিন্ন উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা, ভারতীয় সংখ্যাধিক্যবিশিষ্ট একটি ভারতীয় বিধানমণ্ডলী (legislature) গঠন করা ইত্যাদি। এক কথায়, উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটেছিল এই স্মারকলিপিতে।

পঞ্চাশের দশকে যথেষ্টই সক্রিয় ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ঐতিহাসিক রুট্‌লেজ (Routledge) এই সংগঠনকে এর সদৃশ ইংরেজদের একটি সংগঠনের হুবহু প্রতিরূপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রায়তদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানোর জন্য ১৮৫৬ সালে মিশনারিদের দ্বারা প্রচারিত একটি স্মারকলিপিকে সমর্থন করে এই সংগঠন। পরের বছর ভারতীয় বিদ্রোহের ঠিক প্রাক্কালে ইউরোপিয়রা যখন সিপাহিদের সাধারণ জেলা আদালতের আওতায় নিয়ে আসার জন্য নতুন করে হৈ-চৈ শুরু করে, তখন একটা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন এক পদ্ধতি দ্রুত গতিতে বিকশিত হয়ে উঠছিল বাংলার মাটিতে।

সরকারি নীতির পরিবর্তন

১৮৩৩-৫৭'র পর্যায়টা বিশিষ্ট হয়ে আছে সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছু

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার জন্য—তবে সরকার এই পরিবর্তনগুলো ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল জাগ্রত জনমতের চাপেই। ১৮৩৫ সাল একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ঐ বছরেই শিক্ষানীতির ব্যাপারে দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছিলেন মেকলে ও বেণ্টিঙ্ক। পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষেই মত দিয়েছিল সরকার, যার সপক্ষে সেই ১৮২৩ সালেই মুখর হয়েছিলেন রামমোহন। সরকারের এই সিদ্ধান্তে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরাও, কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যেই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহ মূর্ত হয়ে আছে বলে বিশ্বাস করতেন তাঁরা। সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন মেট্‌কাফ। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মেডিক্যাল কলেজ এবং ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি।

১৮৪৯ সালে 'কালা আইন' মারফৎ আইনের চোখে সকলকে সমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সাফল্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে বেথুন স্কুল। ১৮৫৩-এর 'চার্টার অ্যাক্ট'-এ কিছু কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়, যদিও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দাবির তুলনায় তা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ১৮৫৪ সালের 'এডুকেশনাল ডেস্‌প্যাচ' শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের বনিয়াদ রচনা করে দিয়েছিল। ১৮৫৬ সালে গঠিত হয়েছিল 'ডিপার্টমেণ্ট অফ পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শন'। ১৮৫৭ সালে, অর্থাৎ ভারতীয় বিদ্রোহের বছরে, দেশের তিনটি প্রধান শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪

১৮৫৭-৮৫

বিদ্রোহের পর

ভারতীয় বিদ্রোহটা ছিল এক মিশ্র চরিত্রের অভ্যুত্থান। উত্তরপ্রদেশের (Oudh) মতো কিছু কিছু অঞ্চলে এই বিদ্রোহের একটা গণভিত্তি থাকলেও প্রায় সর্বত্রই নেতৃত্বটা ছিল এমন একটা ধাঁচের যা ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আদৌ আকৃষ্ট করতে পারেনি। তথাকথিত বেঙ্গল আর্মি'র অভ্যুদয় কোন সাড়াই জাগাতে পারেনি শিক্ষিত বাঙালীদের মনে, অথচ এই শিক্ষিত বাঙালীরা কিন্তু ততদিনে ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে যথেষ্টই মুখর ভূমিকা নিয়েছে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা যা দ্রুত একটা বিশেষ শক্তিতে পরিণত হচ্ছিল—মানুষকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য প্রচার শুরু করে। লর্ড ক্যানিং-এর মধ্যপন্থাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এই পত্রিকাটি একদিকে বিদ্রোহের বিরোধিতা করতে থাকে আর অন্যদিকে প্রচার চালায় প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য আতঙ্কিত ইউরোপিয়দের আবেদনের বিরুদ্ধে। এই পত্রিকার প্রদর্শিত পথটিই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর নতুন বাংলার পথ। বিদ্রোহের ঘটনায় প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। অতি-নরমপন্থী চিন্তাভাবনা প্রবল রূপ নেয়, বড় হয়ে ওঠে ভূস্বামীদের স্বার্থ-রক্ষার প্রচেষ্টা। বিশৃঙ্খলা ও গণবিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় হিসেবে উত্তর ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ ঘটানোর আবেদন জানায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৫৯ সালে।

নীলচাষ

বাংলার সৌভাগ্য যে এই অস্বস্তিকর আশঙ্কার মনোভাবটা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি, ফিরে এসেছিল সমালোচনার সাহস—বরং কিছুটা জোরদার ভাবেই। এর পিছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল প্রবল নীল আন্দোলন। ১৮৫৯-৬০ সালে সারা দেশের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো বয়ে গিয়েছিল এই আন্দোলন, পরিণত হয়েছিল বাংলার সচেতনতা বৃদ্ধির একটি উজ্জ্বল দিকচিহ্নে। দীর্ঘদিন ধরে নীলচাষ ছিল ইউরোপিয় নীলকরদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত। রামমোহনের আমল পর্যন্ত মনে হত নীলচাষ হচ্ছে চিরাচরিত চাষবাসের থেকে একটা অগ্রসর পদক্ষেপ এবং এই চাষ কৃষকদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে। গোটা ব্যবস্থার নিপীড়নমূলক দিকটা তখনও তেমন প্রকট হয়ে

ওঠেনি এবং সে দিকটার কথা ঠিক মতো জানাও যায়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ নীলকরদের অত্যাচার চরমে ওঠে। বেশি বেশি মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষ করাতে গিয়ে কৃষকদের ওপর নিপীড়ন চালাতে শুরু করে ইংরেজ নীলকর আর তাদের এ-দেশীয় দালালরা। চাষীদের হাতে জোর করে দাদন ধরিয়ে দিয়ে বাধ্য করা হত জমিতে নীল বুনতে। ফলন বাড়ানোর জন্য ভয়ংকর চাপ দেওয়া হত অসহায় চাষীদের ওপর। যারা অস্বীকার করত নীলচাষ করতে, তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার চালাত নীলকররা। বে-আইনি প্রহার, বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা, বলাৎকার প্রভৃতি পরিণত হয়েছিল দৈনন্দিন ব্যাপারে। এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও অনুভব করেছিলেন যে নীলকররা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধই ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি।

গণ-অভ্যুত্থান (১৮৫৯-৬০)

নীলকরদের অত্যাচারে চাষীদের মধ্যে এক সত্যিকারের গণ-অভ্যুত্থান মাথা তোলে, যাকে এমনকি রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পর্যন্ত উল্লেখ করেছে "জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন" বলে। নীলচাষ ঐচ্ছিক ভিত্তিতে করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল সরকার। নীল-করদের অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে নীল চাষ না করার ব্যাপারে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৮৫৯ সালে হাজার হাজার কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নীল বুনতে অস্বীকার করে। স্যার জন পিটার গ্রান্ট যখন জলযাত্রায় বেরোন, তখন নদীর দুধারের, হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাঁর কাছে আবেদন জানায় তাদেরকে জোর করে নীল বুনতে বাধ্য করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এর পরেও কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নীলকররা তাদের পোষা গুন্ডাদের সাহায্যে অসহায় কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে।

সংগ্রাম দুর্বার রূপ নেয় গ্রামাঞ্চলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় তাদের নিজস্ব নেতারা। উত্তরবঙ্গে নির্যাতিত মানুষের নেতৃত্বে এসে দাঁড়ান ওয়াহাবি রফিক মন্ডল, যিনি "প্রতিটা লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন চরম সীমা পর্যন্ত"। মধ্যবঙ্গে দুই বিশ্বাস ভ্রাতা, বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর, নীলকরদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কৃষকদের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। একদিকে তাঁরা কৃষকদের হয়ে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করতে থাকেন, অন্যদিকে নীলকরদের পোষা গুন্ডাদের বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলেই প্রতিরোধ সংগঠিত করতে শুরু করেন।

বুর্জোয়াদের ক্রোধের স্ফুরণ

কৃষকদের গণসংগ্রামে দারুণভাবে সাড়া দেয় বাংলার শিক্ষিত সমাজ। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ায়। পত্রিকায় সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরের পর জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। যে-সব কৃষক আর তাদের প্রতিনিধিরা দলে দলে এসে হাজির হত তাঁর দুয়ারে, তাদেরকে ব্যবহারিক পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে শুরু করেন হরিশচন্দ্র। মনোমোহন ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষ নামক দুজন যুবক— পরবর্তীকালে দুজনেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন—ঝাঁপিয়ে পড়েন আন্দোলনে।

১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র, যিনি তখন সরকারি কর্মচারি ছিলেন, নিজের নাম না দিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি লেখেন। এই বইটি পাঠকদের যতটা উদ্বেল করে তুলতে পেরেছিল, তা আজ পর্যন্ত খুব কম বই-ই করতে পেরেছে। নীলকর শাসনের আতঙ্কজনক রূপের বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই নাটকটিকে তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন উদীয়মান কবি মধুসূদন দত্ত। অনুবাদটি প্রকাশিত হয় রেভারেণ্ড লং-এর নামে, ফলে তাঁকে প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করে নীলকররা। জনৈক ইংরেজ বিচারক লং-এর হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন, কিন্তু সেই টাকা তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দেন তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহ।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত হন মানহানির মামলায়। এমনকি ১৮৬১ সালে অকালে তাঁর মৃত্যুর পরেও নীলকররা তাঁর পরিবারকে টেনে আনে আদালতে। এর ফলে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে হরিশচন্দ্রের পরিবার। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও এই আন্দোলন একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেই ছিল। ১৮৬০ সালের 'ইণ্ডিগো কমিশন' বাধ্য হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের প্রচণ্ড অত্যাচারের কথা স্বীকার করতে। এর ফলে তীব্র অত্যাচার আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠতে থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। কালক্রমে কৃত্রিম রঙ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর অবসান ঘটে নীল চাষের।

সৃজনশীল সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা

বাংলার ইতিহাসে বিদ্রোহ-পরবর্তী যুগে নীল বিদ্রোহের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সৃজনশীল সাহিত্যের এক বিপুল স্ফুরণ। সাহিত্যের নবজাগরণ শুরু হয়েছিল মধুসূদন দত্তর কাব্য, দীনবন্ধু মিত্রর নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অন্তরাত্মা নিজের মনোমত মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল নিজের মর্মকথা। সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছিল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাও।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

ত্রিশের দশকের শেষদিকে এবং চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে হিন্দু কলেজের এক বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রের নাম ছিল মধুসূদন দত্ত। ঐ কলেজে ডিরোজিওপন্থীদের

প্রভাব তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ইংরেজিয়ানার স্রোত অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছিল মধুসূদনকে, তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবর্জিত এবং বিদেশঘেঁষা। যথেচ্ছ উদ্দাম জীবনযাত্রার অভ্যন্ত কোন ইতালিয় মানবতাবাদীর ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর জীবনযাত্রায়। ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রভাবও ছাপ ফেলেছিল তাঁর জীবনে। এই ডি. এল. রিচার্ডসন তাঁর কলেজের ছাত্রদের মনে শেকসপিয়ার ও রোমাণ্টিক কবিতা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মোহ সঞ্চার করেছিলেন।

মধুসূদন ইংরিজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৪৩ সালে খ্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে চমকে দেন কলকাতার সমাজজীবনকে। তাঁর খ্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করার পিছনে তেমন কোন ধর্মীয় বিশ্বাস কাজ করেনি। মূলত কিছু ব্যক্তিগত কারণেই তিনি ঐ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কলেজ জীবন এবং মাদ্রাজে আট বছর বসবাসের পাট চুকিয়ে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৫৬ সালে। অক্ষয়-কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষিত বাঙালীরা তখন আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে আশ্রয় নিচ্ছিলেন নিজেদের মাতৃভাষারই। প্রতিভাধর মধুসূদনও নিজের স্বভাবজ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই নতুন জোয়ারে।

১৮৫৯ সালে মঞ্চস্থ হয় তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। প্রচণ্ড সাড়া জাগায় নাটকটি, কেননা নাটকের চিরাচরিত রীতির থেকে এ নাটক ছিল একেবারেই অন্যরকম। এর পর একই ধাঁচের আরও দুটো নাটক লেখেন মধুসূদন। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় দুটো প্রহসন, যাতে পাশ্চাত্যপন্থী ছোকরা আর প্রাচীনপন্থী বুড়ো বদমাশদের বিরুদ্ধে একইরকম কঠোর কশাঘাত হানেন তিনি। ১৮৬০ সালেই তিনি বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত করেন এবং পরের বছর প্রকাশিত হয় ঐ ছন্দে রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ'।

বাংলা ভাষায় যে নতুন কবিতার অন্যতম স্থপতি এবং মহত্তম প্রকাশকর্মীর মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন মধুসূদন, শুধু কবিতার অসীম সম্ভাবনা তুলে ধরাটুকুই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। এর পাশাপাশি অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও প্রথাবিরোধী ভঙ্গীতে তিনি রচনার উপজীব্য করেছেন পৌরাণিক বিষয়কে, পুনর্মূল্যায়ন করেছেন চিরাচরিত মূল্যবোধের, মহিমান্বিত করে তুলেছেন বিদ্রোহী সত্তাকে। তিন বছরের মধ্যেই সাহিত্য জগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন মধুসূদন। পরবর্তীকালে এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ১৮৬৫-৬৬-তে তিনি বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতার সূত্রপাত ঘটান। জীবনে অত্যন্ত করুণ পরিণতিরই মুখোমুখি হয়েছেন মধুসূদন, কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রতিভা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৮-৭৩)

কৌতুকের অফুরান ভাণ্ডার, সরকারি কাজের সম্মানজনক জীবিকা এবং জীবন সম্বন্ধে অনেকটাই প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী—এই সবকিছু মিলিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র খুঁজে পাই আমরা। কিন্তু ছোটখাট কবিতার বদলে বড় মাপের নাটক রচনায় হাত দিয়ে তিনিও তাঁর বিশিষ্টতার প্রমাণ রেখেছিলেন। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'নীলদর্পণ' নাটকে নিজের ক্ষমতার চরম প্রমাণ রেখেছিলেন দীনবন্ধু। নীলচাষকেন্দ্রিক সংকটের চূড়ান্ত অবস্থায় রচিত এ নাটক সামাজিক প্রতিবাদ আর নীলকরদের অত্যাচারকে নগ্নভাবে তুলে ধরার এক উজ্জ্বল নজির। এদিক থেকে এর সমতুল নাটক বাংলাভাষায় আজও দুর্লভ। সামাজিক প্রহসনমূলক নাটকে তিনি মধুসূদনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের প্রতিভার জোরে একটা সম্মানজনক আসন অর্জন করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)

দীনবন্ধু মিত্রর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা গদ্যে এক চমৎকার সাহিত্যিক আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল এই আঙ্গিক। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। সমগ্র সাহিত্য জগতকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স (উপন্যাস) 'দুর্গেশনন্দিনী'। পাঠক সমাজের কাছে এ উপন্যাস ছিল এক চমকপ্রদ সৃষ্টি এবং এই উপন্যাস থেকেই সূচিত হয় রোমান্টিক উপন্যাস রচনার ধারা। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা ভাষায় সামাজিক উপন্যাসকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

১৮৭২ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এবং চার বছর পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। এটাই ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ সাংস্কৃতিক পত্রিকা। এই পত্রিকার চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন একদল লেখক। সেইসব লেখকদের চোখে আর পাঠক সমাজের চোখে বঙ্কিমই ছিলেন তখনকার সাহিত্য জগতের অবিসংবাদী নেতা।

১৮৭৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত' রচনায় তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। সেই চরিত্রটির মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন মানবতা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁর নিজের সযত্নলালিত ধারণাকেই। ১৮৭৯ সালে যৌথভাবে পুনর্মুদ্রিত 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের প্রতি নিজের সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, সমর্থন জানিয়েছেন সমতাবাদের প্রতি। ইউটোপিয় বা কল্পনামূলক সমাজতন্ত্রের প্রভাব যে তাঁর ওপর পড়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় এই রচনায়। অতঃপর দেশপ্রেমের পুনরুজ্জীবনের

জোয়ার উদ্দীপ্ত করে তোলে বঙ্কিমচন্দ্রকে। ১৮৮২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তাঁর এই দেশপ্রেম চমৎকারভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল সুবিখ্যাত বন্দেমাতরম্ স্তোত্রটি। পরবর্তী জীবনে তিনি আকৃষ্ট হন ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় এবং আমাদের পুরাণ-গুলিতে বর্ণিত কৃষ্ণ চরিত্রটির যথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের প্রচারক, কিন্তু তাঁর লেখায় হিন্দু পুনরুজ্জীবনের একটা ছাপ ছিলই যার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু চরিত্র এবং হিন্দু ঐতিহ্যের ওপর তাঁর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে। তবে একটা বিশেষ গদ্যরীতির জন্ম দেওয়াটাই ছিল তাঁর মহত্তম কীর্তি। তাঁর এই গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা আর টেকচাঁদ ঠাকুরের অমার্জিত কথ্যভাষার মধ্যে একটা মাঝামাঝি পথ রচনা করে দিয়েছিল।

জনপ্রিয় গদ্যরীতির পরীক্ষানিরীক্ষা

টেকচাঁদ ঠাকুর হচ্ছে ডিরোজিওপন্থী প্যারীচাঁদ মিত্রেরই ছদ্মনাম, যিনি তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যৌথভাবে ভাষার লিখিত রূপের থেকে আলাদা একেবারেই কথ্য রীতিতে লিখিত 'মাসিক পত্রিকা' নামক সাময়িকপত্রটি চালাতেন। ১৮৫৮ সালে এই নতুন গদ্যরীতিতে প্যারীচাঁদ লেখেন 'আলালের ঘরের দুলাল।' এই ধারাতেই ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা।' কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার দ্যুতিতে ম্লান হয়ে যায় কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার এই জেহাদ। এই রীতির অনুগামীরা ছিলেন বড়জোর শিথিল-উদ্যম প্রবর্তক মাত্র, যাঁরা কখনোই এই রীতিটিকে অবিচল ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেননি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০)

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে আড়ম্বরপূর্ণ গদ্যরীতিতে যথেষ্টই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে সুবৃহৎ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ। এই বিশাল কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে। বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ছিল কালীপ্রসন্নর, কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৬১ সালে তিনি লং-এর জরিমানার টাকা মিটিয়েছিলেন এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর হতভাগ্য সম্পাদকের মৃত্যুর পর রক্ষা করেছিলেন পত্রিকাটিকে। জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন কালীপ্রসন্ন। ১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে ত্রাণ পাঠানোর জন্য মানুষের কাছে এক স্মরণীয় আবেদন জানিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল'-এ আর্থিক সাহায্য করেছিলেন কালীপ্রসন্ন। ১৮৬২ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুণ যখন ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মজুররা চরম সঙ্কটে পড়ে, তখন তাদের সাহায্যার্থে তিনি ৩ হাজার টাকা

পাঠিয়েছিলেন। কলকাতা শহরে তিনি নিজের খরচে বেশ কিছু ফোয়ারা বসিয়েছিলেন। 'শান্তিরক্ষক' (Justice of the Peace) কালীপ্রসন্নকে এদেশীয় দুর্বৃত্তরা আর বিদেশী বদমাশরা যমের মতো ভয় করত। তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় মধুসূদন দত্তকে (১৮৬১) আর রেভারেণ্ড জেম্স্ লংকে (১৮৬২)।

অপ্রধান কবিরা

একমাত্র মধুসূদনকে বাদ দিলে এই সময়ে বাংলা কবিতার অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। সাহিত্যের আকাশে মধুসূদন পূর্ণভাবে উদিত হওয়ার আগে প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। এই কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের মনোভাব। বস্তুতপক্ষে এই সময় দেশপ্রেম মূলক কবিতা লেখার একটা জোয়ার এসেছিল। এই জোয়ারেই অনুপ্রাণিত হন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। এঁরা দুজনে মহাকাব্য রচনা করেন এবং সেগুলো মোটামুটি জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। ভবিষ্যতের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ কবি ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪)। বিহারীলালের রোমান্টিক গীতিধর্মী কবিতা সে সময় মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট না করলেও পরবর্তীকালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬)

এই যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বাংলা সংবাদপত্রগুলির অমার্জিত রীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। দু'দশক ধরে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর শক্তিশালী লেখনী দিয়ে তিনি নির্ভীকচিত্তে সংগ্রাম চালিয়ে যান প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমর্থন করেন প্রতিটি মহৎ উদ্দেশ্যকে। বাংলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল তাঁর লেখনী।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)

সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলার ইতিহাস বিষয়ক পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ভারতীয় বিদ্রোহের আগের দশকে তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক—পাশ্চাত্যের বেশ কিছু প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও বড় করে তুলেছিলেন আর পাশ্চাত্যের এই প্রাচ্যতত্ত্ববিদরাই প্রথম ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে উদ্ধার করেন অজানার অন্ধকার থেকে। বিদ্রোহের পর রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন এবং ১৮৮৫ সালে উন্নীত

হন সভাপতির পদে। এই পদপ্রাপ্তিটা ছিল ১২-টি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং প্রায় ৫০-টি গ্রন্থের লেখক রাজেন্দ্রলালের প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি। রাজেন্দ্রলালই হচ্ছেন আমাদের প্রথম ইতিহাস-গবেষক। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশী পণ্ডিতদের কাছ থেকে যথেষ্ট স্বীকৃতিও পেয়েছেন তিনি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। বাংলাভাষায় তিনি বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন, মানচিত্র এঁকেছেন। দেশপ্রেমমূলক পাঠ্যপুস্তক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু রচনা লিখেছেন। ১৮৮২ সালে বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল যে 'সারস্বত সমাজ,' তিনি তার সভাপতি ছিলেন। তবে এই প্রতিষ্ঠানটি বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারেনি। ১৮৫১ এবং ১৮৬৩ সালে তিনি বাংলাভাষায় দুটি উচ্চাঙ্গের সচিত্র সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে আমলের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন গণ কার্যকলাপ ও প্রচার-আন্দোলনে কিছুটা ভূমিকা ছিল রাজেন্দ্রলালের।

অন্যান্য মননশীল কার্যকলাপ

আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুটি গৌণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং ১৮৭৬ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'। এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে ভারতীয় বিদ্রোহ চলাকালীন প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছিল, ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষাগত প্রয়োজন মোটানোর একটি কেন্দ্রে। ইংরেজ শাসনের পায়ে পায়ে শিক্ষিত বাঙালীরা তাদের নবজাগরণের মশাল হাতে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

ধর্মীয় সংস্কার এবং পুনরুত্থানবাদ

সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি এই সময়ে ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারেরও একটা জোয়ার এসেছিল। ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ (revivalism) এই সময় আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদ জানায় পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে। এই পর্যায়টা ছিল একদিকে কেশবচন্দ্র সেন ও তরুণ ব্রাহ্মদের যুগ, আর অপরদিকে ওয়াহাবি আন্দোলন, নব্য হিন্দু মতবাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের যুগ।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)

এক সুপ্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে আর ধর্মীয় চিন্তাভাবনার ব্যাপারে গভীর

উৎসাহ ছিল তাঁর। দুঃস্থদের জন্য ১৮৫৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি নৈশ বিদ্যালয়, ১৮৫৭ সালে 'গুডউইল ফ্র্যাটারনিটি' সভা এবং সুবক্তা হিসেবে অর্জন করেন বিপুল খ্যাতি।

বিদ্রোহের পরের বছর কেশবচন্দ্র যোগ দেন ব্রাহ্মসমাজে। তত্ত্ববোধিনী আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির পর যে নিশ্চলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ, তা থেকে তাকে কয়েক বছরের মধ্যেই টেনে তোলেন তিনি। ব্রাহ্মধর্মকে এতটাই উদ্দীপ্ত করে তুলতে পেরেছিলেন তিনি যে সংগঠন হিসেবে দেশের একটা প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ এবং যুবকরা যেভাবে দলে দলে যোগ দিয়েছিল এই ধর্মে তা তার আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। ১৮৫৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, ধর্মীয় আলোচনার জন্য ১৮৬০ সালে চালু করেন 'সঙ্গত সভা' এবং ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্ম ধর্মের স্বার্থে ১৮৬১ সালে তিনি সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নিয়োজিত করেন নিজেকে। পরের বছর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কর্মচঞ্চল যুবকটিকে অভিহিত করেন 'ব্রহ্মানন্দ' নামে। ১৮৬৪ সালে চালু হয় ধর্মবিষয়ক বাংলা পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব'। পরের বছর গঠিত হয় 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'।

নতুন বিশ্বাসের ব্যাপারে কিছু নিষ্ক্রিয় কচকচি করা ছাড়া আর কিছুই করতেন না বয়স্ক নেতারা। কিন্তু এটুকুতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি কেশবচন্দ্র। ১৮৬৪-৬৫ সালে তিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্যটনে বেরোন, সংগঠনের বিস্তার ঘটান নতুন নতুন জায়গায়। এর ফলে সারা ভারতে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর প্রচারের ফলে পূর্ববাংলায় একই সঙ্গে উদ্দীপনা ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। জেলা শহরগুলিতে মাথা তুলে দাঁড়ায় ছোট ছোট ব্রাহ্ম গোষ্ঠী ও ব্যক্তি, কাজ শুরু করে তারা এবং ফল স্বরূপ মুখোমুখি হয় নানান নির্যাতনের।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে একটা র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠী এবং এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সমালোচনা করতে শুরু করে পুরনো নেতাদের। অক্ষয়কুমার দত্তর প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের অলঙ্ঘনীয়তায় তাঁর বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি পুরনো পন্থাই মেনে চলতেন, কারণ তিনি সর্বদাই এই আশঙ্কায় ভুগতেন যে এ-সব মেনে না চললে তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে আন্দোলনের সৃজনভূমিস্বরূপ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দূরত্বটা আরও বেড়েই চলবে। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা দাবি করেন যে-সব ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ব্রহ্মণত্বের প্রতীক উপবীতটি পরিত্যাগ করেননি তাঁদেরকে ধর্মোপদেশ দানের বেদীতে যেতে দেওয়া চলবে না, উপাসনা-সভায় যোগদানের অধিকার দিতে হবে মেয়েদের, উৎসাহিত করতে হবে অসবর্ণ বিবাহকে।

ব্রাহ্ম যুবকদের একটি সভা এবং ব্রাহ্ম নারীদের একটি সংস্থা সংগঠিত করেন

কেশবচন্দ্র। ভাঙন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ।' বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে ইংল্যাণ্ডে তিনি যথেষ্ট সংবর্ধনা লাভ করেন।

১৮৭২ সালে নিজের সহকর্মীদের নিয়ে একটা আশ্রম চালাতে শুরু করেন কেশবচন্দ্র। সর্বাঙ্গীন সংস্কার প্রচেষ্টায় তখনও একইরকম উৎসাহ বোধ করতেন তিনি। ১৮৭২ সালে প্রচলিত নিয়মবিরোধী জাতি-বর্ণহীন বিবাহকে আইনসঙ্গত করার জন্য একটি বিশেষ বিবাহবিধি পাশ হয়। প্রকাশিত হয় এক পয়সার দৈনিক সংবাদপত্র, শ্রমিকদের কছে উদাত্ত আহবান রাখেন কেশবচন্দ্র—উঠে দাঁড়াও, প্রতিষ্ঠা করো নিজেদের অধিকার। শ্রমিকদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় চালাতে শুরু করেন তাঁর সহযোগীরা।

নবীন ব্রাহ্মরা

কেশবচন্দ্র সেন তাঁর চারপাশে এমন কিছু উদ্দীপনাময় তরুণকে জড়ো করেছিলেন যারা কিছুদিনের মধ্যেই অগ্রসর চিন্তাভাবনায় তাঁকে ছাপিয়ে যেতে শুরু করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিদ্বান ও সুপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বরিশালের সমাজ-সংস্কারক দুর্গামোহন দাস, নারীমুক্তি ও সমাজের নিচুতলার মানুষদের একনিষ্ঠ সমর্থক ঢাকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের শান্ত অথচ দুঃসাহসী আনন্দমোহন বসু।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব এবং উপাসনা-গৃহ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর তথাকথিত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে থাকেন নবীন ব্রাহ্মরা। অনুগত শিষ্যরা যেভাবে তোষামোদ করত কেশবচন্দ্রকে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আস্তে আস্তে যেভাবে বেড়ে উঠেছিল অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা—তাতে আহত হচ্ছিল এইসব নবীনদের গণতান্ত্রিক মনোভাব। কেশবচন্দ্রের নিজের উদ্যোগেই ব্রাহ্মদের মধ্যে যে নতুন বিবাহরীতির সূচনা হয়েছিল, তা অস্বীকার করে তিনি যখন পুরনো প্রথাতেই কোচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের নাবালিকা কন্যার বিবাহ দেন, তখনই ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কেশবচন্দ্র এই বিবাহকে একটা বিশেষ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করায় নবীনরা আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নবীন ব্রাহ্মরা এবং ১৮৭৮ সালে গড়ে তোলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।' এই সংগঠনের একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রচিত হয়। সংগঠনের বাংলা মুখপত্রে ১৮৮২ সালে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনাই ব্রাহ্ম আদর্শের একমাত্র কথা নয়, ব্রাহ্ম আদর্শ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতাকাতলে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তি।

তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নবীন ব্রাহ্মরা।

তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সর্বভারতীয় নেতারাও। ১৮৭৬ সালেই শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে এঁরা কয়েকজন স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন, অস্বীকার করেন বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি করতে, তবে দেশের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা। তাঁদের মুখপত্র 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' সে সময়কার রাজনৈতিক প্রচার-অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ করা দরকার যে নবীন ব্রাহ্মদের এই আপোষহীন, অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলে ইয়ং বেঙ্গলের শেষ দুজন প্রতিনিধি, শিবচন্দ্র দেব আর রামতনু লাহিড়ী, এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু কোচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে ভাঙন ঘটে যাওয়ার পর কেশবচন্দ্রের অনুগামীরা আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়েন আবেগপ্রবণতার দিকে এবং তাঁর 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' তখন থেকেই সকল ধর্মের এক নতুন মিশ্রণ বা সংশ্লেষণের কথা বলতে শুরু করে।

সুরাপান নিবারণী সভা

সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের একটি আপাত গৌণ বিষয় নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন প্যারীচরণ সরকার। তাঁর উদ্যোগে ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সুরাপান নিবারণী সভা'। দুটি মাসিক মুখপত্র ছিল সভার। সুরাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যথেষ্টই সাফল্য অর্জন করে এই সভা এবং ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব থেকে সমাজকে অনেকটাই মুক্ত করে। এই সভার লড়াই ছিল সেই অভিশাপের বিরুদ্ধে, যা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন সিংহর মতো প্রতিভাবান তরুণদের, যা নিয়ে প্রহসন লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্ত।

হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান

যথানিয়মেই কেশবচন্দ্র সেন এবং তরুণ ব্রাহ্মদের একসময় প্রাচীনপন্থীদের জোরদার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। সমাজের সযত্নলালিত প্রথাগুলোকে শুধু কথায় নয় কাজেও অস্বীকার করতে শুরু করেছিল ব্রাহ্মরা এবং তার ফলে রক্ষণশীলদের পুঞ্জীভূত বেদনা রূপান্তরিত হয়েছিল ক্রোধে। ব্রাহ্মদের আপোষহীনতাই ছিল একটা যৌথ আন্দোলন, তাই ইয়ং বেঙ্গলের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতার থেকে এটা ছিল অনেক বেশি বিপজ্জনক।

গোঁড়ামিপন্থীরা এদেরকে সামাজিকভাবে নির্যাতন করে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে নতুন বিশ্বাসে দীক্ষিত অনেক যুবককে নিজেদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। পুরনো সমাজের সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের নৈতিক গুণাবলী সম্বন্ধে কিছুটা অস্বস্তি ছিলই আর আর তার ফলেই দেখা দেয় ব্রাহ্মদের নীতিবাগিশতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার

রেওয়াজ। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল প্রাচীনপন্থীরা, তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলারও চেষ্টা চলে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই ধারার অনুসারী ছিলেন।
রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গর্ববোধ আর আত্মবিশ্বাসও বেড়ে চলেছিল এবং মুসলিমদের পশ্চাদপদতার দরুণ এই বোধটা আগের থেকে আরও বেশি করেই হিন্দুত্বের খোলসে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশপ্রেমিক লেখকরা তাঁদের লেখায় শুধুমাত্র হিন্দু কাঠামোবিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকেই মহিমান্বিত করে তুলতেন না, সেইসঙ্গে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা তুলে ধরতেন রাজপুত, মারাঠা, শিখদের সংগ্রামের কথা। বস্তুতপক্ষে এই প্রতিটি জাতির সংগ্রামেই প্রতিপক্ষ ছিল এক ও অভিন্ন—মুসলিমরা। এর ফলে জাতীয় চেতনায় আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল হিন্দু প্রবণতা, যদিও তার ফলাফল খুব সুখকর হয়নি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৯৩৬-৮৬)

তবে হিন্দুধর্মের এই পুনরুত্থানে একটা দারুণ আকর্ষণীয়, সুমিষ্ট এবং মাধুর্যের দিকও ছিল। এই দিকটার উৎস ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ পরমহংস। অসংখ্য মানুষকে ঈশ্বর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছিলেন রামকৃষ্ণ। এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ তাঁর পবিত্র চরিত্র, চুম্বকতুল্য আকর্ষণশক্তি আর সহজ-সরল প্রজ্ঞার আভায় আলোড়িত করেছিলেন হাজার হাজার মানুষকে। যাঁরা তাঁর ধর্মমতের সঙ্গে একমত ছিলেন না, তাঁরাও বাধ্য হয়েছিলেন রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতে। যাবতীয় ধর্মমতকেই পবিত্র বলে মনে করার শিক্ষা দিয়ে প্রতিবাদী জঙ্গী মনোভাবকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন তিনি এবং জোরদার করে তুলেছিলেন প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসীদের টলে যাওয়া মনোবলকে। পরবর্তীকালে একটি সুবৃহৎ সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। আজও অগণিত হিন্দু গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে।

মুসলিম পুনরুত্থান

এর ঠিক বিপরীতে মুসলিম ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে ওয়াহাবি আন্দোলনের মধ্যে। এই আন্দোলন বাংলার বুকে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সে সম্বন্ধে আজও অনেক কিছুই জানি না আমরা। বিরুদ্ধতাবাদী আন্দোলন হিসেবে ওয়াহাবি মতবাদের সূচনা হয়েছিল আরবে। বিশ্বাসের দিক থেকে ওয়াহাবি মতবাদ ছিল অ্যানাব্যাপটিস্ট ধাঁচের আর এর রাজনীতিটা ছিল সংগ্রামী প্রজাতন্ত্রী (red republican) ধরনের। রামমোহনের সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তি এই মতবাদ এদেশে নিয়ে আসেন এবং পাটনা এই নতুন ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রধান কেন্দ্র

পরিণত হয়। বাংলার কোন কোন অঞ্চলের হতদরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে ওয়াহাবি মতবাদ।

নীল বিদ্রোহের সময় কৃষকদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন জনৈক ওয়াহাবি। প্রজাদের খেপিয়ে তোলার অভিযোগে তাঁর পুত্র আমরুদ্দিন ১৮৭১ সালে কারারুদ্ধ হন। ওয়াহাবিদেরই প্রথম রাজনৈতিক আসামী হিসেবে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এরাই ছিল এদেশের প্রথম সন্ত্রাসবাদী। ১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় খুন হন প্রধান বিচারপতি। ফাঁসি হয় হত্যাকারী আবদুল্লার। কিন্তু আতঙ্কিত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার অনুমতি না দিয়ে নিজেরাই পুড়িয়ে ফেলে। ওয়াহাবিদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'ওয়াহাবিদের বিচার' সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় সারা বাংলায়। ১৮৭২ সালের ৮ ফ্রেব্রুয়ারি ভাইসরয় মেয়ো যখন আন্দামানের বন্দীশালা পরিদর্শনে যান, তখন ওয়াহাবি বন্দী শের আলি তাঁকে হত্যা করে।

জাতীয় সচেতনতা

সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের যে প্রস্ফুটন ঘটছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই সবথেকে বেশি ছাপ ফেলেছিল জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতার ওপর। প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল জাতীয়তাবোধ আর তার ঝোঁকটা বেশি ছিল হিন্দু মানসিকতার দিকেই। মুসলিমদের জাতীয় সচেতনতার অস্পষ্ট প্রকাশটাও এই সময়েই প্রথম দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাতও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অবশেষে আমরা মুখোমুখি হতে চলেছি কংগ্রেস যুগের।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) এবং তাঁর সহযোগীরা

ভারতীয় বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু জাতীয় সচেতনতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু। রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজনারায়ণ। ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনীসভা' এবং 'জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্তকরণ সমিতি'-র একটি প্রস্তাবনা-পত্র প্রকাশ করেন।

একটি সুবিখ্যাত ভাষণে রাজনারায়ণ ঘোষণা করেন যে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বই হচ্ছে তাঁর আন্দোলনের মূল সুর। তাঁর অন্যতম সহযোগী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতীয় বিদ্রোহের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে বহু প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক রচনা লিখেছেন এবং হিন্দিকে ভারতীয়দের ঐক্যসাধানের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা করে গেছেন।

"জাতীয়" শব্দটা তখন কতটা মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল মানুষকে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণের সহযোগী নবগোপাল মিত্রর কার্যকলাপের মধ্যে।

একটা জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ছাপাখানা, জাতীয় সংবাদপত্র এবং জাতীয় জিম্‌ন্যাসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন নবগোপাল। এ জন্যে দেশের লোক তাঁকে 'জাতীয় মিত্র' বলে উল্লেখ করত। ১৮৬৫ সালে রাজনারায়ণ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বদেশপ্রেমী সভা' (Patriots' Association)। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল 'হিন্দু মেলা' নামক এক বার্ষিক মেলার প্রচলন। বেশ কয়েক বছর ধরে এই মেলা একটা কর্ম-বহুল উদ্যোগের ভূমিকা পালন করেছে।

হিন্দু মেলা

রাজনারায়ণ, নবগোপাল এবং ঠাকুর বংশের তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে সূচনা হয় হিন্দু মেলার। এই মেলার একেবারে দেশীয় রূপের জনপ্রিয়তাকে সংগঠকরা কাজে লাগান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁদের সমর্থন লাভের জন্য। প্রতি বছরের জমায়েতে প্রচুর মানুষকে সমবেত করতে এবং তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সক্ষমও হয়েছিলেন তাঁরা। হিন্দু মেলার মূল উদ্দেশ্যগুলি সংজ্ঞায়িত হয়েছে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়। এই উদ্দেশ্যগুলি ছিল জাতীয়তাবোধ উন্নত করে তোলা এবং স্বাবলম্বী হওয়ার মনোভাব বাড়িয়ে তোলা। অসংখ্য মানুষ সোৎসাহে যোগ দিত এই মেলায়।

প্রতি বছর মেলার সময় পুরস্কৃত করা হত লেখক, শিল্পী ও শরীরচর্চাকারীদের। ভারতীয় শিল্প ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন সৃষ্টি মানুষকে দেখানোর জন্য, ভারতীয় উৎপাদকদের উৎসাহিত করার জন্য, সাধারণ মানুষকে নিজেদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য আয়োজন করা হত বিশাল প্রদর্শনীর। এইসব জমায়েতের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাংলা ভাষায় মনোমোহন বসুর দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত বক্তৃতা। অধিবেশনে দেশাত্মবোধক গান গাওয়াও চালু হয়েছিল। প্রথম স্তোত্রটা রচনা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬৩ সালে যিনি প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

দেশাত্মবোধক কবিতা লেখারও একটা জোয়ার আসে এই সময়। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ তৎকালীন যাবতীয় লেখকদের লেখাকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল হিন্দু মেলা। প্রায় এক দশক ধরে এই মেলার বার্ষিক অধিবেশনগুলি আলোড়িত করেছিল সমগ্র কলকাতাকে।

মুসলিম সচেতনতা

হিন্দুদের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার পাশাপাশি মুসলিমদের মধ্যে কিন্তু একমাত্র ওয়াহাবি আন্দোলনের ঘটনাটুকু ছাড়া জাতীয়তাবোধের জাগরণ ছিল নিতান্তই দুর্বল। কলকাতার ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে মুসলিম ছিলেন মুষ্টিমেয়

কয়েকজন মাত্র 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা ছিল। এই সংস্থার প্রধান ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ। এঁরা ছিলেন অভিজাত মুসলমান। কিন্তু ইংরেজের অধীনে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হচ্ছিল এদেশে, তার মধ্যে তখনও পর্যন্ত কোন মুসলমান ছিল না।

ঐ সময় কোন ক্ষেত্রেই মুসলমানদের মধ্যে থেকে কাউকে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। লক্ষণীয় বিষয় হল, জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হিন্দুদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন রকম অস্বস্তি ছিল না। তবে ১৮৭৪ সালে সৈয়দ আহমেদ আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে অনুভব করা গিয়েছিল।

লাগাতার রাজনৈতিক প্রচার

হিন্দু মেলার কিছুটা জঙ্গী হিন্দুত্ব সত্তরের দশকে খানিকটা নরম হয়ে আসে, জাতীয় সচেতনতা আরও ব্যাপক চেহারা নেয় এবং জঙ্গী ব্রাহ্মরা আর তাঁদের সহযোগীরাও তার অন্তর্ভুক্ত হন। এর ফল হিসেবে দেখা দেয় আধুনিক ধাঁচের লাগাতার রাজনৈতিক প্রচার এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারণা ও কৌশলের অবাধ ব্যবহার। এর ফলে হিন্দু মেলার পদ্ধতিগুলি অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ঐ পদ্ধতির থেকে পরবর্তী এই প্রচেষ্টাগুলি অনেক বেশি রাজনৈতিক চরিত্র সম্পন্নও ছিল। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই উদ্ভব ঘটেছিল কংগ্রেসের।

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)

এই সংক্রমণকালীন পর্যায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার রাজনৈতিক সমালোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। ১৮৭০ সালে তিনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধাঁচের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান চালু করার একটা সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপন করেন। পরবর্তীকালে কলকাতা কর্পোরেশনে জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার সপক্ষেও প্রচার চালান তিনি। বিভিন্ন মফস্বল শহরে গড়ে ওঠা গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন শিশিরকুমার এবং ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যপদ প্রাপ্তিকে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত করে তোলার সপক্ষে প্রচার চালান। তবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মতানৈক্য ঘটে তরুণ সাংবাদিকদের এবং তাঁরা শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যান।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)

এই সময় জন্ম হচ্ছিল এক নতুন নেতার যিনি নেতৃত্বের ব্যাপারে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন এবং পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছিলেন বাংলার "মুকুটহীন সম্রাট"

হিসেবে। রাজনৈতিক প্রচারে তাঁর অনমনীয়তা দেখে ইংরেজরা তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে বলত "সারেণ্ডার নট"। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে কোন ভারতীয়কে দেখতে অনভ্যস্ত উপরওয়ালারা তুচ্ছ কারণে তাঁকে এই "স্বর্গীয় কাজ" থেকে বরখাস্ত করে।

১৮৭৫ সাল নাগাদ রাজনীতিতে যোগ দেন সুরেন্দ্রনাথ। নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। এই নবীন ব্রাহ্মদের অন্যতম সদস্য আনন্দমোহন বসু একটা ছাত্রসভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার উদ্যোগেই জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কাজ শুরু করেন সুরেন্দ্রনাথ। শিখশক্তির অভ্যুদয় এবং ম্যাজিনি প্রসঙ্গে তাঁর স্মরণীয় বক্তৃতা জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যুবকদের উপাস্যে পরিণত হন সুরেন্দ্রনাথ। তাদের সামনে তিনি শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাই তুলে ধরতেন না, সেইসঙ্গে তুলে ধরতেন পাশ্চাত্যের মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর কথাও। শুনতে শুনতে শ্রোতারা একাত্ম হয়ে যেত রাইসরজিমেণ্টোর ইতালির সঙ্গে অথবা হোমরুল আন্দোলনের আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রজন্ম ধরে শুধু বাংলার অবিসংবাদী নেতাই ছিলেন না, সেইসঙ্গেই তিনি প্রথম সারির সর্বভারতীয় নেতাতেও পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৭৯ সাল থেকে তিনি 'বেঙ্গলী' নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন।

ভারত-সভা (১৮৭৬)

শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা ১৮৭৬-এর জুলাই মাসে গঠন করেন 'ভারত-সভা'। এই দলে ছিলেন কেম্ব্রিজের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু, ব্যারিস্টার এবং সুপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন, আর ছিলেন মানব অধিকারের একনিষ্ঠ প্রচারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই ছিলেন নবীন ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পুরনো প্রজন্মের অবদানকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত-সভার সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয় ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বর্ষীয়ান রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ভারতজুড়ে জনমত গঠন করার দায়িত্ব সচেতনভাবেই হাতে তুলে নেয় ভারত-সভা। স্বল্পবিত্ত মানুষদের সুবিধের জন্য সদস্য-চাঁদা ইচ্ছাকৃতভাবেই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সভার শাখা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল বাংলার বাইরের সংগঠনগুলির সঙ্গে।

প্রচারের ঢেউ

তখন সিভিল সার্ভিসের বিধিনিয়মের দ্বারা নানাভাবে ভারতীয়দের উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা হত। এই বিধিনিয়ম সংস্কারের স্বপক্ষে প্রচার করার জন্য ১৮৭৭-৭৮ সালে বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভিক্ষ তহবিলের টাকা আফগান যুদ্ধখাতে বরাদ্দ করায় ১৮৭৮ সালে এক প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। সরকার এর জবাব দেয় অত্যাচারের পথে। ১৮৭৮ সালের 'সংবাদপত্র আইন'-এ (Press Act) দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয় এবং ১৮৭৮ সালের 'অস্ত্র আইন'-এ (Arms Act) ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র থাকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। প্রজাদের অধিকারের স্বপক্ষে প্রচার চালায় ভারত-সভা, উৎসাহ যোগায় রায়তদের সমিতি গঠনে। বিভিন্ন জেলায় বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন সভার বক্তারা। শোনা যায় কোন কোন জায়গায় এইসব জনসভায় দশ থেকে বিশ হাজার লোক হাজির থাকত। এছাড়া 'ইলবার্ট বিল' প্রসঙ্গটি তো ছিলই। ১৮৮২ সালে যখন ভারতীয় অফিসার-দের হাতে ইওরোপিয়দের বিচার করার ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আইনটি প্রস্তাবিত হয়, তখন ইওরোপিয়দের মধ্যে একটা প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়—ঠিক যেমনটা ঘটেছিল কালা আইনের ক্ষেত্রে। ইওরোপিয়দের এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়রাও সোৎসাহে প্রচারে নেমে পড়েন। ১৮৮৩ সালে আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হন সুরেন্দ্রনাথ। ক্ষোভে ফেটে পড়ে মানুষ। দেশব্যাপী প্রচার আন্দোলনের গতিবেগ বেড়ে উঠতে থাকে সুনিশ্চিতভাবে। একদিকে লাগাতার রাজনৈতিক চাপ আর অন্যদিকে ভাইসরয় রিপনের গ্ল্যাডস্টোনিয় উদারতাবাদ—এই দুয়ের ফলে বাস্তবায়িত হয় ১৮৮৫ সালের 'প্রজাস্বত্ব আইন' (Tenancy Acts) আর 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন'। 'সংবাদপত্র আইন' খারিজ করেন লর্ড লিটন। রিপনের এই পদক্ষেপ ভারতবাসীর মনে তাঁর প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা-বোধের জন্ম দেয়।

সুস্থিত 'রাজনীতি'

আশির দশকের প্রথম দিকের চাঞ্চল্যের মধ্যে থেকেই মাথা তোলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য একটি জাতীয় তহবিল গড়ে তোলার ধারণা। ১৮৮৩-র ১৭ই জুলাই একটি জনসভায় এ ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করেন সুরেন্দ্রনাথ এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৮৪ সালে আবার বিভিন্ন প্রদেশে সফর করেন।
এরপর একটি 'সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন'-এর আয়োজন করে ভারত-সভা। ১৮৮৩-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার, অস্ত্র আইন বাতিল করা, সিভিল সার্ভিসের নিয়মবিধির সংস্কার,

প্রযুক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয় সম্মেলনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন ডিরোজিওপন্থী রামতনু লাহিড়ী। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায়, ১৮৮৫-র ডিসেম্বর মাসে। এই একই সময়ে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন।

৫
১৮৮৫—১৯০৫

জাতীয় সম্মেলন এবং জাতীয় কংগ্রেস

হিন্দুমেলার বার্ষিক জমায়েতগুলি এক দশক ধরে মানুষের সচেনতা উন্নত করে তোলার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের পরিচালনায় ভারত-সভার দশ বছর ব্যাপী প্রচার জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলার একটা সর্বভারতীয় মঞ্চ উদ্ভবের প্রস্তাবনা হিসেবে কাজ করেছিল। ১৮৮৩ সালের প্রথম 'জাতীর সম্মেলন'টি ছিল এই প্রক্রিয়ারই স্বাভাবিক ফল। তবুও, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপগুলি নিয়েছিলেন অন্যান্য প্রদেশের জননেতারাই, বাংলার নেতারা নন। জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সংবাদে বিস্মিতই হয়েছিলেন বাংলার জাতীয়তাবাদীরা।

১৮৮৫, কংগ্রেসের জন্ম

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও, বিশেষত বোম্বাইয়ে, জেগে উঠছিল মানুষের রাজনৈতিক চেতনা। কিন্তু এইসব অঞ্চলের নেতারা ছিলেন সাধারণত একটু বেশি নরমপন্থী এবং কম সরব। অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম্ নামক জনৈক স্কটিশ সিভিলিয়ান চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৮৮২ সালে বসবাস করতে শুরু করেন সিমলায় এবং উৎসাহী হয়ে ওঠেন রাজনীতিতে। ভারতবর্ষকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন হিউম। ১৮৮৩ সালে লেখা এক বিখ্যাত চিঠিতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য আবেদন জানান।

ঐ বছরই তিনি গঠন করেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন।' দেশের প্রধান প্রধান শহরে গঠিত হয় এই সংগঠনের আঞ্চলিক কমিটি। নরমপন্থী ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন হিউম এবং ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে একটি সভায় সমবেত করেন তাঁদের। এই সভা থেকেই গড়ে ওঠে জাতীয় কংগ্রেস।

জাতীয় কংগ্রেস গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টায় ভাইসরয় ডাফ্রিনের সমর্থন ছিল। তিনি ভেবেছিলেন মানুষের বিক্ষোভের সম্মানজনক নির্গমনপথ হিসেবেই কাজ করবে কংগ্রেস, ভেবেছিলেন কংগ্রেসের ভূমিকাটা হবে অনেকটা ইংল্যাণ্ডের "মহা-মহিম রাজার বিরোধীপক্ষ"-র মতো, তবে তাদের কখনও ক্ষমতালাভের কোন সুযোগ থাকবে না। আরেকটি বিদ্রোহের আশংকায় মাঝে-মধ্যেই উদ্বিগ্ন হয়ে

উঠত সরকার। কংগ্রেসের মধ্যে সেই আশংকা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় দেখতে পেল তারা।

হিউম ও তাঁর সহযোগীরা যখন বোম্বাই অধিবেশনের ব্যবস্থা করছেন, তখন বাংলার জননেতারা উদ্যোগ নিচ্ছেন দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের। সুরেন্দ্রনাথ এবং "বিদ্রোহের উস্কানিদাতা"-দের কোন আমন্ত্রণও জানানো হয়নি বোম্বাই অধিবেশনে। তবে ঐ সভার সভাপতিত্ব করার সম্মান পেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত বাঙালী ব্যবহারজীবী ডব্লিউ. সি ব্যানার্জী।

সংযুক্তি, ১৮৮৬

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। বাংলার সুবিখ্যাত নেতাদের কংগ্রেসের বাইরে রাখা আর সম্ভব ছিল না। তাই ১৮৮৬ সালে পুরনো জাতীয় সম্মেলন আর নতুন অথচ বৃহৎ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কার্যত একটা সংযুক্তি ঘটে। 'রিপোর্ট'-এ বলা হয়েছেঃ "১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এটা ছিল সারা দেশের কংগ্রেস।" বিভিন্ন সংগঠনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং নানান গোষ্ঠী যোগ দিয়েছিল এই দ্বিতীয় অধিবেশনে —যা প্রথম অধিবেশনে ঘটেনি। এই অধিবেশনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় 'অভ্যর্থনা কমিটি।' এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বর্ষীয়ান পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

কংগ্রেসের কার্যপরিধি বেড়ে যাওয়াটা সরকারের পক্ষে খুব সুখকর ছিল না। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে সংগঠনের চতুর্থ অধিবেশনের সময়ই সরকারের অসন্তোষ ও বাধা দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে তৃতীয় অধিবেশনের সময় অগণিত সাধারণ মানুষের অল্প অল্প সাহায্যে ভরে উঠেছিল অভ্যর্থনা কমিটির তহবিল। কারিগর শ্রেণীর কয়েকজন প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেছিলেন এই অধিবেশনে।

কংগ্রেসে বাঙালীদের অংশগ্রহন

কংগ্রেসের প্রথম দিকের কাজকর্মে বাংলা স্বাভাবিকভাবেই একটা গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কারণ বাংলার পূর্ববর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশই গড়ে দিয়েছিল কংগ্রেসের সৃষ্টির পথ। কংগ্রেসের প্রথম একুশটি বার্ষিক অধিবেশনের (১৮৮৫-১৯০৫) মধ্যে সাতবারই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন বাঙালীরা—ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী (১৮৮৫, ১৮৯২), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫, ১৯০২), আনন্দমোহন বসু (১৮৯৮), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯) এবং লালমোহন ঘোষ (১৯০৩)।

একমাত্র প্রথম অধিবেশনটি বাদে বাকি প্রতিটি অধিবেশনেই সক্রিয় অংশগ্রহণ

করেছেন বাঙালী প্রতিনিধিরা। যেমন, বিনাবিচারে বন্দী করা এবং ফৌজদারি আইন সংশোধন করার বিরুদ্ধে (১৮৯৭), ভাইসরয় কার্জনের ইউনিভার্সিটি কমিশনের বিরুদ্ধে (১৯০২), দিল্লীর দরবারে সরকারি কর্মকর্তাদের অসংযত আচরণের বিরুদ্ধে (১৯০৩) প্রতিবাদ উত্থাপন করেন বাঙালী প্রতিনিধিরাই। কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতেও, যেমন ১৯০০ সালে গঠিত শিল্পগত ও শিক্ষাগত কমিটিগুলিতে, সক্রিয় ভূমিকা ছিল বাঙালীদের।

অগ্রসর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাঙালীদের চাপ

কংগ্রেসকে উদার করে তোলা বাংলার কংগ্রেসীরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা আরও উল্লেখযোগ্য, আরও প্রয়োজনানুগ। মাত্র দু'একজন নেতাই রচনা করবেন যাবতীয় সিদ্ধান্তের খসড়া—এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই প্রতিবাদ করেছিলেন কয়েকজন বাঙালী প্রতিনিধি। ১৮৮৭ সালের তৃতীয় অধিবেশনে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সিলেটের ব্রাহ্ম যুবক বিপিনচন্দ্র পাল সংগঠনকে বাধ্য করেছিলেন প্রকাশ্য অধিবেশনে যে-সব সিদ্ধান্ত পেশ করা হবে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা ও খসড়া রচনার জন্য একটি নির্বাচিত 'সাবজেক্টস কমিটি' গঠন করতে। ১৮৮৭ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন আসামের চা-বাগানের মজুরদের প্রশ্নটা উত্থাপন করেন, তখন ব্যাপারটাকে একটা প্রাদেশিক সমস্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কংগ্রেস। কিন্তু দ্বাদশ অধিবেশনে (১৮৯৬) বাংলার প্রতিনিধিদের চাপের মুখে বিষয়টিকে কার্যসূচীর মধ্যে গ্রহণ করতে কংগ্রেস বাধ্য হয়।

আরেকটি অগ্রসর দাবি ছিল সংগঠনের অধিবেশনে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া সংক্রান্ত। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালের অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম যে মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অন্যতমা ছিলেন দ্বারকানাথের স্ত্রী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে (১৮৯০) মহিলা হিসেবে তিনিই প্রথম বক্তৃতা দেন, যা ছিল "ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতের নারীদের উচ্চ মর্যাদা দেবে, তারই প্রতীক।"

কংগ্রেসে চরমপন্থার উদ্ভব

সারা দেশের অভিযোগগুলি মাঝে-মাঝে ইংরেজ সরকারের সামনে অনুষ্ঠানিক-ভাবে পেশ করার পন্থাতেই বিশ্বাস করতেন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা এবং মনে করতেন জনমতের সামনে আস্তে আস্তে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে সরকার। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার অন্যান্য পদস্থ নেতারাও এই দৃষ্টিভঙ্গীরই শরিক ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল নিছক বক্তৃতা দিয়েই শাসকদের বিভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলা যাবে। ইংল্যাণ্ডে নিজেদের

বক্তব্য প্রচার করার জন্য বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত কংগ্রেস।

এই সবকিছু নিয়েই গড়ে উঠেছিল সুপরিচিত "নরমপন্থী" প্রবণতা। এই প্রবণতাই নিয়ন্ত্রণ করত কংগ্রেসকে। এর একটা সুস্পষ্ট বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীরও অস্তিত্ব ছিল সংগঠনে, যা পরিণত হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ের "চরমপন্থা"-য়। মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের পাশাপাশি বাংলাতেও চরমপন্থার উদ্ভবের একটা চমৎকার ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল। স্রেফ ভাষণ দেওয়ার বদলে নিজেদের অভ্যন্তরীণ শক্তি সুসংহত করা, আবেদনপত্র দাখিল করার বদলে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা, ধরাবাঁধা পথে গয়ংগচ্ছ আন্দোলন করার বদলে সাধারণ মানুষের গভীরে যাওয়া —চরমপন্থার মনোভাবটা ছিল এ-রকমই। বাঙালীদের মধ্যে এই নতুন ধারার একেবারে প্রথম দিকের প্রবক্তাদের অন্যতম ছিলেন বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ স্থানীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশাল জেলার অধিবাসীদের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল অশ্বিনীকুমারের। পুরো একটা প্রজন্মের মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন তিনি। ১৮৮৭ সালেই তিনি কংগ্রেসের সামনে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিটিতে স্বাক্ষর করেছিল বরিশালের ৪৫ হাজার মানুষ।

গ্রামাঞ্চলে মাদকদ্রব্যের অবাধ উৎপাদনে প্রশ্রয় দেওয়ার সরকারি পলিসির বিরুদ্ধে বরিশালে প্রচার চালিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার। প্রতি বছর শুধু তিনদিনের "তামাসা"-য় কংগ্রেস নিজেকে আটকে রাখছিল বলে তিনি ১৮৯৭ সালে সমালোচনা করেন কংগ্রেসের। অশ্বিনীকুমারের থেকে আরও মুখর ও আরও কার্যকরী সমালোচক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্রই ছিলেন সদ্য জায়মান চরমপন্থার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯০২ সালে তিনি 'নতুন ভারত' (New India) নামে একটি মুখপত্র চালু করেন এবং আসামের চা-বাগানের মজুরদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের সংগ্রামী মনোভাবের প্রমাণ রাখেন।

আসামের কুলিদের জন্য সংগ্রাম

আসামের কুলিদের স্বপক্ষে প্রথম প্রচার শুরু করেছিলেন অদম্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জনৈক ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারকের কাছ থেকে আসামের চা-বাগানের কুলিদের দুর্দশার কথা শুনে ভারত-সভার পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৮৬ সালে তিনি আসামে যান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চা-বাগানগুলিতে ঘুরে বেড়ান দ্বারকানাথ। এই অনুসন্ধানের ফলাফল তিনি লিপিবদ্ধ করেন "স্লেভ ট্রেড ইন আসাম" শীর্ষক প্রবন্ধমালায়। প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় ইংরেজি পত্রিকা 'বেঙ্গলি'-তে আর কৃষ্ণকুমার মিত্র নামক জনৈক তরুণ ব্রাহ্মর দ্বারা পরিচালিত বাংলা পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'-তে। কংগ্রেস এই প্রশ্নটিকে প্রাদেশিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করার পর ১৮৮৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন'

(Bengal Provincial Conference) বিষয়টি হাতে নেয়। এর প্রধান বক্তা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত মজুরদের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা হত চা-বাগানে। তারপর তাদেরকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে বহু বছরের দাসে পরিণত করা হত—যদিও এ ধরনের "চুক্তি" ছিল একেবারেই বে-আইনী। চা-বাগানগুলির অবস্থা ছিল মর্মান্তিক। অবাধ্য কুলিদের চাবুক মেরে হত্যা করার ঘটনাও ঘটত প্রায়শই। চা-বাগানে সাধারণ আইন বা বিচার বলতে কিছু ছিল না, বাগানের মালিকরাই ছিল সর্বেসর্বা। এর বিরুদ্ধে যে প্রচার-আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল, তা ছিল অনেকটাই নীলচাষ বিরোধী প্রচার-আন্দোলনের মতো। অবশেষে ১৮৯৬ সালে আসামের কুলি সমস্যাটা নিয়ে কাজ করতে সম্মত হয় কংগ্রেস। ঐ সময়ই আসামের চিফ কমিশনার স্যর হেনরি জেম্‌স্‌ বিষয়টায় হস্তক্ষেপ করেন এবং কুলিদের ওপর চরমতম নির্যাতন বন্ধ হয়।

বাংলায় স্বদেশচেতনা

এদিকে বাংলার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেড়েই চলেছিল। বাংলার মানুষকে সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ সালে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। বাংলার নেতৃত্বেই ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের অনুষঙ্গ হিসেবে সংগঠিত হয় প্রথম 'শিল্প প্রদর্শনী' (Industrial Exhibition), সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় যার মধ্যে ঘোষিত হয়েছিল "শিল্পগত বিপ্লবের বার্তা, যে বিপ্লব কিছুদিনের মধ্যেই মূর্ত রূপ নিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনে।"

এক প্রজন্ম আগে হিন্দু মেলায় শুরু হয়েছিল যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, তা এই সময় পরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায়। এ ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট ভূমিকা নেন ঠাকুর বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারীরা। শিল্প প্রদর্শনীর আর্থিক ভার বহন করেছিলেন জে. চৌধুরী। এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশী পণ্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর উদ্বোধন করেছিলেন সরলা দেবী। এই স্বদেশী দোকানগুলির পক্ষ থেকে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত, যার নাম ছিল 'ভাণ্ডার।'

১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় দেশপ্রেমিক যুবকদের সংগঠন 'ডন সোসাইটি।' সংগঠনের মুখপত্রের নাম ছিল 'ডন।' 'শিল্পগত ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নয়নী সভা' (Association for the Advancement of Industrial and Scientific Education) গঠিত হয় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে। শিক্ষার জন্য যে-সব ছাত্রকে বিদেশে পাঠানো হবে, তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণবাবদ বৃত্তির ব্যবস্থা করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। অধিকার অথবা

অনুভূতির ওপর যে-কোন রকম আঘাত ঘটলেই উঠত প্রবল প্রতিবাদের ঝড়। ১৮৯৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে প্রতিনিধি সংখ্যা কমানোর পূর্বাভাস পেয়ে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সদস্যরা। নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই পদত্যাগ করেন সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। ভাইসরয় কার্জন ১৯০৫ সালে তাঁর সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বাঙালীদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা করলে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সভা। কার্জনের বক্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয় একটি সাধারণ জনসভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ।

বস্তুতপক্ষে বাংলা তখন সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল মহান স্বদেশী আন্দোলনের দিকে। সেই সঙ্গে এটাও তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বাঙালীদের জাতীয় চেতনা তুলনায় অনেক উন্নত এবং যে-কোন চ্যালেঞ্জেরই মোকাবিলা করতে তারা প্রস্তুত।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)

জাতীয় পুনর্জাগরণ কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতীয় শক্তি, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও গৌরব মূর্ত হয়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসের তরুণ বাঙালী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ছাপোষা জীবনের গৎবাঁধা পথ পরিত্যাগ করে এক উদ্দীপ্ত আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ধর্ম মহাসভা'-য় যোগ দেওয়ার পর তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, তারপর চার বছর ব্যাপি পাশ্চাত্য সফরে অমলিন থাকে তাঁর বিজয়নিশান। ১৮৯৭ সালে ফেরার পর জাতীয় বীরের মর্যাদায় ভূষিত হন বিবেকানন্দ। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো বিবেকানন্দও বিদেশীদের চোখে এদেশের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ দুজনের মতো তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ছিলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাই তাঁর কর্মকাণ্ড হিন্দু পুনরুত্থানের মনোভাবকে আরও পুষ্ট করে তুলেছিল। বিদেশে বিবেকানন্দ এক সুপ্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাবোধেরও পুনর্জাগরণ ঘটে। স্বদেশবাসীদের তিনি স্বনির্ভর হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে নিজেদের দুর্দশার জন্য তারা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী এবং তার প্রতিকারও নির্ভর করছে তাদেরই ওপর।

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত ছিলেন বিবেকানন্দ, যদিও রাজনীতি তাঁর ক্ষেত্র ছিল না। মানবতাবাদী সন্ন্যাসই ছিল তাঁর জীবনের পথ। এই ভাবনা থেকেই গড়ে তুলেছিলেন সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশন, যার প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতার

কাছে বেলুড়ে। অসংখ্য যুবক জাগতিক ভোগসুখের মায়া ত্যাগ করে যোগ দিতে শুরু করে রামকৃষ্ণ মিশনে। মিশন জোর দেয় সমাজকল্যাণমূলক কাজের ওপর এবং মধ্যযুগীয় ভিক্ষুদের মতো যুবকদের মধ্যে আত্মত্যাগের মনোভাবকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে।

মুসলিমদের সচেতনতা

এত কিছু সত্ত্বেও দুর্বলতা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই। এর অন্যতম ছিল যে-কোন ধরনের কাজকর্মে মুসলমান সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের অভাব। কিছু বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুসলমান জনমত ধীরে ধীরে তাদের একটা নিজস্ব, স্বতন্ত্র পথের দিকেই অগ্রসর হতে শুরু করেছিল।

ভারতীয় বিদ্রোহের পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় যে বইটি লিখেছিলেন সৈয়দ আহমেদ, তা তাঁর গভীর দেশপ্রেমেরই সাক্ষ্য বহন করে। জাতীয় অবমাননা ও জাতিগত বৈষম্যের ব্যাপারটিও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকেই ঝুঁকে পড়েন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি দুর্বলতর সম্প্রদায়দের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে হিন্দু আধিপত্যের দরুণ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বিকাশটা অসম হয়ে উঠবে। কংগ্রেস গড়ে ওঠার পর তার পাল্টা সংগঠন হিসেবে তিনি গড়ে তোলেন 'দেশপ্রেমিক সমিতি' (Patriotic Association)। ১৮৮৮ সালে সিভিল সার্ভিস কমিশনের সামনে তিনি আই. সি. এস.-এ লোক নিয়োগের জন্য সারা ভারতে একই সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়ার (যা কংগ্রেস দাবি করছিল) প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল এর ফলে বেশির ভাগ পদ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাই পেয়ে যাবে।

এর অনেক আগে, ১৮৩৩ সালে, মহম্মদ ইউসুফ বেঙ্গল কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদীরা মুসলমানদের এই দাবি-দাওয়াগুলিকে একবাক্যে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে নিন্দা করতেন। কংগ্রেসের মধ্যেও মুসলমানরা রয়েছেন—এই ব্যাপারটাই তাঁদের ঐ বিশ্বাসকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। মুসলমানদের দাবিগুলিকে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দাবি হিসেবে খারিজ করে দেওয়া হত। কিন্তু একটা ব্যাপার তাঁরা কিছুতেই বোঝার চেষ্টা করতেন না যে মুসলমান ধর্মনেতারা মোটের ওপর কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও মুসলমানদের স্লোগানগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শুধুমাত্র সেই অংশটির স্বার্থকেই প্রতিফলিত করত যে অংশটি ছিল পশ্চাদপদ এবং ঘটনাচক্রে যারা ছিল মুসলমান।

সামগ্রিক জনসাধারণ সম্বন্ধে হিন্দুদের মূল যুক্তি ছিল যে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী (separatist) মনোভাব নেই। ১৯১১ সালে এই যুক্তির জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন: "বিচ্ছিন্নতাবাদী

মনোভাবের অনুপস্থিতিটা নিতান্তই একটা নেতিবাচক ব্যাপার, এর মধ্যে কোন ইতিবাচক অন্তর্বস্তু নেই। অর্থাৎ, আমাদের মধ্যেকার প্রকৃত একতার জন্যই যে আমরা আমাদের পার্থক্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছি, তা আদৌ নয়। আসলে আমাদের পৌরুষের অভাবেই এই উদাসীন্য আমাদের গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্বতন প্রজন্মই বাংলাকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। নবজাগরণের জোয়ার তারপরও অব্যাহতই ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকার অভিনেতাদের নেতৃত্বে বিপুল উন্নতি ঘটেছিল বাংলা নাটকের। বঙ্কিমচন্দ্রর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐতিহাসিক রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস লেখার কাজে ব্রতী হন রমেশচন্দ্র দত্ত, যদিও তিনি অনেক বেশি খ্যাতি পেয়েছেন একজন অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ হিসেবেই। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বস্তুগত কুফলগুলি বিশ্লেষণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র।

মহিলাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখিকা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। তাঁর দার্শনিক ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' নামে যে সাংস্কৃতিক পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন, স্বর্ণকুমারী সেই পত্রিকা দশ বছর (১৮৮৪ থেকে) সম্পাদনা করেন যোগ্যতার সঙ্গে।

মুসলমান কবি ও ঔপন্যাসিক মীর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১২) শ্রেষ্ঠ রচনাটিও এই সময়েরই ফসল।

জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় খুলে যায় আর-একটি মহৎ কীর্তির দুয়ার। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার রুদ্ধ জগতের দুয়ারটি খুলে দিয়ে তাঁরা চমৎকৃত করেন সমগ্র ভারতবর্ষকে। কিন্তু এই সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল একটি বিশেষ ঘটনা: বাংলার সংস্কৃতি জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক একটি প্রতিভার আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বাল্যাবস্থাতেই হিন্দুমেলায় (১৮৭৫, ১৮৭৭) স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করে এবং বৈষ্ণব কাব্যের শৈলীতে গীতিকবিতা রচনা করে ও নানারকম বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা লিখে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আশির দশকের গোড়ার দিকে তিনি নাটক রচনা ও অভিনয় করেন, একটি প্রবন্ধে সমালোচনা করেন চীনে আফিম ব্যবসার এবং স্বীকৃতি পান প্রতিভাবান তরুণ কবি হিসেবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন জানানোর চালু রেওয়াজটিকে ১৮৮৪ সালে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী কয়েক বছরে রচিত তাঁর কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প,

উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি তাঁকে অধিষ্ঠিত করে এক অসাধারণ লেখকের আসনে, পুষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিভাণ্ডার। 'সাধনা' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ সালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি আবার চালু করেন।
১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন বাংলার ছেলে-ভোলানো ছড়াগুলি সংগ্রহ করার। তার আগের বছর তিনি নির্বাচিত হন সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি পদে। নব্য-হিন্দুত্বের চরম অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ম বিতর্কমূলক রচনায় এবং নারী-শ্রম ও বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়।
১৮৯২ সালে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা চালু করার স্বপক্ষে সরব হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। এদেশের আহত জাতীয় মনোভাবকে বাঙময় করে তুলে এবং জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরীন সংহতির আহ্বান জানিয়ে তিনি নিয়মিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন, ভাষণ দিতেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগের আক্রমণের সময় ত্রাণকার্যে নামেন মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতা, তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।
১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়টি। ১৯০৪ সালে তিনি গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং গ্রামকে প্রাথমিক একক হিসেবে নিয়ে, কুটির শিল্প কৃষকদের সহযোগিতা ও হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্যকে উৎসাহিত করে স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের কথা বলেন। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ বেড়ে চলা চরমপন্থার দিকেই ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৪ সালে তিনি সমর্থন জানান শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপন করার প্রচেষ্টাকে। এই উৎসব ভারতবর্ষের সবথেকে অগ্রসর দুটি জাতিকে কাছাকাছি নিয়ে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই উদ্দীপনার মধ্যেও জাগ্রত ছিল তাঁর শুভবুদ্ধি। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে ঐ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দেবী ভবানীর পুজো শুরু করা হলে তা অ-হিন্দুদের সুনিশ্চিতভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেবে।
১৯০৫ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র আমাদের মহত্তম কবি হিসেবেই স্বীকৃতি পান নি, উদারতা, সমবেদনা, শক্তি ও সুস্থতার সৌকর্যে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আমাদের সংস্কৃতির সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবেও।

৬

১৯০৫-১৯১৯

বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলন

বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা আতঙ্কিত করে তুলেছিল ইংরেজ সরকারকে। আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য তারা উদ্যোগ নেয় বাংলাকে দুটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করে দেওয়ার। বাংলার গণ-জাগরণের শরিক হয়ে উঠতে পারেনি যে মুসলমানরা, তারাই ছিল পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ। ইংরেজ সরকার ভেবেছিল এমন একটা রাজ্য যদি সৃষ্টি করা যায় যেখানে প্রাধান্য থাকবে মুসলমানদেরই, তাহলে সেই প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত স্বাগত জানাবে মুসলমানরা। আর সেই সঙ্গেই ভাবা হয়েছিল এইভাবে বাংলাকে দু'টুকরো করে দিলে হিন্দুরাও বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং রাজিত হবে তাদের এই আন্দোলন। ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই ঘোষিত হয় বঙ্গভঙ্গের কথা। জানানো হয়—এই প্রশাসনিক পদক্ষেপটি কার্যকরী হবে ১৬ অক্টোবর থেকে।

চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর

বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে বাংলার জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতাস্পৃহার সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং সে চ্যালেঞ্জ গৃহীতও হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। যেদিন বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষিত হয়, সেইদিনই কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' কাগজে (যে কাগজের আদর্শ হিসেবে মুদ্রিত থাকত ফরাসি বিপ্লবের সুবিখ্যাত স্লোগান—"স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব") আহ্বান জানান বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে শুধুমাত্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার।

কলকাতা ও তার বাইরের মানুষেরা দ্রুতই সাড়া দেয় কৃষ্ণকুমারের আহ্বানে। বিশাল বিশাল সমাবেশে বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করার শপথ নেওয়া হয়। 'বঙ্গদর্শন' কাগজে বাংলার অখণ্ডতার ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্য-বদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলার মানুষের সুদৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন রবীন্দ্রনাথ এবং নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর নির্ভর করার আহ্বান জানান মানুষের কাছে। ৭ আগস্ট তারিখে কলকাতা টাউন হলের মধ্যে ও চারপাশে এক বিশাল জনসমাবেশে মানুষের মনোভাবটা মূর্ত হয়ে ওঠে স্পষ্টভাবে। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল পূর্ণ উদ্যমে।

প্রতিবাদের ঝড়

নজিরবিহীন প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল সারা দেশে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনী-

-কান্ত সেন ও আরও অনেকের দেশাত্মবোধক গানে, বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও কয়েকজন গণপ্রচারকের জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, প্রতিটা কাগজের বিস্ফোরক লেখায় ভরে উঠল সারা দেশ।

ইংরেজি ঘেঁষা ভদ্রলোকেরা পরিত্যাগ করলেন তাঁদের দামী বিলিতি পোশাক, বাড়ির চারদেওয়ালের আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েরা যোগ দিল মিছিলে, ছাত্ররা মিছিল করল, পিকেটিং করল, অসংখ্য বাড়িতে পরিত্যক্ত হল বিলিতি বিলাসসামগ্রী। অনেক বিখ্যাত জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশার নামকরা লোকেরা যোগ দিলেন এই গণ-আন্দোলনে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে শ্রমিক বা কৃষকদের সংগঠিত করা ও জাগিয়ে তোলার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হল না।

তবে অনেক বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, ব্যবসায়ী গজনভি এবং জনপ্রিয় নেতা লিয়াকৎ হুসেন। কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তেজনার আঁচ। সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিকে দিকে গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন সংগঠন—মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ব্রতী সমিতি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বন্দেমাতরম্ দল, দক্ষিণ কলকাতার যুবকদের সনাতন সম্প্রদায় ইত্যাদি। বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে মোটা স্বদেশী কাপড় ফেরি করতে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবীরা।

১৬ অক্টোবর, ১৯০৫-এর অনুষ্ঠান

বঙ্গভঙ্গ যেদিন কার্যকর হয়, সেদিন এক বিচিত্র ও স্মরণীয় প্রতিবাদে ভাস্বর হয়ে ওঠে সারা বাংলা। রাখী পূর্ণিমায় প্রত্যেক বন্ধুর হাতে রাখীবন্ধনের প্রথাটিকে সেদিন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন নেতারা। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর ঐ তারিখে উদ্‌যাপন করা হয় এই রাখীবন্ধন উৎসব। রাখীবন্ধন ছিল বাঙালীদের ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যের প্রতীক, যে ঐক্য অচ্ছেদ্য। এই দিনটিকে শোকের দিন হিসেবে পালন করার জন্য প্রতিটি বাড়িতে অরন্ধন উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইতে গাইতে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে বেরোয় অসংখ্য মানুষ।

বিকালবেলা বর্ষীয়ান নেতা আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে যাওয়া হয় অবিভাজ্য বাংলার প্রতীকস্বরূপ একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য। এই ভবনটিকে 'মৈত্রী ভবন' (Federation Hall) নামে চিহ্নিত করা হবে বলে স্থির হয়। সম্ভবত ফরাসি বিপ্লবের সময়কার মৈত্রী উৎসবের কথা মনে রেখেই এ-রকম নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সভায় উপস্থিত জনতা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি শপথ গ্রহণ করে। সন্ধ্যাবেলা

উত্তর কলকাতায় বেরোয় এক বিশাল মিছিল। এই মিছিল থেকে মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয় সেলাই শেখানোর বিদ্যালয় চালানোর জন্য এবং তাঁত শিল্পকে সহায়তা দেওয়ার জন্য অর্থসাহায্য করার। সেই দিনই পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল।

গঠনমূলক কার্যকলাপ

"স্বদেশী জিনিস কিনুন"—এই আহ্বানের মধ্যে বাংলার আন্দোলনের মধ্যেকার প্রাধান্যকারী বুর্জোয়ারা দেশীয় শিল্প গড়ে তোলার একটা স্বাভাবিক ও কার্যকরী পথ খুঁজে পায়। বয়ন শিল্প, জাতীয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, সাবান কারখানা, চামড়া কারখানা প্রভৃতি গজিয়ে উঠতে থাকে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি খুব একটা সফল হয়ে উঠতে পারেনি। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল।' গড়ে ওঠে অসংখ্য স্বদেশী দোকান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান। দেশপ্রেমিক ছাত্রদের ওপর সরকারি নিপীড়নের ফলে জন্ম নেয় আর-একটি গঠনমূলক কার্যক্রম।

ছাত্রদেরকে আন্দোলন থেকে জোর করে সরিয়ে রাখার জন্য একের পর এক সার্কুলার জারি করে সরকার। ছাত্রদের পিকেটের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় পুলিসের। এমনকি বর্ষীয়ান শিবনাথ শাস্ত্রীও ছাত্রদের আহ্বান জানান চালু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার।

১৯০৫ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ-সভায় জাতীয় শিক্ষা চালু করার জন্য এক লাখ টাকা দান করেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক। কৃতজ্ঞ দেশবাসী অবিলম্বে তাঁকে ভূষিত করে 'রাজা' উপাধিতে। ময়মনসিং-এর জমিদাররাও মোটা টাকা দান করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ তারিখে অবশেষে গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (National Council of Education)। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আজও এই আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

প্রচার চলতে থাকে অদম্য উৎসাহে। সরকারি ডিক্রি ও অত্যাচারের—যার মধ্যে চাবুক মারাও ছিল—বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ছাত্ররা গড়ে তোলে 'ফতোয়া-বিরোধী সমিতি' (Anti-circular Society)। কলকাতার পাশাপাশি এগিয়ে এল বিভিন্ন জেলাও। এইসব জেলার মধ্যে প্রধান ছিল বরিশাল। অশ্বিনীকুমার দত্ত আর তাঁর সহযোগীদের নেতৃত্বাধীন বরিশাল "ঘোষিত" হয়েছিল উপদ্রুত জেলা হিসেবে। বরিশালের গ্রামাঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে ফিরত চারণকবি মুকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক গান।

১৯০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিলিতি কাপড়

পোড়ানো হয়। তারপর নানান জায়গায় ঘটতে থাকে বিলীত কাপড় পোড়ানোর বহ্নুৎসব।

এপ্রিল মাসে বরিশাল শহরে বসল 'প্রাদেশিক সম্মেলন।' এদিকে পূর্ববঙ্গ সরকার তখন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্মেলনের মিছিলে উদ্দীপ্ত যুবকরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুললো নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে। জবাবে লাঠি চালাল পুলিস। পরের দিন ভেঙে দেওয়া হল সম্মেলন, তবুও নিষেধাজ্ঞার কাছে মাথা নোয়াল না সংগ্রামীরা। অবশ্য সরকারী ফতোয়া অগ্রাহ্য করে সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে প্রস্তাব কৃষ্ণকুমার মিত্র দিয়েছিলেন, তা গৃহীত হয়নি।

চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ

চরমপন্থার নিভন্ত আগুন আবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল স্বদেশী অন্দোলনের ছোঁয়ায়। ১৯০৬ সালের জুন মাসে তিলক কলকাতায় আসেন। সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় শিবাজী উৎসব। যৌবনের উৎসব হিসেবে সরলা দেবী আয়োজন করেন 'বীরাষ্টমী' উৎসবের।

খুব দ্রুতই চরমপন্থী প্রবণতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রচারক এই মানুষটির কর্মজীবন বড় বিচিত্র। চুম্বকের মতো তিনি আকর্ষণ করতেন যুবকদের, তাদের মনে জ্বালিয়ে দিতেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অগ্নিশিখা। তাঁর মুখপত্র 'সন্ধ্যা' দেশের একটা বিশেষ শক্তিতে পরিণত হয়, মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে পাঠকদের। রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত এই ঋষিতুল্য মানুষটি আদালতের সামনে কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন, কারণ ঐ আদালতের এক্তিয়ার মেনে নিতে তিনি রাজি ছিলেন না। এই বিচার চলার সময়ই, ১৯০৭-এর ২৭ অক্টোবর, মারা যান ব্রহ্মবান্ধব।

ব্রহ্মবান্ধবের পতাকা হাতে তুলে নেন অন্যরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। রাজনীতিবিদ ও সুবক্তা হিসেবে ততদিন যথেষ্টই পরিচিত হয়ে উঠেছেন তিনি। "ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য"—এই আদর্শ-বাণী সামনে রেখে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা এবং এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই বাংলার রাজনীতি জগতে ঝড়ের পাখির মতো আবির্ভূত হন অরবিন্দ ঘোষ।

ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করার পর ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলেন অরবিন্দ। একটা দুর্ঘটনার ফলে ঐ কাজে যোগ দেওয়া হয় নি তাঁর। অতঃপর আমরা তাকে দেখতে পাই এক শক্তিমান লেখকের ভূমিকায়, যিনি বলেছেন—জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক পবিত্র ধর্ম।

অন্যান্য চরমপন্থী পত্রিকার মধ্যে ছিল 'নবশক্তি','যুগান্তর।' যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপণ্ডিত এবং প্রগতিশীল চিন্তাবিদ হিসেবে

যিনি আজও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যুবকদের মধ্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন চরমপন্থী অ্যাকশন-গ্রুপ, যেমন অনুশীলন সমিতি।
কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের অধিবেশনে স্বরাজের লক্ষ্য গৃহীত হলেও ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালের অধিবেশন কার্যত পরিণত হয়েছিল চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের যুদ্ধক্ষেত্রে। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে দলের মধ্যে ভাঙন ঘটে। ভাঙনের পর ক্ষমতা দখল করে নরমপন্থীরা। ১৯১৬ সালে দুই গোষ্ঠীর পুনর্মিলন এবং ১৯১৮ সালে নরমপন্থীদের সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল নরমপন্থীদেরই হাতে।

অত্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ

১৯০৭-০৮ সালে সরকারি অত্যাচার চলছিল পূর্ণ মাত্রায়। এই অত্যাচারের মূল লক্ষ্য ছিল চরমপন্থীরাই। চরমপন্থী পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের ১৯০৭ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কারাদণ্ড হয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর, বিচার চলাকালীন মারা যান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বেকসুর খালাস পান অরবিন্দ ঘোষ। আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হন বিপিনচন্দ্র পাল। "রাজদ্রোহমূলক" সমাবেশের কণ্ঠরোধ করার জন্য একটি ফতোয়া জারি করা হয়। আর-একটি ফতোয়ায় কণ্ঠরোধ করা হয় সংবাদপত্রের, বন্ধ করে দেওয়া হয় চরমপন্থী পত্রিকাগুলো। স্বদেশী ঘাঁটিগুলোয় মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতে থাকে পিটুনি-পুলিসবাহিনী। বিভিন্ন জেলার কয়েকজন নেতাকেও কারারুদ্ধ করা হয়।
এই অত্যাচারে ক্রুদ্ধ চরমপন্থী যুবকরা হিংসার পথে পা বাড়াতে শুরু করে। লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার-এর ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ঘটে মুজঃফরপুরের ঘটনা। রাজদ্রোহ মামলার বিচারক কিংস্‌ফোর্ডকে খতম করতে গিয়ে দুজন সন্ত্রাসবাদী ভুলবশত হত্যা করে বসেন দুজন ইংরেজ মহিলাকে। একজন সন্ত্রাসবাদী আত্মহত্যা করে, অপরজন ধরা পড়েন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দেন।
২ মে পুলিসবাহিনী কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে হদিশ পায় একটি বোমা বানানোর কারখানার। ধরা পড়ে একদল সন্ত্রাসবাদী, গ্রেপ্তার হন অরবিন্দ ঘোষও। শুরু হয় আলিপুর বোমার মামলা। মামলা চলাকালীন সন্ত্রাসবাদী-দের হাতে নিহত হয় একজন রাজসাক্ষী, একজন সরকারি উকিল আর একজন পুলিস ইনস্পেক্টর। এছাড়া স্যর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার জন্যও দ্বিতীয়-বার চেষ্টা করে তারা। চিত্তরঞ্জন দাসের দক্ষতায় (এই মামলায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন চিত্তরঞ্জন) এই মামলাতেও বেকসুর খালাস পান অরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু মানিকতলায় ধৃত অন্য অভিযুক্তদের সাজা হয়ে যায়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে

পাঠানো হয় তাঁদের।

সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তরে অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দেয় সরকার। চালু হয় বেশ কিছু দমনমূলক আইন। এইসব আইনের সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হয় সংবাদ-পত্রের যাবতীয় স্বাধীনতা, ব্যবস্থা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে ষড়যন্ত্র মামলা চালানোর, নিষিদ্ধ করা হয় যুব সংগঠনগুলোকে। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ বাংলার ন'জন নেতাকে পাঠানো হয় নির্বাসনে।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে কিছু মুসলমান যোগ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা ছিল নিতান্তই কয়েকজন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি মাত্র। তাদের পিছনে মুসলমানদের গণসমর্থন আদৌ ছিল না। আন্দোলন চলার সময় বেশিরভাগ মুসলমান নিরপেক্ষই থেকেছে আর রাজনৈতিক চেতনার অভাবের দরুণ সেটাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

শুধুমাত্র মুসলমান সমাজেরই নেতা ছিলেন যাঁরা, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাঁদের উৎসাহিতই করেছিল। কারণ বাংলা ভাগ হয়ে গেলে নবগঠিত প্রদেশটিতে নিজেদের জন্য বেশি সুযোগসুবিধে পাওয়ার আশা করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু দেশব্যাপী আন্দোলন আর সরকারি অত্যাচারের ভয়াবহতা তাঁদের চমকে দেয়। এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায় ১৯০৫ সালে মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মুসলমান' পত্রিকাটির পৃষ্ঠায়। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে (Education Conference) ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে বেশ কিছু বিশিষ্ট মুসলমান সমর্থন জানান বঙ্গভঙ্গকে। তাঁর আগে ১৯০৬-এর ১ অক্টোবর তারিখে আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানরা একটা ডেপুটেশন নিয়ে যায় ভাইসরয় মিণ্টোর কাছে এবং আসন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের সময় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী পদ্ধতি সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁকে রাজি করায়।

পৃথক নির্বাচনকেন্দ্র

এই নতুন দাবির পক্ষে মোদ্দা যুক্তিটা ছিল এই যে, ভারতীয়দের ভোটাধিকার যেহেতু অনিবার্যভাবেই নির্ভর করবে শিক্ষাগত মান অথবা সম্পত্তির পরিমানের ওপর, সেহেতু সাধারণ নির্বাচনী পদ্ধতিতে অন্য ভোটদাতাদের সংখ্যাধিক্যের সামনে একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়বে মুসলমান ভোটদাতারা।

শিক্ষা সম্মেলনই ১৯০৮ সালে পরিণত হয় মুসলিম লীগে। ১৯০৭ সালে বিভিন্ন জায়গায় দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মুসলমান জনগণ যে

বাংলা ভাগের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল, এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। আসলে বাংলা ভাগের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠার মতো সচেতনতাও ছিল না তাদের। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান চাষীদের জাগিয়ে তুলতে স্বদেশী আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছিল, তা অকপটে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর লোকেরাই; এই ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা কখনোই নিজেদের দেশের মুসলমানদের সঙ্গে কিংবা সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গেও এক হয়ে মেশার চেষ্টা করেনি।

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করার পরও মুসলমানদের দিক থেকে তেমন কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। এই ঘটনাও বাংলা ভাগের ব্যাপারে মুসলমানদের ঔদাসীন্যেরই পরিচায়ক। তবে মুসলমানদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য ১৯০৯ সালের 'মর্লি-মিণ্টো সংস্কার'-এ তাদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবিটা মেনে নেওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের আগে-পরে

১৯১০ সালের শেষদিক থেকে কার্যকরী হয় নতুন সংবিধান। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী-দের হাতে জনৈক পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্টের নিহত হওয়ার অজুহাতে দমন-মূলক আইনগুলো নতুন করে চালু করে সরকার। যেমন, নতুন এক সংবাদপত্র আইনের সাহায্যে পরবর্তী দশকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কয়েকশ' ছাপাখানা, সংবাদপত্র ও বই।

১৯০৮ সালে নির্বাসিত নেতারা এই সময় মুক্তি পেলেও অনুশীলন সমিতির প্রধান পুলিনবিহারী দাসকে এক নতুন অভিযোগে আন্দামানে পাঠানো হয় সাত বছরের জন্য। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতেই থাকে। ১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদ এবং নির্যাতনের মধ্যে যে ভয়ংকর লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই লড়াইয়ের পরিবেশে এমনকি ১৯১১-র বঙ্গভঙ্গ রদও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাও আহত করেছিল বাঙালীদের ভাবপ্রবণ মানসিকতায়। দুই বাংলার পুনর্মিলনের সময় বাংলাকে রাজ্যপাল শাসিত প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রহরে

ভারতবর্ষের চালচিত্রে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা চলছিলই। ১৯১২ সালে বোমার আঘাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত-

দের মধ্যে রাসবিহারী বসুও ছিলেন। পরে তিনি সক্ষম হন ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে। হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা থেকেই বোঝা যায় বাংলার সন্ত্রাসবাদ কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। ১৯১৪ সালে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কোমাগাতামারু জাহাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং তারপরই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

কংগ্রেসের মধ্যে প্রাধান্যকারী নরমপন্থীরা এই যুদ্ধে বিশ্বস্তভাবে সহযোগিতা করে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। তিলকের নেতৃত্বাধীন চরমপন্থীরা এই সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। দ্রুতই বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের পুনর্মিলন। সেই আকাঙ্ক্ষিত পুনর্মিলন সম্পন্ন হয় ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র পর্যায়টা জুড়েই সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু অটল থাকেন নিজেদের পন্থায়। বিদেশ থেকে চোরাপথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন তাঁরা। বালেশ্বরে এক লড়াইতে প্রাণ দেন তাঁদের অন্যতম নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বাঘা যতীন।' ওদিকে মুসলিম লীগ ততদিনে কংগ্রেসের অনেকটাই কাছাকাছি হয়ে উঠেছে। ১৯১২ সালে কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসনের দাবিটা লীগও গ্রহণ করে এবং ১৯১৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ চুক্তি।

অন্যদিকে ১৯১১ সালের পর থেকে মুসলমানদের একটা প্রচণ্ড আপসবিরোধী মনোভাব দেখা দেয় যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা উন্নত হয়ে ওঠারই দ্যোতক হিসেবে। মহম্মদ আলি কর্তৃক ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'কমরেড' পত্রিকাটি জঙ্গী মনোভাব ও গণ-বিক্ষোভের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। নিকট প্রাচ্যে ব্রিটেনের সন্দেহজনক নীতিতে বিরক্ত ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্ক-ইতালি যুদ্ধে তুরস্কের দুর্দশার প্রতি এবং বলকান যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

১৯১৪ সালে তুরস্কের সাহায্যার্থে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে তুরস্কে যান ডাঃ আনসারি। তুরস্কের দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তোলে 'রেড ক্রেসন্ট।' ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেন আর তুরস্ক পরস্পরের প্রতিপক্ষ শিবিরে যোগ দেয়। ভারতবর্ষের মুসলমানরা (অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে যদি তারা আদৌ ভেবে থাকে তবেই) পড়ে যায় একটা উভয়সংকটে এবং ইংরেজদের প্রতি তাদের অসন্তোষ আরও বেড়ে ওঠে।

এই সবকিছুর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী একটা মনোভাব আর এ থেকেই বিশ্বযুদ্ধের পরে দানা বেঁধে ওঠে খিলাফৎ আন্দোলন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশ্বযুদ্ধের সময় মহম্মদ আলি ও তাঁর সহকর্মীরা আটক-বন্দী ছিলেন।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভারত সচিব মণ্টাগু ও বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড একটা অনুসন্ধান চালান এবং সাংবিধানিক সংস্কারের সুপারিশ করেন (জুলাই ১৯১৮)। ঐ সংস্কারে যে নগণ্য ছাড়টুকুর কথা ঘোষিত হয়েছিল, তার তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেসের চরমপন্থীরা। ১৯১৭-র ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থীদের সঙ্গে ভাঙনটা অল্পের জন্য এড়ানো গেলেও বাংলার জাতীয়তাবাদীরা সমবেত হন চরমপন্থার পতাকাতলেই। নেতৃত্বের ভূমিকায় সামনে এসে দাঁড়ান চিত্তরঞ্জন দাশ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রবীন রাজনীতিবিদরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান মানুষের কাছ থেকে। ১৯১৮-র আগস্ট মাসে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেসে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ভাঙনটা শেষ পর্যন্ত ঘটেই যায়। একেবারেই সংখ্যালঘু নরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করেন 'উদারপন্থী সংঘ' (Liberal League)। সরকারের সংস্কার-সংক্রান্ত কর্মসূচীকে সমর্থন জানায় এই সংঘ।

এই সময় কংগ্রেস পুরোপুরিভাবেই চলে আসে চরমপন্থীদের হাতে। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল ভারতীয় শ্রমিকদের। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক ট্রেড ইউনিয়ন। যুদ্ধের সময়কার দমন-মূলক আইনগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজ সরকার হাজির করে রাওলাট অ্যাক্ট। এর ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, দেখা দেয় ১৯১৯-এর নতুন সংকট। ঐ বছরই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গ্রহণ করেন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্বদেশী আন্দোলনের অশান্ত বছরগুলোর ঠিক পরেই বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোর অনিশ্চয়তা—এই দুয়ে মিলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন এগিয়ে চলেছিল নানান পরিবর্তনের পথ বেয়ে। সে প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। তবে এই সময়ের সংস্কৃতিতে রাজনীতির ছাপ যতটা স্পষ্ট, তা আগের পর্যায়গুলোতে কখনোই দেখা যায় নি। পরিস্থিতিটাও ছিল বেশ টানটান, উত্তেজনাপ্রবণ।

স্বদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ততদিনে পরিণত হয়েছেন অবিসংবাদী নেতায়। ১৯০৫ সালে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে, পরিণত হয়েছিলেন ঐ আন্দোলনের প্রথম দিকের প্রধান কবি ও প্রচারকে।

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত তাঁর গান, বক্তৃতা আর প্রবন্ধগুলো পুরো আন্দোলনটাকে দীপ্ত করে তুলেছিল এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে।

কিন্তু তিক্ততা ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন কুৎসিত প্রবণতাগুলোর সংস্রব ত্যাগ করে সরে আসতে বাধ্য হয়। তিনি অনুভব করেন এদেশের মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো একান্ত দরকার এবং প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটা আমূল সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করা নিতান্তই অপরিহার্য। স্বদেশী আন্দোলনের গৃহীত কৌশলের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন তাঁর বিদ্যালয়ের নির্জনতার চৌহদ্দিতে, ডুবে যান সাহিত্যসৃষ্টির কাজে। এই সময় তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ সৃজনশীলতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি গড়ে তোলার চিন্তা নিয়ে তাঁর সুবিখ্যাত বিদেশযাত্রায় বেরোন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু তার দু'বছর আগে তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্তির সময়ই তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে ভূষিত করেছিল সাহিত্যের রাজপুত্রের মর্যাদায়। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাময়িক-পত্র। এই পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় একের পর এক প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পরিণত রচনা।

১৯১৬ সালে জাপানে ও আমেরিকায় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তিনি যে ভাষণ দেন, তার মধ্যে উদ্ধত আগ্রাসনকারীদের প্রতি তাঁর তীব্র বিরোধিতার মনোভাবটা ফুটে ওঠে স্পষ্ট হয়ে। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন অনেকে, কিন্তু রাজনীতিগতভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও অগ্রসর চিন্তা-ভাবনাকে তিনি বরাবরই সমর্থন করে গেছেন।

১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থার পক্ষ নেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর অন্য কোন নেতা কিছু বলার আগেই ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বড়লাটের কাছে তাঁর সুবিখ্যাত চিঠিটা লেখেন তিনি। সারা দেশকে পথ দেখিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠি।

নানামুখী কাজকর্ম

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে মদত যুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই আন্দোলনটা হচ্ছে শিল্প-কলার প্রাচ্য শৈলী সৃষ্টির আন্দোলন। আন্দোলনের মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্র-নাথের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর ছাত্ররা সচেতন-ভাবে একটা নতুন শিল্পরীতি গড়ে তোলেন। এই নতুন রীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত প্রাচীন শৈলীর ছায়া এবং তার অভিব্যক্তির মধ্যে ফুটে উঠত জাতীয়

বৈশিষ্ট্য। এই সময় রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয় একের পর এক দেশাত্মবোধক নাটক। এর মধ্যে প্রধান ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলো। দ্বিজেন্দ্রলালের গানও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তবে বেশির ভাগ কবির ওপরেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল। ক্ষতিকর এই অর্থে যে রবীন্দ্রপ্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, দেখা দিচ্ছিল মূল্যহীন অনুকরণের এক দুঃখজনক পরিস্থিতি। গদ্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত রীতি ভেঙে কথ্য শব্দ, বিশেষত কথ্য বাংলার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলো প্রয়োগ করে, লেখার রীতি চালু করেছিলেন। ঐতিহ্যের শেকল ভাঙার জন্য যুবসমাজের বিদ্রোহেরও মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল তাঁর পত্রিকা 'সবুজপত্র'।

তার আগেই চালু হয়েছিল বাংলা পত্রিকা 'প্রবাসী'। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের গুণে প্রবাসী পরিণত হয়েছিল উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের প্রকাশভূমিতে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'মাসিক টীকা' তাঁকে চিহ্নিত করে চরমপন্থী প্রবণতাসম্পন্ন একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তর মতো বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের রচনা এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক গবেষণামূলক রচনায় চিন্তাশীলতা আর উৎকর্ষের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মতো লেখকরা শিশুদের জন্য সাহিত্যরচনার এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হাত দেন শিশুসাহিত্য রচনায়।

দর্শনের ক্ষেত্রে সুবিশাল জ্ঞান আর অন্যকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু অর্জন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি, প্রফুল্লচন্দ্র রায় গড়ে তুলতে শুরু করেন একটা গবেষক-গোষ্ঠী। এই গবেষকরা প্রফুল্লচন্দ্রকে নিজেদের গুরু বলেই মনে করত। উচ্চশিক্ষার জগতে আবির্ভাব ঘটেছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। নিজের একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতা আর ব্যক্তিত্বের দাপটে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিছক পরীক্ষা গ্রহণকারী ভূমিকাটাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন কিছুটা শিক্ষাদানকারীর ভূমিকায়, চালু করেছিলেন স্নাতকোত্তর শিক্ষার নানান বিভাগ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ (University College of Science) এবং বাঙালী বিদ্বজ্জনদের নিযুক্ত করেছিলেন বিজ্ঞান ও প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার কাজে।

আমাদের চোখের সামনে আজ যে বাংলাকে আমরা দেখি, সেই বাংলার মূল রূপরেখাটা গড়ে উঠছিল এই সময়টাতেই।

বাংলার রেনেসাঁসের
আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

বাংলার ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকার জয়ন্তী সংখ্যায় আমাদের বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যামূলক সাধারণীকরণের কিছুটা স্বাধীনতা লেখক চাইতেই পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত একটি বাংলা প্রবন্ধে (ইংরিজি লেখাটা প্রকাশিত হয়েছিল 'এনকোয়্যারি'-র সংখ্যা ৫, ১৯৬১-তে) যে-সব যাচাইযোগ্য সিদ্ধান্ত ও চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করেছি এবং বাংলা পত্রিকা 'পরিচয়'-এ লিখিত দুটি পরবর্তী প্রবন্ধে যে যেগুলোকে আরও বিশদ করে তোলার চেষ্টা করেছি, সেগুলো এই সুযোগে আমি পেশ করতে চাই বিদ্বজ্জনদের সামনে।

এ ধরনের ছোট লেখায় স্থানাভাবের কারণে যথাযথ তথ্য উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় না। তবে পাঠককে আশ্বস্ত করার জন্য এটুকু বলতে পারি যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 'নবজাগরণ'-এর প্রধান নায়কদের মূল রচনাগুলোর ওপর দীর্ঘ পড়াশোনার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এ প্রবন্ধ।

১

বহুমুখী অগ্রগতির যে প্রচণ্ড গতিবেগ আর উদ্যমের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস, সেই গতিবেগ আর উদ্যম বাংলার রেনেসাঁসের ছিল না। একটা বিদেশী আধা-ঔপনিবেশিক শাসনের বাধাবাঁধনের আওতার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল আমাদের আন্দোলন। এক জীবনদায়ী প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগটুকু পর্যন্ত জোটেনি আমাদের রেনেসাঁসের। বরং তার প্রাথমিক প্রকাশগুলোকে বহুলাংশেই নির্ভর করতে হয়েছে এক বিজয়ী বৈদেশিক শক্তির ওপর।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার রেনেসাঁসের একটা নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য আছেই। ঐতিহাসিকরা এখন খোদ ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা খুঁজে পেয়েছেন, তার সেই পুরনো মহিমা আজ অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে। আমাদের 'প্রাক্-রেনেসাঁস' সমাজটা ছিল নিতান্তই এক হতোদ্যম সমাজ। সেই নিষ্ক্রিয়তার বেড়াজাল ভেঙে উঠে দাঁড়ানোটা নিঃসন্দেহে বিরাট কৃতিত্বের ব্যাপার।

উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির জীবনে যা যা ঘটেছে, তার যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই হয় অবিমিশ্র প্রশংসা অথবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানই দেখেছি আমরা। কিন্তু বাংলার 'নতুন জীবন'-এর সুস্পষ্ট দুর্বলতাগুলো স্বীকার করেও এই নতুন জীবনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা যায়ঃ বাংলার এই নতুন জীবন আবদ্ধ থেকেছে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ স্তরে, অর্থাৎ 'ভদ্রলোক'-দের মধ্যেই; মুসলমানরা আর পিছিয়ে থাকা ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুরা এই জীবনের শরিক হতে পারেনি; ঐ একই সময়ে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক উজ্জ্বল ভূমিকা দেখা গেছে, অথচ আমাদের এখানে তা মোটেই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

ঐ আন্দোলনের সাধারণ মূল্যায়ন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমি ঐ আন্দোলনের মধ্যেকার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা মোটামুটি বিশ্লেষণ হাজির করার চেষ্টা করছি, যে বিভিন্ন প্রবণতা, বিভিন্ন ধরনের আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের উনিশ শতকের পূর্বপুরুষদের আন্দোলিত করেছিল, সেগুলোর মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

সেই সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে একটা প্রচণ্ড জাগরণ ঘটেছিল, বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তাদের উদ্যম—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন প্রতিভাধর ব্যক্তিদের অবদানকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিচার করাই কোন মননগত জোয়ারের অভিব্যক্তিকে একটা বিশেষ যুগের মধ্যে খোঁজাই স্বাভাবিক রীতি। তার পার্থক্যগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় একটা সুবিস্তীর্ণ একীভূত স্রোতের মধ্যে, মালার প্রতিটি ফুলই হয়ে ওঠে আমাদের গর্বের বস্তু। ঐ আন্দোনের মধ্যেকার এই ঐক্যের শ্রেষ্ঠ দুটো দিক হচ্ছে নন্দন-তাত্ত্বিক কীর্তি আর দেশপ্রেমমূলক রাজনৈতিক চেতনা।

তবে আরও তলিয়ে দেখলে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেকার, বাস্তব জীবনের মধ্যেকার বিভিন্ন স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। বিভিন্ন বিতর্ক দেখা দিয়েছে নানা সময়, মানুষ উত্তেজিত হয়েছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে, অনেক সময় আক্রমণ করেছে একে অপরকে। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে থেকে কোন একটাকে বেছে নিতে হয়েছে সেই সময়ের মানুষদের আমাদের দেশের পরবর্তী অগ্রগতির আলোয় এই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর মূল্যায়ন করার দায়িত্বটাও ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে যেতে পারেন না। প্রথম দৃষ্টিতে যাকে একটা একীভূত ধারা বলে মনে হয়, তলিয়ে দেখলে তার মধ্যে বিভিন্ন বিরোধী স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত চোখে পড়ে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দুটি প্রধান প্রবণতাকে তাদের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলোর দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব আর অবিরাম পুনরাবির্ভাবের কারণে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতাকে আমি দুটো সুবিধেজনক (হয়ত ঠিক লাগসই নয়) অভিধায় চিহ্নিত করেছি—Westernism বা প্রতীচ্যবাদ (আধুনিকতা, উদারতাবাদ) আর Orientalism বা প্রাচ্যবাদ (গতানুগতিকতা, রক্ষণশীলতা)। এই অভিধা দুটো আমি নিয়েছি রাশিয়ার ঘটনা থেকে, উনিশ শতকে প্রতীচ্যবাদী আর স্লাভোফিলদের মধ্যেকার সেই ঐতিহাসিক লড়াই থেকে, যার চিত্রায়ন খুঁজে পাওয়া যায় মাসারিক্-এর 'স্পিরিট অফ রাশিয়া' গ্রন্থে।

উল্লিখিত অভিধা দুটিকে অনেকেই ভুল করতে পারেন। প্রতীচ্যবাদ বলতে আমি কিন্তু ইউরোপকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার কথা বোঝাতে চাইছি না, আবার প্রাচ্যবাদ বলতে যাওয়ার কোন অসম্ভব প্রয়াসের ইঙ্গিত দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রতীচ্যবাদী আর স্লোভোফিল উভয়ের মাথাতেই ছিল ভবিষ্যতের চিন্তা, তবে সেই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তারা বিশ্বাস করত পৃথক আদর্শে। দু দলই চিন্তাভাবনা করত নিজেদের দেশের মানুষদের অবস্থার প্রেক্ষাপটেই, শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল আলাদা আলাদা।

দুটি ঐতিহাসিক আদর্শের মধ্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্জন করা দরকার। আমাদের দেশের প্রতীচ্যবাদকে 'প্রতীচ্যবাদ' নামে চিহ্নিত করাটা যথেষ্টই সঙ্গত, কারণ ঐতিহাসিকভাবে এর প্রেরণা এদেশে সঞ্চারিত হয়েছিল মূলত ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে অর্জিত কিছু ইউরোপিয় মূল্যবোধের উপলব্ধি থেকেই। অন্যদিকে প্রাচ্যবাদ হচ্ছে এই বহিরাগত মূল্যবোধগুলোর (যেগুলোকে এদেশের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য বলে মনে করা হত) একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। প্রতীচ্যবাদকে তাই বলে যথেচ্ছাচারী জীবনযাপন, অনৈতিক অভ্যাস আর অসংযমের সমার্থক বলে মনে করা যায় না। প্রতীচ্যবাদের অনেক প্রবক্তাই কিন্তু এ-সব কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত ছিলেন। বিদেশী সংস্কৃতির দৌলতে পাওয়া কু-অভ্যাসগুলোর জালে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন মধুসূদন আর ভারতীয় জীবনধারাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর—যদিও মননগত দিক থেকে উভয়েই ছিলেন আধুনিকপন্থী। ইংল্যান্ডের "ঈশ্বর-প্রদত্ত" ভূমিকা সম্পর্কে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস ব্যাপকভাবে, চালু ছিল তার সঙ্গেও কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না প্রতীচ্যবাদের। আবার আমাদের সমাজে প্রথাবিরোধী লোকদের ওপর সামাজিক নির্যাতন চালানোর যে রীতি পুরোদস্তুর চালু ছিল, সেটা আর প্রাচ্যবাদও কিন্তু সমার্থক নয়। স্থূল আকস্মিক 'পুনরুজ্জীবন'-এর ধারণা কিংবা বিচিত্র সব প্রগতিবিরোধী দাবির (যেমন—আধুনিক বিজ্ঞানের রহস্যগুলো হিন্দুরা নাকি বহু আগেই বুঝে ফেলেছিল) সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না প্রাচ্যবাদের। ভারতবর্ষের সরল সাদাসিধে জীবনের সঙ্গেও সমার্থক ছিল না প্রাচ্যবাদ, আবার লোক-দেখানো 'অ্যাংলিসাইজ্‌ড্‌'-রা মননগত নানান ব্যাপারেই ছিল প্রাচীনপন্থী। কাজেই কোন নির্দিষ্ট অভিধা ব্যবহার করার সময় আমাদের বিবেচনা করতে হবে তার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থটিকেই, যৌক্তিক রীতির নগণ্য বিচ্যুতিগুলোকে নয়।

মনে রাখা দরকার যে আমরা এখানে দুটো সুস্পষ্ট পরস্পরবিরোধী মতবাদের কথা বলছি না বা কোন ব্যক্তিকেই এর কোন একটা মতবাদের নিখুঁত প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এ দুটোকে স্থায়ী দুটো গোষ্ঠী

হিসেবে না দেখে বরং দেখা উচিত দু ধরনের চিন্তাধারার নির্যাস হিসেবে, মানুষের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংগ্রামরত দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী যৌক্তিক ধারণা হিসেবে। উদ্ভূত কোন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এর যে কোন একটা ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা প্রায়শই দোদুল্যমানতার শিকার হয়ে আঁকড়ে ধরত অন্য বিশ্বাসটিকে।

স্বাভাবিকভাবেই পদে পদে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নানান জটিলতা। মানুষ সবসময়ই তাদের বিশ্বাসভূমিপ্রতিম নীতিগুলোকে পুরোদস্তুর যুক্তিসম্মতভাবে পালন করে চলে না বা করতে পারে না। রামমোহন জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু স্বকালের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতেন না। এমনকি পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মদের নারীমুক্তি আন্দোলনও থমকে গিয়েছিল মাঝপথেই। একই লোকের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনও একটি প্রবণতা আবার কখনও অন্য একটি প্রবণতা মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন র‍্যাডিক্যালপন্থী, পরবর্তী জীবনে পরিণত হয়েছিল অতীন্দ্রিয়বাদী রক্ষণশীলে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কট্টর ঐতিহ্যপন্থী, কিন্তু এই যুগের আগে-পরে, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ১৮৮৬ থেকে শুরু করে ১৮৯৮ পর্যন্ত এবং ১৯০৭ থেকে শুরু করে বাকি জীবনে উদারতাবাদী আধুনিক প্রতীচ্যবাদই ছিল তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ন্তা। এমনকি জীবনের একই পর্যায়েও কেউ কেউ দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে নিজের মতো করে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাগ্রসর একেশ্বরবাদের সঙ্গেই মিশে ছিল বেশ কিছু সামাজিক গোঁড়ামি, যেমন রেজিস্ট্রি বিবাহের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি তিনি। মূলত একটা চিরাচরিত আনুগত্যের সমর্থনে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও দৃষ্টবাদকে (positivism) যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবে বাস্তব জীবনের এইসব জটিলতাগুলো দেখিয়ে উনিশ শতকের বাংলার দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেকার যৌক্তিক পার্থক্যটাকে কিন্তু অস্বীকার করে চলে না।

৪

উদারপন্থী প্রতীচ্যবাদের প্রথম অভিব্যক্তিটা ছিল সামাজিক সংস্কার দাবি করা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন,অযৌক্তিক ও অন্যায় প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আক্রমণ করা। সতীদাহ, বিধবাদের বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীদের হীন অবস্থা,, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি ছিল তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীদের জন্য অন্তত কিছুটা স্বাধীনতা নিয়ে আসা এবং অনড়-অচল সামাজিক নিয়মগুলোর কঠোরতা কিছুটা কমিয়ে আনা। লাগাতার সংস্কার আন্দোলন ছাড়া অন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হত, নির্জীব হয়ে যেত আমাদের বিবেক, অবমাননা ঘটত আমাদের জাতীয় মর্যাদার।

সামাজিক পুনর্বিন্যাসের যে ধরণটা আকৃষ্ট করেছিল আমাদের উদারপন্থী সংস্কারকদের, তা ছিল পাশ্চাত্যের আধুনিকধ্যান ধারণারই সমগোত্রীয়।

সামাজিক সংস্কারের মধ্যে যুক্তিসম্মতভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আরেকটি উপাদান: আধুনিক যুক্তিবাদ। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ-সংস্কারকরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বইপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলো উদ্ধৃত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যুক্তিসম্মত বিচারই ছিল তাঁদের প্রেরণার প্রাথমিক ভিত্তিভূমি, প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিগুলো এসেছিল পরবর্তী ধাপ হিসেবে। পুরনো প্রথা, প্রতিষ্ঠান, ধারণা আর বিশ্বাসগুলোকে দাঁড় করানো হয়েছিল যুক্তির কাঠগড়ায় এবং এক্ষেত্রেও বিচারের মানদণ্ডটা ছিল পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। একটা যুক্তিসম্মত মানসিকতা, যে-কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং পুরনো প্রথা বর্জন করার একটা মেজাজ গড়ে উঠেছিল নব্য শিক্ষার ফল হিসেবে যার প্রকৃষ্ট নজির ছিলেন ডিরোজিওপন্থীরা।

ইতিহাসে যুক্তিবাদ কখনোই চরম সত্যের অনুসন্ধানকারী হিসেবে কাজ করেনি। সদ্যপ্রাপ্ত মূল্যবোধকে রক্ষা করার, পুরনো আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটা হাতিয়ার হিসেবেই যুক্তিবাদকে সক্রিয় হতে দেখেছি আমরা। উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ আর ব্যক্তিগত মানবাধিকারের ধারণার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়েই মাথা তুলেছিল যুক্তিবাদ। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বার্নস্-এর সেই অবিস্মরনীয় পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ "a man's a man for a' that." এটা ছিল অন্তত তত্ত্বগত ভাবেও পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম দিকটারই অভিব্যক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় যে সংস্কৃতির অধঃপতনকে চিহ্নিত করা যায় উদারনৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ আত্মিক মুক্তির সন্ধানে ব্যস্ত থেকেছে, কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষেরা কখনোই মানুষ হিসেবে তাদের বুনিয়াদী মর্যাদাটুকু পুরোপুরিভাবে লাভ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় প্রবণতা অর্থাৎ প্রাচ্যবাদী ঐতিহ্যপ্রিয়তাটা ছিল সামাজিক সংস্কার, উদারনৈতিক যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ এই তিনটি আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করারই একটা প্রবণতা।

ঐতিহ্যপন্থীদের কাছে সামাজিক সংস্কার আদৌ কোন জরুরী ব্যাপার ছিল না। তারা মনে করত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কার আপনা থেকেই ঘটে যাবে, তার জন্য কোমর বেঁধে প্রচার চালানোর কোন দরকার নেই। এমনকি সাতপুরনো যে-সব প্রথাকে মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সেগুলোরও কিছু উপকারিতা আছে বলে মনে করত তারা। নির্দিষ্টভাবে বললে, আইনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কার ঘটানোকে তারা মনে করত একটা অভিশপ্ত ব্যাপার এক

বিধর্মী বিদেশী সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে। ঐ বিদেশী সরকারের অন্যান্য আইনগুলোকে অবশ্য তারা মেনে নিত নির্বিবাদেই। তারা আরও মনে করত যে সামাজিক সংস্কারের জন্য শোরগোল তুললে বিদেশীদের চোখে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে, যদিও সত্যটা বোধহয় ঠিক এর বিপরীতই ছিল। দ্বিতীয়ত, নৈরাজ্যবাদী আত্মানুসন্ধানের চেয়ে কর্তৃত্বকেই জীবনের নিশ্চিততর পথপ্রদর্শক বলে মনে করত ঐতিহ্যপন্থীরা। শাস্ত্রীয় নির্দেশ আর চালু প্রথাগুলোকে তারা দেখাতে চাইত অলঙ্ঘনীয় হিসেবে এবং এগুলোকে প্রাচীন যুগের মানুষদের গভীর প্রজ্ঞার নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরত। সংস্কারকদের দ্বারা উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচনগুলো সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য ছিল—ওগুলো যথেচ্ছভাবে বাছাই করা অংশ এবং অপব্যাখ্যা মাত্র।

তৃতীয়ত, পার্থিব স্তরে ব্যক্তিগত মানবতাবাদী আত্মানুসন্ধানের থেকে ঐতিহ্যপন্থীরা অনেক বেশি মূল্য দিতেন সমাজের বাঁধনস্বরূপ বহুদিনের পরীক্ষিত ধর্মভিত্তিক যৌথ জীবনযাত্রাকে।

৫

ঐতিহ্যপন্থী প্রাচ্যবাদীরা প্রথমে ইতিবাচকভাবেই অতীত গৌরবের মহিমা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, বিদেশী শাসকের কাছে পরাধীনতার অবস্থায় যা ছিল একান্তই একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তাঁরা বলেছিলেন—আমরা কম কিসে? খোদ ইউরোপিয় পণ্ডিতদের গবেষণাও ভারতবর্ষের অতীত মহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। শুরু হয়েছিল স্মরণাতীত কালের ধর্মীয় রচনাগুলোর পুনর্মূল্যায়নও। মানুষের বিক্ষুব্ধ মন আশ্রয় খুঁজছিল 'অতীতের গৌরবগাথা'-র মধ্যে। আত্ম-সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল।

তবে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের চালকের ভূমিকায় দেখানো হচ্ছিল মূলত হিন্দুদেরই। এমন এক সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনের মধ্যে থেকে গড়ে উঠেছিল এই ভূমিকাটা যা নতুন নতুন ঝড় আর চাপের মুখেও ভেঙে পড়েনি—এটাই ছিল প্রতিপাদ্য। ঐতিহ্যপন্থী প্রাচ্যবাদের মধ্যে তাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল একটা দ্বিতীয় উপাদান: হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছিল এ-রকম, ভারতবর্ষের সভ্যতা মানেই হিন্দু সংস্কৃতির ইতিহাস আর খোদ ভারত দেশটাই হচ্ছে হিন্দু চরিত্রবিশিষ্ট। 'নবজাগ্রত' শিক্ষিত সমাজের প্রায় সবাই জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়ার দরুণ এই ধরনের চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হয়ে উঠতে পেরেছিল।

আমাদের এই দ্বিতীয় প্রবণতার তৃতীয় উপাদানটা ছিল এক অতীন্দ্রিয় ভাবসম্পন্ন অধ্যাত্মবাদ। আমাদের চিরাচরিত ধর্মীয় উত্তরাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই ছিল এই অধ্যাত্মবাদ। বিশ্বাস বা ভক্তির পুনরুজ্জীবনকেই তুলে ধরা হচ্ছিল আমাদের মুক্তির উপায় হিসেবে, আমাদের মহামূল্য সামাজিক

দুর্গের ওপর তথাকথিত সবে-দাঁত-ওঠা বস্তুবাদের আক্রমণ প্রতিহত করার সুনিশ্চিত উপায় হিসেবে।
রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থী মূল্যবোধ, অর্থাৎ অতীতপূজা, হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব এবং আবেগজাত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক প্রতীচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সবক্ষেত্রে না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সমালোচনামূলক মনোভাবই নিত, তা বলাই বাহুল্য।
আমাদের অতীত সম্বন্ধে প্রতীচ্যবাদী মূল্যায়নটা স্বাভাবিকভাবেই ছিল অনেক ঝাড়াই-বাছাই ভিত্তিক এবং ফলত আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীটাও সমালোচনামূলকই ছিল। সবকিছুকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার বদলে বিচার করে, বাছাই করে প্রয়োজনীয় দিকগুলো গ্রহণ করতেন প্রতীচ্যবাদীরা। অতীতের অনেক কিছুই ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক। কাজেই সেই অতীতকে তার সমগ্রতায় পুজো করার কোন যুক্তি ছিল না। আর এইভাবে বিচার করলে 'শ্রেষ্ঠতর' হিন্দু ঐতিহ্যের অনেক কিছুই 'সেকেলে' বলে প্রমাণিত হয় এবং তখনই গড়ে ওঠে এই প্রত্যয় যে আমাদের ভবিষ্যতের কাঠামোটা স্রেফ অতীতের পুনঃস্থাপনা হতে পারে না, হিন্দু-অহিন্দু বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের অধিকারের বনিয়াদের ওপরেই গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের কাঠামো। হিন্দু চেতনা শুধুমাত্র ঔদ্ধত্য আর আত্মগর্বেরই জন্ম দেয়। সর্বোপরি, এদেশের বাসিন্দাদের একটা ভাল অংশই ছিল অ-হিন্দু, এমনকি অসংখ্য জাতপাতে বিভক্ত হিন্দুরাও কোন সমভাবাপন্ন ঐক্যবদ্ধ জনসম্প্রদায় হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। শেষত, কোন একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস উদারনৈতিক আধুনিকতার সঙ্গে বেমানান ছিল না। কিন্তু একটা পবিত্র, অপরিহার্য পুরোহিততন্ত্র আর অনড় বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্বলিত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস, যা প্লাবিত করেছিল সমাজজীবনকে, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ বা প্রতিটি মানুষের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক অধিকারের আদর্শ থেকে মানুষের মনকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

৬

একটি তৃতীয় প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছেন অনেকে, যে প্রবণতার মর্মবস্তু ছিল উদারনৈতিক আধুনিকতা আর রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয়তার সমন্বয় ঘটানো। এই প্রবণতার কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা উনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখের মধ্যে এত বেশি করে এই সমন্বয়ের হদিশ পেয়েছেন যে গোটা ব্যাপারটাই বেশ সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। দুটো বিপরীত বস্তুর মিলনের ফলে যেখানে একটা উচ্চতর তৃতীয় সত্তার জন্ম হয় এবং ঐ তৃতীয় সত্তাটা বিকাশের পূর্ববর্তী স্তরগুলোর থেকে উন্নত হয়ে ওঠে, তাকেই বলে প্রকৃত সমন্বয়। আমাদের রেনেসাঁসে মধ্যে কোথায় সেই উচ্চতর তৃতীয় সত্তা

এবং কেনই বা সমন্বয় অত বেশি করে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠত? সামাজিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম আর চিরাচরিত প্রথাকে রক্ষা করার মতো দুটো আদর্শের মধ্যে, ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকার আর হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে, যুক্তি আর অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে কী ধরনের সাচ্চা সমন্বয়ই বা সম্ভবপর? সারা জীবনের জন্যে না হলেও এক একটা বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে এ দুটোর মধ্যে কোন একটাকে বড়জোর বেছে নিতে পারে মানুষ।

বলা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে ঠিক সমন্বয় নয়, আসলে দুটো বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে। বস্তুত পক্ষে এ ঘটনা বারবারই ঘটেছে। পরস্পরবিরোধী দুটো ধারণার সহাবস্থান, মানিয়ে-চলা, বিভিন্ন আদর্শের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব—এগুলো আমরা খুঁজে পাই বহুজনের মধ্যেই।

অতীতের কোন দ্বন্দ্বের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মূল্যবোধের দিকটা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একটা ঐতিহাসিক সংঘাতের মধ্যেকার দুটো দিককেই সমান চোখে দেখা সম্ভব নয়। বাংলার রেনেসাঁসের মধ্যেকার দুটো প্রবণতাই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে এবং সাহায্য করেছে অগ্রগতির পথে। তবে এ দুটোর মধ্যে কোন একটা নিশ্চয়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এই গুরুত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ডটা হল ভবিষ্যতের অগ্রগতির ব্যাপারে কোন্‌টা বেশি উপযুক্ত, বেশি প্রাসঙ্গিক। কে কোন্‌টাকে বেশি গুরুত্ব দেবে, বহুলাংশেই নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর এবং এক্ষেত্রে একটা 'পক্ষপাত' থেকেই যায়। তবে 'বাস্তব সত্যে'-র জন্য 'জঙ্গী সংগ্রাম'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় অনেকেই নিজেদের পক্ষপাতিত্বের কথাটা ভুলে যান বেমালুম।

আমার মতে উনিশ শতকের বাংলায় প্রতীচ্যবাদই ছিল অধিকতর প্রগতিশীল প্রবণতা। ইতিহাসগত বিচারে আমাদের এই 'নবজাগরণ' ঘটেছিল নতুনের প্রতি আকর্ষণের ফলেই, রবীন্দ্রনাথ যাকে অভিহিত করেছিলেন 'জাদুস্পর্শ' বলে। আমাদের বহুজনের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভারত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মহাভারত', গড়ে তোলার পক্ষে প্রতীচ্যবাদী উদারনৈতিক আধুনিকতাই ছিল অনেক বেশি উপযুক্ত। এমনকি সমাজতন্ত্রও এই প্রতীচ্যবাদী উদারনৈতিক আধুনিকতারই স্বাভাবিক ফসল। জাতি বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার মর্মবস্তু অতীত স্মৃতি নয়, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা।

ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতীচ্যবাদ অনেক বেশি উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক, কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মনিরপেক্ষভাবে মানুষকে মানুষের অধিকার দেয়, এর যুক্তিবাদ ধ্বংস করে পরিবর্তনবিরোধী ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামিকে, এর সামাজিক সংস্কারগুলো উজ্জ্বল করে তোলে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে। প্রতীচ্যবাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো আজও নিঃশেষ হয়ে হয়ে যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর চৌহদ্দীর বাইরে নতুন নতুন ক্ষেত্রে এখনও

প্রযোজ্য হতে পারে প্রতীচ্যবাদ।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিচার করলে ঐতিহ্যবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাটা ভ্রূণাকারে খুঁজে পাওয়া যায় এমনকি আমাদের রাজনৈতিক চরমপন্থার মধ্যেও। চরমপন্থা একটা চটজলদি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলেও ভবিষ্যতে তার জন্যে যথেষ্টই মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। এমন এক উত্তরাধিকার সঞ্চারিত করে গিয়েছিল ঐ প্রবণতা যা এক নতুন ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব আজও শেষ হয়ে যায় নি, আজও বারবার তাই আমাদের মুখোমুখী হয় সেই একই সমস্যার কোন্ প্রবণতাটা গ্রহণ করব আমরা।

রামমোহন রায়ের
ধর্মীয় চিন্তাধারা

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য রামমোহন রায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা, যে চিন্তাধারা নিঃসন্দেহেই আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা দিকচিহ্ন হয়ে আছে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত আয়তনের কথা মাথায় রেখে অন্তত দুটো প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমরা আলোচনায় আনতে পারব না—আগেকার আমলের ঈশ্বরবাদী দূরকল্পনা ও সমকালীন ধর্মীয় কার্যকলাপের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক এবং নিজের অনুগামীদের ওপর এবং সারা দেশের নৈতিক মননগত জীবনের ওপর তাঁর প্রভাব।

এই প্রবন্ধের সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হয়েছে রামমোহনের ইংরিজি রচনাপত্র থেকে। বাংলাভাষায় প্রচুর লেখা আছে তাঁর, মাতৃভাষাকে তিনি পরিণত করেছিলেন গুরুগম্ভীর গদ্যের এক উপযুক্ত মাধ্যমে। কিন্তু আরও বেশি সংখ্যক পাঠকের জন্য ইংরিজিতে লেখাপত্র চালিয়ে গেছেন তিনি। গভীর চিন্তাভাবনার এক অমূল্য ভাণ্ডার এই লেখাগুলো, অথচ এগুলোর কথা আমরা খুব কমই জানি। গভীর ভাবনা, নিটোল যুক্তি আর চমৎকার প্রকাশভঙ্গীতে এই লেখাগুলো থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করব আমরা।

প্রথম সূত্রায়ন

রামমোহনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় রচনা 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহিদ্দিন (১৮০৪)। রচনাটি ফার্সি ভাষায় লেখা, ভূমিকাটা আরবী ভাষায়। এর ইংরিজি অনুবাদ (জনৈক মুসলমান পণ্ডিতের করা) প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৮৮৪ সালে। এই পুস্তিকায় আমরা রামমোহনকে খুঁজে পাই একজন পুরোদস্তুর ধর্মহীন ঈশ্বরবাদী (deist) এবং কিছু সীমাবদ্ধতা বিশিষ্ট একজন যুক্তিবাদী হিসাবে। পুস্তিকার ভূমিকাটা শুরু হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে যে, "একজন সৃষ্টিকর্তা ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্বে" বিশ্বাসটা বিশ্বজনীন, অথচ বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। প্রথমোক্ত বিশ্বাসটা হচ্ছে "একটা স্বাভাবিক প্রবণতা" আর ধর্মমত হচ্ছে "অভ্যাস ও চর্চার সাহায্যে···অর্জিত একটি উদ্বৃত্ত ব্যাপার" মাত্র। যৌক্তিক বিচারে পরস্পরবিরোধী ধর্মমতগুলোর প্রতিটাই সত্য হওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলোর কোন একটাকে সত্য বলে দাবি করাটা "সেই মতটার ওপর অযৌক্তিক গুরুত্ব দেওয়া" ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক সিদ্ধান্তটা হচ্ছে, "সমস্ত ধর্মের সঙ্গেই মিথ্যাচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

এই পুস্তিকায় সমস্ত ধর্মীয় গোড়ামিকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন রামমোহন। তিনি বলেছেন, এক পরম সত্তার অস্তিত্বে মানুষের মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসের

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে "খাদ্য ও পানীয়, পবিত্র ও অপবিত্র, শুভ ও অশুভ ইত্যাদি ব্যাপারে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় কষ্টভোগ ও ত্যাগস্বীকারের রীতি" যা শুধুমাত্র "অনিষ্টই করে এবং সমাজজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।" আবার, "মানুষ যে সমাজের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, সেই সমাজের অন্যদের অনুকরণ করতে গিয়ে সে একটা বিশেষ ধর্মমতের পক্ষে কথা বলতে শুরু করে।" মুজ্‌তাহিদরা (ধর্মীয় ব্যাখ্যাকাররা) ধর্ম বিশ্বাসের বিভিন্ন গোঁড়া মতবাদ "উদ্ভাবন করে", "অসম্ভাব্যতায় পরিপূর্ণ" নানারকম অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে এইসব ধর্মমতকে, হাজির করে আপাতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য হরেক যুক্তি "যেগুলো একেবারেই অর্থহীন ও অবাস্তব।" "এরা কেউই অন্যদের ধর্মমত খণ্ডন করতে পারে না…প্রকৃতির বাহ্যিক সুখগুলো অন্যদের সাথে সমানভাবে উপভোগ করতে করতে দিব্যি টিকে থাকে এরা প্রত্যেকে।"

বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামিতে ভরা দাবিগুলোকে একে একে নস্যাৎ করেছেন রামমোহন। যেমন বিভিন্ন ধর্মই দাবি করে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে অলৌকিক ঘটনা ঘটানো একান্তই সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই "অসম্ভব কিছু সৃষ্টি" করবেন না ; "উপলব্ধির নিয়মের সঙ্গে বেমানান" কোন কিছুতে আমরা বিশ্বাস করবই বা কেন ? অনেকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে কোন ধর্ম যদি ভ্রান্তও হয় তাহলেও সেই ধর্মে বিশ্বাস রাখায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু "যুক্তিবর্জিত ও অভিজ্ঞতাবিমুখ" জিনিসের কোন মূল্যই নেই সচেতন মানুষের কাছে। কারণ এ থেকে এমনকি নানান অমঙ্গল এবং অনৈতিক অভ্যাসও দেখা দিতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে চিরাচরিত ধর্মকে অস্বীকার করা মানে "আমাদের পূর্বপুরুষদের অপমান করা।" কিন্তু মানুষ যেহেতু পশু নয়, তাই সে তার ঈশ্বরদত্ত "মননগত ক্ষমতাকে অবশ্যই ব্যবহার করবে।" এটাও একটা চালু ধারণা যে নিজের সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাওয়াটা কারুরই উচিত নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরু অংশের কাছে আবেদন করা ধর্মের সবার কাছেই একটা আঘাত স্বরূপ", যদিও প্রতিটা ধর্মমতই প্রথমে সংখ্যালঘু হয়ে থাকে।

'তুহ্‌ফাৎ'-এর পৃষ্ঠায় আমরা খুঁজে পাই রামমোহনের সমস্তরকম সংকীর্ণ বিশ্বাসমুক্ত ধর্মহীন ঈশ্বরবাদ আর দেখি মানুষের "সহজাত গুণ" অর্থাৎ যুক্তির ওপর বারবার জোর দিচ্ছেন তিনি। তবে তাঁর যুক্তিবাদও কোন নিঃশর্ত ব্যাপার নয়। একটি পরম সত্তার ওপর বিশ্বজনীন বিশ্বাসটা ঐ সত্তার অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ হতে পারে না। অন্য প্রসঙ্গে রামমোহন নিজেই স্বীকার করেছেন যে "কোন কথা কত বেশি জন বলছে, তার ওপর সেই কথার সত্যতা নির্ভর করে না।" তিনি আরও বলেছেন যে আত্মা এবং পরবর্তী জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসটা ("ধর্মসমূহের ভিত্তি") "মানুষের কল্যাণই করে", "যদিও আত্মা এবং পরবর্তী জগতের অস্তিত্ব সত্যিই আছে কি না, তা আজও রহস্যা-

বৃত।" একেবারে শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টির তত্ত্ব নিয়ে তিনি কোন আলোচনা করেননি। "গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সুসামঞ্জস গঠনের উৎসস্বরূপ এক পরম সত্তা"য় মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসটার (যুক্তিটা এভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে) ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি। আসলে এটা কোন যুক্তি নয়, একটা বিশ্বাস মাত্র। আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে হিউমের তীব্র সমালোচনা (যেমন ক্লিনথেস আর ফিলো-র কথোপকথনের ক্ষেত্রে), যে বিষয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন রামমোহনের সমকালীন অনুজ ডিরোজিও, কোন ছাপই ফেলতে পারেনি রামমোহনের ওপর।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর কোন ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশ করেন নি রামমোহন। তাঁর জীবনের প্রথম দিকের যুক্তিবাদ কি তাঁর পাঠকদের পক্ষে আর তাঁর নিজের পক্ষেও কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছিল? ব্রাহ্ম সমাজও এই লেখাটিকে খুব একটা ব্যবহার করেনি। মিস কোলেট্-এর মতে লেখাটি ছিল নিতান্তই কাঁচা, যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

পরম সত্তার প্রকৃতি

এক পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে মানুষ, যে সত্তাকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা যায় না। তিনি "উপলব্ধি ও সমস্ত বর্ণনার অতীত" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। "কোন ভাষা তাঁর বর্ণনা দিতে পারে না, কোন মননগত ক্ষমতা পারে না তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করতে অথবা তাঁর সীমা নির্দেশ করতে। সেই পরম সত্তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, তা আমাদের আদৌ জানা নেই" (কেন উপনিষদ)। তিনি হচ্ছেন "এক চিরন্তন সন্ধানাতীত অপরিবর্তনীয় সত্তা, তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা" (ব্রাহ্ম সমাজের সম্পত্তি ন্যাসাধীন করার ঘোষণাপত্র)।

ঈশ্বরের অজ্ঞেয়তাকে রামমোহন অজ্ঞাবাদের যুক্তিতে নিয়ে যাননি। 'একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে আরও বক্তব্য' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন, পরম সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতার অর্থ এই নয় যে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অবহিত নই। "আমাদের উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতার পক্ষে অগম্য অনেক জিনিসই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, এমনকি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন অনুমিতির সাহায্যে সেগুলিকে ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে" (ঐ)—যেমনটা ঘটে থাকে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে। 'ধর্মীয় নির্দেশ' রচনায় তিনি বলেছেন, আমরা যখন ঈশ্বরকে জ্ঞানাতীত ও অনির্ণেয় বলি, তখন আসলে এটাই বোঝাতে চাই যে "তাঁর প্রতিমূর্তি কল্পনা করা যায় না"; আর যখন আমরা বলি যে তাঁকে জানা যায়, "তখন আসলে তাঁর অস্তিত্বের কথাই বলি আমরা, অর্থাৎ একজন ঈশ্বর আছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনাতীত সৃষ্টি ও পরিচালনাই যাঁর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়।" এই পরিচালনাকারী শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করতে

পারি "বস্তুগত প্রপঞ্চগুলির পর্যবেক্ষণ মারফৎ" (ঈশ্বর উপাসনা প্রসঙ্গে)। সঠিক অর্থে ঈশ্বরকে জানা "দুষ্কর, অথবা অসম্ভব;" "কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে সেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে পাওয়াটা যে-কোন সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষের পক্ষে মোটেই দুরূহ নয়" (হিন্দু একেশ্বরবাদের সমর্থনে)।

'তুহ্ফাৎ'-এ কথা প্রসঙ্গে রামমোহন কোরান থেকে বিভিন্ন পদ্যাংশ ও উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এর বার বছর পর শংকরাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হিন্দু বেদান্তের মধ্যে একটা শক্তপোক্ত জমি খুঁজে পান রামমোহন—অবশ্যই তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির আলোয়। 'হিন্দু একেশ্বরবাদের সমর্থনে' রচনার ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেন, "ঈশ্বরের একত্বের মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দু মতবাদ, কেননা আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত হিন্দু ধর্মের মূল সুর ছিল ঈশ্বরের একত্বই।" 'বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার' রচনার তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন ব্যাসের রচনা থেকে, যিনি "সেই পরম সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা না করে তাঁর কাজ ও সৃষ্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেই সত্তাকে", যেমনভাবে আমরা সূর্যকে ব্যাখ্যা করি তার কাজ দিয়ে। "বহুমুখী, বিস্ময়কর এই ব্রহ্মাণ্ড" থেকে "আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিতে পারি এক পরম সত্তার অস্তিত্বকে, যিনি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করেন"—ঠিক যেমন একটা পাত্র থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি নির্মাতার অস্তিত্বকে।

গঠনকাঠামো সংক্রান্ত যুক্তিগুলো অবশ্যই যৌক্তিক বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার মুখে পড়তে পারে। কিন্তু এই যুক্তিতে অটল ছিলেন রামমোহন। পরমাণু ইত্যাদি কখনোই বিশ্ব সৃষ্টির স্বাধীন কারণ হতে পারে না। "জ্ঞানবর্জিত কোন বস্তুই এত চমৎকারভাবে বিন্যস্ত একটা ব্যবস্থার স্রষ্টা হতে পারে না" (ঐ)। গাছের পাতার মতো নিতান্ত তুচ্ছ একটা জিনিসেরও অত বিস্ময়কর গঠন ও বৃদ্ধি থেকেই সবকিছুর পরিচালনাকারী একটা শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে)। "মহাশূন্যের মতোই দেহও অনন্ত…যে শক্তি তার উপাদানগুলি পরিচালিত করে, তা নিশ্চয়ই আভ্যন্তরীণ শক্তি" (ঈশ্বর উপাসনা প্রসঙ্গে)। আমাদের চারপাশের বস্তুগুলোর "সুশৃঙ্খল, সুদক্ষ ও বিস্ময়কর সম্মিলন এবং বিন্যাস থেকে যে-কোন পক্ষপাতহীন মনেই গড়ে ওঠে এক পরম সত্তার ধারণা" (সংগৃহীত অনুবাদ, ভূমিকা)।

ঈশ্বরের অজ্ঞেয়তার কথা ঘোষণা করার বদলে প্রথম থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিলে সেই পরম সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা সূত্রে পেঁছনো আর দুরূহ থাকে না। "প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক, দুই নন" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার)। "এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা একজনই, তিনি সর্বত্র বিরাজমান" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। "ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার যেহেতু অনন্ত এবং এমন অসীম দক্ষতায় তা বিন্যস্ত, তাই যে সত্তা একে গড়ে তুলেছে তা-ও নিশ্চয়ই সব দিক

থেকেই অনন্ত" (ঈশ্বর উপাসনা)। প্রকৃতি "সেই উপলব্ধিযোগ্য সত্তার অধীন এবং তার ওপরই নির্ভরশীল" (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, ১)। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে মানুষের অনেক গুণ, "যেমন সত্য, দয়া, ন্যায় প্রভৃতি"-কে প্রায়শঃই "ধর্মতত্ত্বের চর্চায় আনকোরাদের বোঝার সুবিধের জন্য ঈশ্বর দত্ত বলে দেখানো হয়ে থাকে (ঐ, IV)। পুরোপুরি অদ্বৈতবাদ অথবা ঈশ্বরের অজ্ঞেয়তার মতবাদ নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়া—কোনটাই গ্রহণ করেন নি রামমোহন।

মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পরমসত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য ধর্মগুলোর কাছে মোটেই অগ্রহণীয় নয়। বরং যে-কোন ধরনের মূর্তিপুজোকে পুরোপুরি অস্বীকার করার জন্যই তিনি আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কোন বিমূর্ত মননগত দর্শনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। আর এই জন্যেই তাঁকে মুখোমুখী হতে হয়েছিল দেশবাসীর শত্রুতা, তিক্ততা এবং হয়রানির। কিন্তু কোন কিছুর জন্যই নিজের কর্তব্যের পথ থেকে সরে আসার পাত্র ছিলেন না রামমোহন।

তিনি সুস্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, উপাসনার ব্যাপারে "যত কিছু মূর্তি, যত কিছু নাম খুঁজে পাওয়া যায়, তা সবই কাল্পনিক" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। বৃহদারণ্যক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন—"শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই ভক্তি করো।" অন্যান্য দেবতাদের মেনে নেওয়ার ফলে ইতিবাচক বৈদিক শিক্ষা "পরিণত হয়েছে ভ্রান্ত ও অবাস্তব" শিক্ষায় (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার)। প্রকৃত ধর্মের জন্য কোন আচার-অনুষ্ঠান পালনকে তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন (হিন্দু একেশ্বরবাদ)। "এক সর্বশক্তিমান সত্তার কোন কারণই নেই—একটা রূপ পরিগ্রহ করার ;" "ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে মানুষের মোটামুটি ধারণা আছে," তার পক্ষে তাঁর রূপের কোন বর্ণনা দেওয়া "একেবারেই অসম্ভব" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে)।

বিভিন্ন শাস্ত্রে মূর্তিপুজোর যে-সব কথা আছে, সেগুলো "শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা নিজেদের মনকে উন্নত করে তুলতে সক্ষম নয়," "এগুলো শুধু তাদেরই কাজে লাগে যাদের উপলব্ধির ক্ষমতা মোটেই যথেষ্ট নয়" (ঈষোপনিষদ, মুখবন্ধ)। এইসব শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলো "সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের কিছু ছাড় দেওয়া মাত্র, 'প্রজ্ঞাবান মানুষে'-র জন্য নয়" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে)। উপাসনার জন্য দৃশ্যমান কিছু বস্তুর আশ্রয় নেওয়াটা হচ্ছে একটা "শিশুসুলভ অভ্যাস মাত্র" (হিন্দু একেশ্বরবাদ)। একমাত্র "নিরেট মূর্খরাই" বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, বলিদান ইত্যাদির মঙ্গলজনক প্রয়োজনীয়তায়

বিশ্বাস করে (মুন্ডক উপনিষদ) ; "মূর্খরাই…আচার-অনুষ্ঠানের ফাঁদে পা দিয়ে থাকে" (কঠোপনিষদ)। এছাড়াও আছে এইরকম সব অশ্রদ্ধাবাচক উক্তি —মূর্তিপূজো হচ্ছে "কম ক্ষমতার লোকেদের ব্যাপার" (সংগৃহীত অনুবাদ, ভূমিকা) ; "দুর্বল মননবিশিষ্ট লোকদের" "দুর্বল, ও অজ্ঞদের" ব্যাপার (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, ২) ; "তাদেরই (যেমন, মূর্খদের) ব্যাপার যারা দুর্ভাগ্যবশত অদৃশ্য সেই পরম সত্তাকে ভক্তি করতে অক্ষম" (ঐ, ৪)। এইসব কথা শোনার পর লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে উঠেছিল রামমোহনের ওপর। মানুষের ভাবপ্রবণতা স্বভাবতই আহত হয়েছিল। আবার একইভাবে যে ধর্ম-সংস্কারক নিজেকে শুধু কেতাবি দূরকল্পনায় আবদ্ধ রাখতে রাজি নন, তাঁর পক্ষেও চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না।

তবে রামমোহন স্বীকার করেছিলেন যে মূর্তিপূজো "পুরোপুরি অর্থহীন নয়" (বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি)। চরম আলস্য আর নিষ্ক্রিয়তায় নিমজ্জমান লোকদের মূর্তিপূজো করতে দেওয়া যায় (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগানিন, ৪)। কিন্তু মূর্তিপূজোর ব্যাপারে পণ্ডিতদের যুক্তি মেনে নিতে আদৌ রাজি ছিলেন না তিনি। মানুষের পক্ষে একেবারেই মূল্যহীন নানান প্রথার স্বপক্ষে প্রদত্ত বিভিন্ন মননগত যুক্তি-গুলোকে তিনি একে একে খণ্ডন করেছেন। 'ঈশোপনিষদ'-এর মুখবন্ধে এই খণ্ডন করার কাজটার ওপরেই সবথেকে জোর দিয়েছেন তিনি।

যদি বলা হয় যে সেই পরম সত্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব, তাহলে শাস্ত্রসমূহে কেন মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "ঐ জ্ঞান অর্জন করার ?" যদি বলা হয় যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করা দুষ্কর, "তাহলে আমরা সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য আরও বেশি করে চেষ্টা করব।" একজন ঈশ্বরের উপাসনা কেবলমাত্র মুনি-ঋষিদেরই সাজে—এই যুক্তির উত্তরে রামমোহন যাজ্ঞবল্ক্যকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এ-রকম উপাসনার অনুষ্ঠান করার জন্য একজন গৃহকর্তাকেও দরকার হয়। সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনেক ইউরোপিয় বলেছেন—মূর্তি হচ্ছে আমাদের মনকে ঈশ্বরের কাছে উন্নীত করার একটা উপকরণ মাত্র। এর প্রত্যুত্তরে রামমোহন বলেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা "নিজেদের মূর্তিপূজোর বস্তুগুলোকে বিভিন্ন দেবতা হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বে" বিশ্বাস করে, এক একটা বস্তুর ওপর আরোপ করে এক একটা স্থান ও জীবনপদ্ধতি, "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" অনুষ্ঠানের সাহায্যে মূর্তিগুলোর সজীব হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করে। বলা হয় যে যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, অথচ সমস্ত বস্তুর উপাসনা করা সম্ভব নয়—কাজেই নির্দিষ্ট কয়েকটি বস্তুকে উপাসনা করলে কোন ক্ষতি হয় না। এর উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন —অল্প কয়েকটি বস্তুর উপাসনা করলে সেই সর্বভূতে বিরাজমান পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায় না, আর সর্বোপরি "আমরা যা দেখি বা অনুভব করি, ঈশ্বর তার থেকে একেবারেই আলাদা।" মূর্তিপূজো মনকে পরিশুদ্ধ করে

তোলে, এই বক্তব্যের জবাবে রামমোহন বলেছেন কোনরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ-অনুষ্ঠানই মনকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথার অজুহাতে যাঁরা মূর্তিপূজো সমর্থন করেছেন, তাঁদের কথার জবাবে রামমোহনের বক্তব্য হল—"স্থূল খামখেয়ালিপনার ফলস্বরূপ" প্রথা আর প্রকৃত বিশ্বাস একেবারেই আলাদা ব্যাপার, কারণ প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি হল "আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সঠিক যুক্তি।" তাছাড়া প্রথা পরিবর্তনশীল, সম্প্রতিকালে "নিজেদের পার্থিব সুযোগ-সুবিধার উন্নতি ঘটানোর জন্য" মানুষ বার বার নতুন নতুন প্রথার আশ্রয় নিয়েছে। 'হিন্দু একেশ্বরবাদ' সংক্রান্ত রচনাটিতেও তিনি দেখিয়েছেন যে হিন্দুরা তাদের দেবদেবীদের ঈশ্বরের "প্রতিনিধি" বলে মনে করে না, এইসব দেবদেবীদের তারা মনে করে "পৃথক পৃথক ঈশ্বর" বলে এবং এই প্রতিটি ঈশ্বর "নিজস্ব মহিমাতেই" পূজো পাওয়ার যোগ্য। শুধুমাত্র অজ্ঞদেরই যে মূর্তিপূজোর অনুমতি দেওয়া যায়, সেই মূর্তিপূজো কার্যত ঈশ্বরের একত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করার দিকেই টেনে নিয়ে গেছে মানুষকে (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে)।

মূর্তিপূজো শুধুমাত্র একটা মননগত ভ্রান্তিই নয়, এর কিছু অশুভ প্রতিক্রিয়াও আছে। 'একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে' রচনায় 'কুলার্ণব' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন রামমোহন: "যারা মনে করে ঈশ্বরের কোন মূর্তি আছে···তারা তাদের অন্ধ বিশ্বাসের দরুণ শুধু যন্ত্রণাই পেয়ে থাকে।" "মূর্তিপূজোকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান কখনোই মানুষকে চিরন্তন স্বর্গীয় আনন্দ দিতে পারে না"—কেননা যাদের প্রাঞ্জল বোধশক্তি নেই, একমাত্র তাদেরই সাজে মূর্তিপূজো করা (মুণ্ডক উপনিষদ, মুখবন্ধ)। মূর্তিপূজোর ব্যাপারে মানুষের আসক্তি থেকে জন্ম নেয় "নিষ্ফল কল্পনা," সেইজন্যই "কোন দেবদেবীকে মানুষের কল্পনা অনুযায়ী রূপ দেওয়া"-র বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা দরকার" (সংগৃহীত অনুবাদ, ভূমিকা)। অন্যথায় আমরা পেঁছে যাই এক অবাস্তবতা রাজ্যে "যা যুক্তির প্রতিটি চিহ্ন ধ্বংস করে দেয়, নিভিয়ে দেয় উপলব্ধির প্রতিটি আলো" (কেন উপনিষদ, ভূমিকা)।

মূর্তিপূজোর চাপে পড়ে প্রকৃত ধর্ম শিথিল হয়ে পড়ার ফলে অনেক পার্থিব ক্ষতিও ঘটে গেছে। উন্নততর বৈদান্তিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে যে-সব অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটার কথা 'একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে' রচনার একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন রামমোহন: সতীদাহ, বিবাহের নামে মেয়ে বিক্রি, পুরুষদের বহুবিবাহ, কুলীনপ্রথা ইত্যাদি। জাতি-ভেদ প্রথাও এর সঙ্গে জড়িত। এটা আমাদের অনৈক্যের অন্যতম কারণ (ব্রহ্মা-নিক্যাল ম্যাগাজিন, ১)। এই প্রথা হিন্দুদের বঞ্চিত করেছে "দেশপ্রেমের অনুভূতি" থেকে (ব্যক্তিগত চিঠি, ১৮ জানুয়ারি, ১৮১৮)। উন্নততর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে আমাদের সামাজিক কুপ্রথাগুলো—এমনটাই

মনে করতেন রামমোহন। "প্রকৃতির সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর নামে করে অনুষ্ঠিত হয়" যে উৎসবগুলো, "তা যাবতীয় নীতিবোধের পক্ষে এক ধ্বংসাত্মক প্রবণতা" (হিন্দু একেশ্বরবাদ)। সঠিক পথ থেকে একবার বিচ্যুত হলেই শুরু হয় আমাদের পদস্খলন।

এই করুণ অবস্থার জন্য রামমোহন স্পষ্টভাবে দায়ী করেছেন পুরোহিততন্ত্রকেই। বস্তুতপক্ষে ঠিক এই প্রশ্নেই লুথারিয় ধর্মসংস্কারের সবথেকে কাছাকাছি এসেছিলেন তিনি। রীতিমতো কঠোর ভাষাতেই অভিযোগটা এনেছিলেন রামমোহন, "মূর্তিপুজোর অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণই যথেষ্ট সচেতন…কিন্তু মূর্তিপুজোর ঐ-সব আচার-অনুষ্ঠান আর উৎসবের মধ্যেই নিজেদের আরাম আর সৌভাগ্যের রসদ মেলে বলে তাঁরা মূর্তিপুজোকে সমস্ত আক্রমণ থেকে তো রক্ষা করেনই, এমনকি তাকে উৎসাহও যোগান।" আবার, ব্রাহ্মণরা "আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে আমাদের কাছে থেকে আড়াল করে রেখে অবিরাম শিক্ষা দিয়ে চলে—আমরা যা বলি তা বিশ্বাস করো, ঐ-সব ধর্মগ্রন্থ পরীক্ষা করে দেখতে যেও না বা ছুঁয়েও দেখো না, পরোপুরি বিসর্জন দাও নিজের যুক্তিবুদ্ধিকে…নিজের সম্পত্তির (সবটা না হলেও) বেশির ভাগ অংশটা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে প্রসন্ন করো আমাদের" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। "ব্রাহ্মনরাই বেদান্তের…ব্যাখ্যা করার একমাত্র অধিকারী", "সাধারণ মানুষ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। আর কিছু হিন্দুর আচার-আচরণ তো হিন্দুধর্মের নীতির পুরোপুরি পরিপন্থী।" ব্রাহ্মণদের "কুসংস্কার অত্যন্ত বদ্ধমূল এবং এদের পার্থিব সুযোগসুবিধাগুলি বর্তমান ব্যবস্থার ওপারেই নির্ভরশীল" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার, মুখবন্ধ)। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার শিক্ষকরা পরিচালিত হয়েছেন স্বার্থপরতা"-র দ্বারাই, এবং "মূর্তিপুজোর অসংখ্য অনুষ্ঠান ও উৎসব থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পান বলে তাঁরা সারাক্ষণই উৎসাহ যুগিয়ে যান মূর্তিপুজোয়" (হিন্দু একেশ্বরবাদের সমর্থনে, মুখবন্ধ)। "শিক্ষিত ব্রাক্ষণরা যে স্বপ্নচারিতার কথা বলেন, তা আসলে তাঁদের নিজেদের ও সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়" এবং এই স্বপ্নচারিতা মানুষের কোন কাজেই লাগে না (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। রামমোহন আরও বলেছেন, "হিন্দুদের ভণ্ড পথপ্রদর্শকদের আত্মস্বার্থই মূর্তিপুজোকে হিন্দুদের (তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে অস্বীকার করে) একটা সার্বজনীন ব্যাপারে পরিণত করেছে—যে মূর্তিপুজো যাবতীয় কুসংস্কারের এবং নৈতিকতাবোধকে পুরোপুরি ধ্বংস করার কারণস্বরূপ" (মুণ্ডক উপনিষদ, মুখবন্ধ)।

ধর্মগ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার স্বপক্ষে (যে কাজে তীব্র আপত্তি ছিল পুরোহিতদের) সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন রামমোহন—এক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই লুথারিয় ধর্মসংস্কারের ছায়া: "আজ পর্যন্ত এমন কোন

পুরাণ আমার চোখে পড়েনি যেখানে ধর্মগ্রন্থকে কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে নিষেধ করা হয়েছে" (হিন্দু একেশ্বরবাদ, ভূমিকা)।
মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে রামমোহনের এই তীব্র ক্রোধের পিছনে দেশবাসীর প্রতি একটা করুণাও লুকিয়ে ছিল। "আত্মস্বার্থের চিন্তায় যারা আচ্ছন্ন নয়, তাদের প্রত্যেকের মনে নিজের দেশবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সমবেদনাটা আপনা থেকেই আসে বলে মনে হয় আমার। দ্বিতীয়ত, আমি তাদেরই স্বদেশবাসী এবং একান্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে অবশ্যই তাদের দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থার অংশীদার (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। "জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ এই আমাকেও শুনতে হয়েছে নানান অভিযোগ ও ভর্ৎসনা—এমনকি আমার কয়েকজন আত্মীয়ের কাছ থেকেও" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার, মুখবন্ধ)। "মূর্তিপুজোর মতো এক সর্বনাশা রীতির প্রতি আমার দেশবাসীদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ব্যাপারটা আমাকে বরাবরই দারুণ দুঃখ দিয়েছে" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। রামমোহন কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, স্বদেশবাসীদের একজন হয়েই তাদের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। তাঁর স্বদেশবাসীরা অবশ্য তাঁকে নিজেদের একজন বলে মেনে নিয়ে স্বজনের মতো আচরণ করেনি।

প্রকৃত উপাসনা

ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা অথবা সনাতন ধর্মের সঙ্গে মননগত বিরোধ আমাদের দেশে কোন নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু রামমোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ঐ বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রচলিত সমস্ত রকম মূর্তিপুজো এবং আচার-অনুষ্ঠান বাতিল করে ঈশ্বর উপাসনার এক বিশুদ্ধ রীতি গড়ে তোলার। অতীতে একেশ্বরবাদী মত বা সম্প্রদায়ও প্রচুর দেখা গেছে। ঐ-সব মত বা সম্প্রদায়ের শিকড় "ভক্তির আবেগ", পর্যন্ত গিয়ে থেমে ছিল সরাসরি দার্শনিক বিশ্লেষণ থেকে সেগুলো রস গ্রহণ করে নি। রামমোহন প্রচারিত প্রকৃত উপাসনাকে তাই ঘিরে ছিল এক আধুনিকতার বলয় আর এর মধ্যে প্রতীচ্যবাদের প্রভাব খুঁজে পাওয়াকেও খুব একটা কষ্টকল্পনা বলে মনে হয় না। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারায় অভিজাতদের জন্য মহিমান্বিত সুদূরপ্রসারী কল্পনা আর সাধারণ মানুষের বিচার-বিবেচনাহীন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেকার চিরাচরিত ব্যবধান দূর করার আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্তই স্পষ্ট ছিল।
একটু একটু করে রামমোহন পেঁাছে গেছেন সরাসরি একজন ঈশ্বরের উপাসনা করার চিন্তায়। "এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় নিয়ন্তা একজনই...তাঁর উপাসনা করাই মানবজাতির প্রধান কর্তব্য" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। মানুষের করা উচিত সেই ঈশ্বরেরই "যিনি বাস করেন অন্তরে, পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন সমগ্র জীবজগতে" (উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি), "কিন্তু তাঁর কোন নাম নেই" (সম্পত্তির দলিল)। "শাস্ত্র নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই—

সুশীতল দখিনা বাতাস বইলে পাখার দরকার থাকে না" (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ)। "বেদোক্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন না করেও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যায়" (হিন্দু একেশ্বরবাদ, ভূমিকা)। সুপ্রসিদ্ধ শংকরাচার্য ঘোষণা করেছিলেন…যে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান পুরোপুরি বর্জন করেও সেই পরম সত্তার উপাসনা করা যায়" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। "শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিভিন্ন কর্তব্য ও আচার-অনুষ্ঠান যারা কখনোই পালন করেনি, তারাও অর্জন করতে পারে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান…বলে গেছেন মহামতি ব্যাসদেব" (পরম স্বর্গসুখের সন্ধানের স্বপক্ষে)।

এই নতুন উপাসনার মূল কথা ছিল সরাসরি ঈশ্বরের প্রতি মন দেওয়া, কারণ "ঈশ্বরকে যে জানতে চায় সে সেই জ্ঞান লাভ করে, ঈশ্বর স্বয়ং তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন" (মুণ্ডক উপনিষদ)। উপাসনার যথার্থ পদ্ধতিটি হবে এ-রকম: "আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, শুনতে হবে তাঁরই কথা, ভাবতে হবে তাঁরই কথা এবং চেষ্টা করতে হবে তাঁর কাছে পেঁছানোর" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার)। "উপাসনার অর্থ হল কোন একজনকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। কিন্তু সেই পরম সত্তার উপাসনা করার অর্থ হল তাঁর গুণরাজি উপলব্ধির চেষ্টা করা" (ধর্মীয় নির্দেশ)। 'সম্পত্তির দলিল'-এ প্রক্রিয়াটা চিহ্নিত করা হয়েছে এইভাবে, "ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা সম্বন্ধে উপলব্ধির উন্নতি ঘটানো।" যাঁকে চিন্তা করা যায় না তাঁর উপাসনাও করা যায় না—এই স্বাভাবিক যুক্তিটির উত্তরে বলা হয়েছে: "উপাসনার অর্থ শুধু সেই সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের স্তরে নিজের মনকে উন্নত করে তোলা …তাঁর ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত অনুধ্যান করা…আর সেই সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব, অনুভূতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর প্রতি অবিরাম কৃতজ্ঞতা বোধ করা…আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে তাঁর উপাসনা শুধু যে সম্ভবপর এবং সাধ্যায়ত্ত শুধু তা-ই নয়, এটা সমস্ত বুদ্ধিমান জীবের পবিত্র কর্তব্যও বটে" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। ব্রাহ্মরা আজও মোটামুটি বিশ্বস্তভাবেই এই ধারা অনুযায়ী উপাসনা করে থাকেন, যদিও কল্পনা প্রায়শঃই এই ছকের থেকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে চায়। উপাসনার কিছু ফলাফল থাকে। "আমাদের সমস্ত আবেগ, শরীরের বাহ্যিক অনুভূতি আর শুভ কাজগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ…এই কাজগুলি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পেঁছনোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার)। "ঈশ্বর উপাসনার একটা অঙ্গ হচ্ছে নৈতিক বোধ…এবং ঈশ্বর সান্নিধ্যে মনকে যুক্ত করার সঙ্গে…শুভ কাজগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। "ধর্মের প্রকৃত ব্যবস্থাটা…তার পালনকারীকে পেঁছে দেয় ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞান ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় এবং অন্যান্য মানুষদের প্রতি ভালবাসায়, তাদের অন্তরে জন্ম নেয় নম্রতা আর দয়া এবং তারই সঙ্গে দেখা দেয় মনের স্বাধীনতা ও বিশুদ্ধ আন্তরিকতা" (কঠোপনিষদ, মুখবন্ধ)। 'সম্পত্তির

দলিল'-এ "দয়া, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, বদান্যতা, সদ্‌গুণ উন্নত করা এবং সমস্ত ধর্ম, বিশ্বাস ও মতাবলম্বী মানুষের মধ্যেকার ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর করে তোলা"-র কথা বলা হয়েছে। 'ব্রাহ্মণক্যাল ম্যাগাজিন'-এর চতুর্থ সংখ্যায় বলা হয়েছে—"যে পবিত্র শ্রদ্ধার কথা আমরা বলে থাকি, তা একমাত্র পরস্পরের প্রতি দয়া বা বদান্যতা দেখানোর মধ্যেই নিহিত, কোন কাল্পনিক বিশ্বাস অথবা হাত, পা, মাথা, জিভ বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু নড়াচড়ার মধ্যে নয়।"

রামমোহনের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে প্রতীচ্যবাদের দুটি সম্ভাব্য উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়: সমবেত প্রার্থনা ও স্তোত্র গান। একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে দীর্ঘ-দিনের মেলামেশার ফলেই তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল সমবেত প্রার্থনার চিন্তা। ব্রাহ্মদের জমায়েতগুলোতে একেবারে প্রথম থেকেই চালু হয়েছিল এই সমবেত প্রার্থনার রীতি। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা উদ্ধৃত করে একেশ্বরবাদী গীতের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন রামমোহন (হিন্দু একেশ্বরবাদ, ভূমিকা) এবং বলেছেন: "সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গীতে কোন চিন্তার কথা বললে তা মানুষের মধ্যে যতটা ছাপ ফেলে, তার থেকে অনেক বেশি ছাপ ফেলে গানের মধ্যে দিয়ে শোনালে।" প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, ব্রাহ্মদের প্রার্থনাসঙ্গীতগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এই গানগুলোর মধ্যে যদি নিটোল সত্য প্রকাশ না-ও পেয়ে থাকে তাহলেও এগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য ও কল্পনার এক নতুন জগৎ চিত্রিত হতই আর এটাই চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাসঙ্গীতে।

রামমোহনের উপাসনার ভিত্তি ছিল সেই প্রাচীন মন্ত্র "ওঁ তৎসৎ"—যার অর্থ হল "ওঁ যে বস্তুর কথা চিন্তা করেন, তাকে শুধুমাত্র 'সেই' জিনিস হিসেবেই বর্ণনা করা যায় যা 'বিদ্যমান'" (ঈশ্বর উপাসনা)। এই সত্তা নিয়ে যুক্তিসম্মত বিতর্ক হতেই পারে; এই সত্তা থেকে মানুষ ঈশ্বরের অন্যান্য গুণরাজির দিকে যুক্তিসম্মতভাবে কতটা অগ্রসর হতে পারে, তা নিয়েও বিতর্ক থেকেই যাবে। ব্রাহ্মদের যে-কোন প্রার্থনা বা ঈশ্বর আরাধনার আগে যে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়, তাতে দশটি শব্দ আছে। এর মধ্যে চারটি শব্দ (সত্তা, উপলব্ধি, চিরন্তনত্ব, একত্ব) হচ্ছে রামমোহনের চিন্তাধারার মর্মবস্তু, আর চারটি বড় জোর সিদ্ধান্ত-মূলক আর বাকি দুটি অতিরিক্ত সংযোজন মাত্র।

আত্মা, পাপ ও মরণোত্তর জীবনের তত্ত্ব

আত্মার প্রকৃতি, পাপপুণ্য, মরণোত্তর জীবন—পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই তত্ত্ব-গুলো যে-কোন ধর্মের কাছেই একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আত্মা এবং মৃত্যুর পরেও তার টিকে থাকার ধারণাটা অবশ্যই এই দুঃখময় জগতের সামনে একটা সান্ত্বনাস্বরূপ। পাপপুণ্য ও তার ফলাফলের ধারণাকে সমাজের মূল বন্ধন বলেই মনে করে মানুষ। তবু, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মেনে নিলেও

এইসব ধারণাগুলো স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে না। এগুলোর যুক্তিগত সমস্যা দূর করা যায় চরম অদ্বৈতবাদের সাহায্যে, কিন্তু চরম অদ্বৈতবাদ আবার কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেই স্বীকার করে না। পুরোহিততন্ত্র এবং স্থূলমনা লোকেদের ঠুনকো অনুকম্পার হাতে উপাসনার ভার তুলে দিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর মননগত তৃপ্তি হয়ত খুঁজে পেতে পারেন।

'কঠোপনিষদ'-এ আত্মা সম্বন্ধে রামমোহন বলেছেন: "এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত। ঈশ্বরের থেকেই উদ্ভূত হয় আত্মা—এই মতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যখন আত্মার ব্যাখ্যা করেন, তখন আত্মার চিরন্তনতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না···পার্থিব বস্তুসমূহ থেকে প্রাপ্ত মনের মাধ্যমে দীপ্ত হয়ে ওঠে আত্মা, অবিরাম ক্রিয়া করে ঐ মনের ওপর—এ-কথা জানার পর কোন প্রজ্ঞাবান মানুষ আনন্দে উৎফুল্লও হয়ে ওঠেন না বা দুঃখে ভেঙেও পড়েন না···আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই; আত্মা একটা উপলব্ধি মাত্র···সে জন্মরহিত, অক্ষয়—শরীর আঘাত পেলে আত্মা আহত হয় না···যাবতীয় জীবের হৃদয়েই তার বসবাস···অসৎ কাজ থেকে বিরত না হলে কেউ আত্মাকে জানতে পারে না কিন্তু···ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞানের সাহায্যে···জানা যায় ঈশ্বরকে, অর্থাৎ আত্মার স্রষ্টাকে।" 'কেন উপনিষদ'-এ রামমোহন বলছেন: পরম সত্তাই হচ্ছেন "ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা শরীরের সঙ্গে আত্মার যে সম্পর্ক, যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে পরম সত্তারও সেই একই সম্পর্ক।" 'ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর প্রথম সংখ্যায় তিনি বলছেন, প্রতিটি আত্মাই হচ্ছে "বস্তুর ওপর সেই পরম সত্তার প্রতিফলন," এবং সেই বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী আত্মাটি বুদ্ধিদীপ্ত অথবা ভোঁতাবুদ্ধির হয়ে থাকে। "দীপশিখার মতো ভিন্ন ভিন্ন আত্মাগুলি···ঈশ্বরের সর্বব্যাপী উত্তাপে মিশে যেতে" বাধ্য। "আভ্যন্তরীণ শক্তি" বা "আংশিক সাদৃশ্য" স্বরূপ এই আত্মা কখনোই ঈশ্বরের অনধীন কিংবা ঈশ্বরের সমান হতে পারে না।

আত্মার ধারণার সমর্থনে রামমোহন বলছেন: "প্রতিটি আত্মা যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে কি এগুলি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে? সে কথা ধরে নিলে যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতে হয় এবং তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কোন উপায়ও থাকে না···এমনটা ঘটলে নিরীশ্বরবাদী মতগুলি জোরদার হয়ে উঠবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত ধর্ম" (ঐ)। মনেপ্রাণে ধার্মিক রামমোহন স্বভাবতই কোন আলোচনা না করেই খারিজ করে দিয়েছেন নিরীশ্বরবাদকে।

পাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে অল্প কথাই বলেছেন রামমোহন। তাঁর চিন্তায় অন্তর থেকে উৎসারিত কুচিন্তাই হচ্ছে পাপ, যার সঙ্গে "খাদ্য বা অন্য কোন ব্যাপারে আচার-বিচার পালনের কোন সম্পর্কই নেই" (কঠোপনিষদ, মুখবন্ধ)। "ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা" আর "সমাজের কাছে নতিস্বীকার"-এর মধ্যেকার

আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে প্রথমটিকে পুরোপুরিভাবে পরাজিত করার উপায় হল "আন্তরিক অনুশোচনা ও ধ্যান, যা পাপের শাস্তিস্বরূপ মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগকে প্রশমিত করে · মন্দ কাজ করে মানুষ ঈশ্বরের কাছে যে পাপ করে, তা এইসব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই খণ্ডন হয় বলে মনে করি আমরা" (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, IV)।

পাপের কিছু ফলাফল থাকেই। প্রতিটি আত্মা "তার ভাল অথবা মন্দ কাজ-গুলির জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে থাকে" (কঠোপনিষদ)। "শরীরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আত্মা তার অজ্ঞানতার দরুণ ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে নিজের অপ্রতুলতার জন্য শোকার্ত হয়। কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করতে পারে তার সঙ্গীকে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সেই মহান প্রভুকে…তখন সে মুক্ত হয় দুঃখ আর মোহ থেকে…যে প্রজ্ঞাবান মানুষ জেনেছেন সমস্ত জীবের মধ্যেই বাস করেন ঈশ্বর, তিনি দ্বৈতবাদের যাবতীয় ধারণা ছুঁড়ে ফেলে দেন, উপলব্ধি করেন জগতে প্রকৃত সত্তা একটিই—তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর" (মুণ্ডক উপনিষদ)। ঈশ্বরের কাছ থেকেই সৃষ্টি হয় আত্মার, কিন্তু "ভাল আর মন্দ কাজের ফল" হিসেবে "পুরস্কার বা শাস্তি পেতে সে বাধ্য" (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, I)।

পাপপুণ্যের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয় এই জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও, কেননা একমাত্র নিরীশ্বরবাদীরাই বলে মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। এক্ষেত্রে নিজের স্বভাবসিদ্ধ যুক্তিবিন্যাস ব্যতিরেকেই শাস্ত্রীয় বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন রামমোহন (ঐ, II)। ভাল বা মন্দ কাজের ফলাফল "এই জগতেও ভোগ করতে হয়" অথবা "মৃত্যুর পর পাপ কিংবা গুণ অনুযায়ী ঈশ্বর কাউকে পাঠান নরকে, কাউকে স্বর্গে", এমনকি "কাজ অনুযায়ী তাদেরকে সপ্রাণ অথবা নিষ্প্রাণ অন্য দেহও" দিয়ে থাকেন। বস্তুত পক্ষে এখানে রামমোহন তাঁর 'তুহ্ফাৎ'-এর যুক্তিবাদ থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছেন। এ থেকেই আসে জন্মান্তর ও কর্মফলের তত্ত্ব এবং এই সুস্পষ্ট যুক্তিটাকে অস্বীকার করা হয় যে ঐ জন্মান্তর আর কর্মফলের কারণস্বরূপ পূর্বতন কাজগুলোর কোন স্মৃতি থাকে না বলে মৃত্যুর পর পুরস্কার বা শাস্তির কোন যৌক্তিক ক্ষমতাও থাকে না। এক্ষেত্রে রামমোহনের সূত্রায়নটা লক্ষণীয়ঃ "ভাল অথবা মন্দ কাজের পুরস্কার বা শাস্তিকে বেদান্ত মরণোত্তর জীবনের ব্যাপার বলে স্বীকার করে না, বিশেষ একটা বিচারের দিনের ব্যাপার বলে তো নয়ই" (ঐ, IV)।

রামমোহন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই পরম সত্তার কথা গভীরভাবে চিন্তা করা এবং তাঁকে জানা। এই পরিত্রাণটা স্বর্গীয় সুখের ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। "একমাত্র পরম সত্তাকে জানলেই মানুষ স্বর্গীয় সুখ পেতে পারে" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। "শাশ্বত স্বর্গসুখ পাওয়ার একমাত্র উপায় ঈশ্বরকে সঠিকভাবে জানা" (মুণ্ডক উপনিষদ)। ঈশ্বর সবন্ধে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী মানুষ

স্বর্গীয় সুখ লাভ করেন। "মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে যখন মুক্ত হয় মানুষ; তখন এই নশ্বর মানুষও হয়ে ওঠে অবিনশ্বর এবং এই জীবনেই সে অর্জন করে সমাধির অবস্থা" (কঠোপনিষদ)। যে মানুষ ঈশ্বরকে জেনেছে, সে "এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার পর লীন হয়ে যায় সেই পরম সত্তার মধ্যে" (কেন উপনিষদ)। মৃত্যুর পরে ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে-সব ধারণা চালু আছে মানুষের মধ্যে, সে ব্যাপারে কোন কথা পাওয়া যায় না রামমোহনের রচনায়।

খ্রিশ্চান গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ

খ্রিশ্চান মতবাদ সংক্রান্ত বিতর্কে ঘটনাচক্রেই জড়িয়ে পড়েছিলেন রামমোহন। ১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'যীশুর অনুশাসন' (Precepts of Jesus)। এই রচনায় তিনি বলেন যে সবকিছুর নিয়ন্তা হিসেবে এক পরম শক্তির অস্তিত্ব সংক্রান্ত খ্রিশ্চানদের ধারণা এবং অন্যের কাছে মানুষ যেমন ব্যবহার আশা করে, অন্যদের সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহারই করা উচিত, এই নীতিটি আমাদের অস্তিত্বকে অনেক মনোরম ও ফলপ্রসূ করে তোলে। শান্তি ও সমন্বয়ের পক্ষে সহায়ক যীশুর নৈতিকতা সংক্রান্ত উপদেশগুলি "অধিবিদ্যক বিকৃতির অনেক ঊর্ধ্বে এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের পক্ষেই সমান বোধগম্য।" যীশুর ঈশ্বরত্ব পরোক্ষভাবে অস্বীকৃত হচ্ছে দেখে গোঁড়া খ্রিশ্চানরা খেপে উঠে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল রামমোহনকে।

প্রত্যুত্তরে রামমোহন ইঙ্গিত করেছিলেন ভারতের খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের দিকে, "যে বাংলায় ইংরেজরাই একচ্ছত্র শাসক এবং যেখানে ইংরেজদের নাম শুনলেই মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, সেখানকার দরিদ্র, ভীরু ও নম্র বাসিন্দাদের অধিকার এবং ধর্মের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপকে ঈশ্বর কিংবা সাধারণ মানুষ কারুর পক্ষেই ন্যায্য কাজ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।" আবার "অন্যায় সুবিধা নেওয়া আর অপমানের সাহায্যে কিংবা মানুষকে বিভিন্ন পার্থিব লাভের আশা দেখিয়ে কোন ধর্ম চালু করার চেষ্টা যুক্তি ও ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়" ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন, I)। খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকরা হিন্দুদের উন্নত দর্শনকে অস্বীকার করেন এবং উপহাস করেন মূর্তিপুজোকে, কিন্তু তাঁরাও কি খুব জোর গলায় "যীশুখ্রিষ্টই ঈশ্বর" বলে দাবি করেন না ? (ঐ, II) 'বিনম্র মতামত' (Humble Suggestions) রচনায় অবশ্য তিনি বলেছেন যে খ্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের ওপর আমাদের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বরং নিজেদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে অন্ধত্বের জন্য তাদের "করুণা"-ই করা উচিত, কেননা "যাদের প্রচুর সম্পদ আর ক্ষমতা থাকে, তাদের পক্ষে নিজেদের ভুলত্রুটি উপলব্ধি করা" প্রায় অসম্ভব।

গোঁড়া খ্রিশ্চান মতবাদের যা প্রাণস্বরূপ, সেই ত্রিত্ববাদের (trinitarianism) বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই "ভুলত্রুটিগুলো" চিহ্নিত করেছেন রামমোহন। খ্রিশ্চানদের ঈশ্বর কি ত্রিবচনবিশিষ্ট কোন নামবাচক বিশেষ্য অথবা জাতিবাচক বিশেষ্য? ত্রিত্বের ধারণাটা "যুক্তি ও অভিজ্ঞতার একেবারেই বিরোধী"। ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পাওয়ার ফলেই খ্রিশ্চানরা "তাদের মতবাদের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত হয়ে ওঠে।" খ্রিশ্চান ধর্ম চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষে "এক ধরনের বহুঈশ্বরবাদী ধারণা"-র বদলে আর এক ধরনের বহুঈশ্বরবাদী ধারণা চালু করার এবং দু'ধরনের ধারণারই রক্ষাকবচ হচ্ছে "রহস্যের বর্ম'।" ত্রিত্ববাদী ধারণার ঐ তিনজনের মধ্যে কোন একজনের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে "দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জনের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতাটা অনাবশ্যক ও অবাস্তব হয়ে ওঠে। কিন্তু একজনের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে সংখ্যাটাকে আমরা তিনেই বা সীমিত রাখতে যাব কেন?" কুসংস্কারমুক্ত সাধারণ বুদ্ধিটুকু থাকলে যে-কেউই পারে "এই ধর্মমতের মুখ থেকে কুতর্কের রঙচঙে মুখোশটা ছিঁড়ে দিতে · যে কুতর্ক মানুষের সাধারণ বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গত প্রমাণের বিরোধী"। এই উদ্ধৃতিগুলো নেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা থেকে।

প্রত্যাদিষ্ট বাইবেলই হচ্ছে এই মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু—এ-কথার উত্তরে রামমোহন বলছেন: "যে গ্রন্থে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার অস্বীকার করা হয়, তা কি সেই পরম সত্তার সৃষ্টি হতে পারে যিনি সমগ্র মানবজাতিকে ইন্দ্রিয় দিয়েছেন?" (ঐ III) কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও খ্রিশ্চান মতবাদকে অশ্রদ্ধা করতেন না রামমোহন। ওয়্যার-এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে (১৮২৪) তিনি বলেছেন: "ঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে আমাদের জানা অন্য যে-কোন ধর্মের চেয়ে খ্রিশ্চান ধর্মেই মানবজাতির নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করে তোলার প্রবণতা অনেক বেশি করে চোখে পড়ে।"

বাংলার একেশ্বরবাদী খ্রিশ্চানদের সঙ্গে আর বিদেশের বিভিন্ন জায়গার একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন রামমোহন। 'এক হিন্দুর উত্তর' (Answer of a Hindu) রচনায় তিনি বিভিন্ন একেশ্বরবাদী অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতির (ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলার আগে) সমর্থনে বহু কারণ দেখান। এগুলোর মধ্যে ছিল—ঈশ্বরের একত্ব সংক্রান্ত একেশ্বরবাদী মতবাদ বেদের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য; বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজোকে তার যাবতীয় আধুনিক রূপসহ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা; ব্রাহ্মণ্য এবং ত্রিত্ববাদী, উভয় ধরনের রূপক-বর্ণনাকেই অস্বীকার করা; ব্রাহ্মণ ও "ভাল পোশাক পরিহিত, সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন এবং বিজয়গর্বে গর্বিত আর একদল পুরোহিত" কর্তৃক প্রচারিত "নর-দেবতা"-র (man-god) ধারণা খারিজ করে দেওয়া ইত্যাদি।

'কেন উপনিষদ'-এর মুখবন্ধে রামমোহন নিজের ভাবনা সূত্রবদ্ধ করে বলেছেন : "প্রাচীন জাতিগুলির ঐতিহ্যের দিকে তাকালে একের সঙ্গে অপরের অনেক পার্থক্য প্রায়শই চোখে পড়ে। আর যখন···সুনিশ্চিত পথপ্রদর্শক হিসেবে আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই, তখন দেখতে পাই আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে যুক্তি একা কত অযোগ্য···এ থেকে শুধু একটা সামগ্রিক অবিশ্বাসই গড়ে ওঠে যা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিস্বরূপ নীতিগুলির সঙ্গে আদৌ মানানসই নয়। সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে এই দুটোর কোনটার হাতেই নিজেদের পুরোপুরি সঁপে না দিয়ে উভয়ের আলোককেই যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমাদের মননগত ও নৈতিক গুণাবলী উন্নত করে তোলার চেষ্টা করা।" এই ভারসাম্য রক্ষা করাটা নিঃসন্দেহেই কঠিন ছিল। তবে "সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য"-এর অত্যাধুনিক ধারণাটা হয়ত এই সন্ধানের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারত।

বেদের প্রতি রামমোহন যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার অনেক নজিরই খুঁজে পাওয়া যায়। 'বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন যে বেদেই বলা হয়েছে এটি "ঈশ্বরের দ্বারা রচিত"। 'একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা' রচনায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে "ধর্মীয় বিতর্কে আমি কখনোই এমন কোন যুক্তি হাজির করিনি যা বেদের বক্তব্য এবং তার সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের বক্তব্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি।" 'ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর চতুর্থ সংখ্যায় আরও এগিয়ে গিয়ে তিনি "প্রত্যাদিষ্ট বেদ", "বেদের ঐশ্বরিক পথনির্দেশ এবং বিশুদ্ধ যুক্তির নির্দেশ"-এর কথা বলেছেন। আরও বলেছেন, "বেদ হচ্ছে আমাদের শাসন করা ও পথনির্দেশ দেওয়ার ব্যক্ত এবং প্রবর্তিত ঈশ্বরের নিয়ম।" অবশ্য নিজের বক্তব্যের শ্রোতা পাওয়ার জন্য বেদকে এইভাবে চিহ্নিত করাটা হয়ত তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়ই ছিল, ঠিক যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলা আর ব্রাহ্মণদের প্রথম প্রার্থনাগুলোতে বেদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোরও হয়ত দুটো উদ্দেশ্য ছিল—সহজতম পথে এগোনো আর মানুষের চিরাচরিত রীতিকে সম্মান দেখানো।

রামমোহন অবশ্য অনেক বেশি করে যুক্তিরই দ্বারস্থ হয়েছেন। 'একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা' রচনায় তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে "কোন বুদ্ধিমান মানুষ" ঈশ্বরকে "স্মরণ করা"-র জন্য কোন বস্তুর আশ্রয় নিতে পারে না। বেদের বিভিন্ন অংশ, যেগুলো স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী (ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বরের বহুত্ব), সেগুলোকে যদি আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ঠিকঠাকভাবে সমন্বয় করে নেওয়া না হয়, "তাহলে সমগ্র রচনাটা যে শুধু প্রামাণ্যতা হারিয়ে ফেলবে তা-ই নয়, নিতান্ত দুর্বোধ্যও হয়ে উঠবে" (কেন উপনিষদ)। "প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে লক্ষ করে" আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করি। এখন আমরা যদি

"বিশ্বাস সৃষ্টির এই মাধ্যম"-টিকে অস্বীকার করি এবং "শূন্যে থেকে বস্তু সৃষ্টির বিশ্বাস আর একদিন এই সবকিছুরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিশ্বাসটা" না চাপিয়ে দিই নিজেদের ওপর, তাহলে ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণার সত্যতা প্রতিপাদনের মতো কোন যুক্তিই আর আমাদের হাতে থাকে না (ঈশ্বর উপাসনা)। বেদের পরস্পরবিরোধী অংশগুলোর মধ্যেকার বিরোধ দূর করার জন্য আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে, অন্যথায় বেদকে "ধরে নিতে হবে স্ববিরোধী এবং সেইহেতু দুর্বোধ্য বলে" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার)।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে যদি আমরা ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর আস্থা না রাখি, তাহলে বিদেশের ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য জানার পর আমাদের বিশ্বাস টলে যাবে (হিন্দু একেশ্বরবাদ)। কিন্তু, "মানুষ যতদিন পর্যন্ত নিজের বোধ ও মানসিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে…ততদিন পর্যন্ত উপলব্ধি বহির্ভূত এবং অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়গত প্রমাণবিরোধী কোন কিছুর ভিত্তিতে রচিত কোন ঘোরানো-প্যাঁচানো কথা দিয়ে তাকে প্রতারিত করা যাবে না" (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, III)। "নিজের বোধ, অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সুসমঞ্জস গতিপথ এবং যুক্তির প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধগুলির পুরোপুরি বিপরীত কোন কিছুতে বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে, একেবারে অসম্ভব না হলেও, খুবই শক্ত" (ঐ, IV)। আবারঃ "এই অযৌক্তিক পথে চলতে শুরু করলে কোথায় গিয়ে পৌঁছব আমরা ? ধর্মতত্ত্ব থেকে যুক্তিকে বাদ দিতে শুরু করে আমরা কি অন্যান্য বিজ্ঞান থেকেও যুক্তিকে বাদ দিতে শুরু করব না ? আর তার ফলে জ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত করা এবং এই পৃথিবীতে অপরিমেয় অশুভেরই কি সূচনা করব না ?" (ঐ, IV) "কোন জিনিস বোধ ও যুক্তির বিরোধী হলে তাকে অস্বীকার করাটাই ন্যায়সঙ্গত" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)।

রামমোহন প্রায়শই সহজবুদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন, যেমন ঈশোপনিষদে (মুখবন্ধে), বেদান্তের সংক্ষিপ্তসারে (মুখবন্ধে ও মূল রচনা, উভয় স্থানেই), হিন্দু একেশ্বরবাদে। "সত্য এবং প্রকৃত ধর্ম সবসময় সম্পদ ও ক্ষমতা, খ্যাতি বা বড় বড় প্রাসাদের ওপর নির্ভর করে না" (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, I)।

ধর্মীয় চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমবেদনা ও সামাজিক বিন্যাস সংক্রান্ত অত্যাধুনিক ধারণাগুলোকে রামমোহন যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তা আরও লক্ষণীয়। "হিন্দুদের মূর্তিপুজোর বিচিত্র পদ্ধতির ফলে যে অসুবিধাজনক, বা বলা ভাল ক্ষতিকর আচার-অনুষ্ঠানগুলি চালু হয়েছে, যা… ধ্বংস করে দেয় সামাজিক বিন্যাসকে, সেগুলি নিয়ে অবিরাম চিন্তাভাবনা আর স্বদেশবাসীর প্রতি আমার সমবেদনা আমাকে বাধ্য করেছে তাদের জাগিয়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে" (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার)। তিনি বলেছিলেন তাঁর লক্ষ্য হল সেইসব অস্বাভাবিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি সংশোধন

করা "যেগুলি হিন্দুদের শুধুমাত্র সমাজের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকু থেকেই যে বঞ্চিত করে তা-ই নয়, এমনকি প্রায়শই তাদেরকে নিয়ে যায় আত্মধ্বংসের দিকেও" (কেন উপনিষদ, মুখবন্ধ)। "মূর্তিপুজো···একটা আতঙ্কজনক ব্যাপারও বটে ···কারণ এর ফলে দেখা দেয় অসততা, ধ্বংস হয়ে যায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য।" আর, "অপরের প্রতি মানুষের যে কর্তব্যবোধ থাকে, সেই কর্তব্যবোধই আমাকে বাধ্য করেছে এই প্রতারণা আর দাসত্ব থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ঘটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে" (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা)। "মূর্তিপুজোর প্রবক্তারা···এমন একটা ব্যবস্থা চালিয়ে যায় যা সমাজের স্বাভাবিক বিন্যাসকে ভেঙে দেয় পুরোপুরিভাবে" (কঠোপনিষদ, মুখবন্ধ)। "সামাজিক আদানপ্রদানের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেদও···দাবি করে মানুষ তার ঐ-সব বাসনাগুলি সীমিত করুক, নিয়ন্ত্রিত করুক ঐ-সব আবেগগুলি, এবং তা এমনভাবে করুক যাতে সমাজের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষিত হয় আর নিশ্চিত হয় তাদের ভবিষ্যতের আনন্দ" (ব্রহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন, IV)।

এই যৌথতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রামমোহনের ধর্মকে যুক্ত করেছিল মননগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক সংস্কারে সমৃদ্ধ এক নতুন বাংলা গড়ার জন্য তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে। রামমোহনের ধর্মের নিজস্ব পরিমণ্ডলটা যতই ছোট হোক না কেন, তা যে আমাদের দেশে এক আধুনিক যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রবন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের যে-সব ইংরিজি রচনা ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটা কালানুক্রমিক তালিকা নিচে দেওয়া হল:

১৮১৬—Abridgement of the Vedanta
১৮১৬—Translation of the Ishopanishad
১৮১৬—Translation of the Kena Upanishad
১৮১৭—A Defence of Hindu Theism
১৮১৭—A Second Defence of the Monotheistical System
১৮১৯—Translation of the Mundaka Upanishad
১৮১৯—Translation of the Kathopanishad
১৮২০—An Apology for the Pursuit of Final Beatitude
১৮২০—The Precepts of Jesus

১৮২১—The Brahmanical Magazine, Nos. I, II, III
১৮২৩—The Brahamanical Magazine, No. IV
১৮২৩—Humble Suggestions
১৮২৫—Different Modes of Worship
১৮২৭—Tract on the Divine Worship
১৮২৭—Answer of a Hindu
১৮২৮—Trust Deed of the Brahmo Samaj
১৮২৯—Religious Instructions
১৮৩২—Collected Translations

রামমোহন রায়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

১৮৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রে রামমোহন রায় যে তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছিলেন, তার কথা ইতিহাসের ছাত্রদের মোটেই অজানা নয়। বিভিন্ন গবেষক পরবর্তীকালে এগুলিকে ব্যবহারও করেছেন।* তবু তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যটা পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়, যদিও এটি গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। এর গুরুত্বটা দ্বিমুখী। প্রথমত, এটি নিজের বিষয়ে সুদক্ষ এক লেখকের দ্বারা লিখিত সংক্ষিপ্ত, প্রশংসনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য একটি সমকালীন নথি, এর প্রতিটা বাক্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় আশ্বাস-দানের সুর আর সুগভীর দূরদৃষ্টির ছোঁয়া। দ্বিতীয়ত, এই এজাহারটি থেকে রামমোহনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীরও একটা পরিচয় পাওয়া যায়—যে দৃষ্টিভঙ্গীটির প্রতি আমাদের কয়েকজন বিশিষ্টতম ঐতিহাসিকও খুব একটা সুবিচার করেননি।

আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল : (১) রামমোহন রায়ের প্রারম্ভিক মন্তব্য ; (২) ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত ৫৪টি প্রশ্ন সম্বন্ধে রামমোহনের উত্তর ; (৩) ঐ বিষয়েই তাঁর ২৭টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট তাঁর বক্তব্য (দুটিরই তারিখ ১৯ আগস্ট, ১৮৩১) ; (৪) ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত ৭৮টি প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর উত্তর (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১) ; (৫) ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আরও ১৩টি প্রশ্নের উত্তর (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১) ; (৬) কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণের ব্যাখ্যামূলক টীকা হিসেবে বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যবহারিক কার্যকলাপের বর্ণনা ; (৭) লবণের একচেটিয়া সংক্রান্ত ১২টি প্রশ্নের জবাব (১৯ মার্চ, ১৮৩২) ; এবং (৮) ভারতে ইউরোপিয়দের বসতি স্থাপন প্রসঙ্গে মন্তব্য (১৪ জুলাই, ১৮৩২)। পুরো বক্তব্যটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। উল্লিখিত বিষয়গুলোর গভীরতা বোঝাতে এর কোনরকম সারসংক্ষেপই পর্যাপ্ত হতে পারে না। আশা করা যায় পুরো বক্তব্যটা সহজলভ্য আকারে পুনর্মুদ্রিত হলে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছাত্ররা উপকৃত হবে।

রামমোহন নিজে ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু তাঁর সমগ্র বিবৃতিটি দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসায় সমুজ্জ্বল। "উভয় বন্দোবস্তেই" (চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারি) "কৃষকদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। প্রথম বন্দোবস্তটিতে তারা জমিদারদের অর্থলিপ্সা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি হয়, দ্বিতীয়টিতে জরিপকারী এবং রাজস্ববিভাগের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের

* দ্রষ্টব্য, রাজা রামমোহন রায়ের 'ইংরিজি রচনাবলী' (English Works), খণ্ড ৩, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্করণ, ১৯৪৭

শোষণ আর চক্রান্তের শিকার হয় তারা। এই উভয় বন্দোবস্তের অধীন কৃষকদের জন্য আমি গভীর সহানুভূতি বোধ করি।" তিনি দাবি করেন, কোন অজুহাতেই আবার জরিপ করা বা খাজনা বাড়ানো চলবে না, কেননা "নিজেদের প্রভাব ও নানারকম চক্রান্তের সাহায্যে" জমিদাররা কৃষকদের ওপর খাজনার পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছিল। তাঁর পরামর্শ ছিল—"খাজনা যেখানে খুব বেশি, সেখানে জমিদারদের কাছে কৃষকদের প্রদেয় খাজনার হার কমিয়ে দেওয়া হোক"। "আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কৃষকদের জন্য আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থাটা মোটেই আশানুরূপ নয়।" "কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের হার বা খাজনার পরিমাণের ব্যাপারে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড কার্যত নেই।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামমোহন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে কৃষকদের অবস্থার "এতটুকুও উন্নতি ঘটেনি," অথচ ভূস্বামীদের অবস্থার "বিপুল উন্নতি ঘটেছে", যেমন সরকারকে আর কোন বাঁধিত রাজস্ব দিতে হবে না জেনে তারা "পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনেছে এবং বাড়িয়ে দিয়েছে প্রজাদের খাজনার পরিমাণ।" আর সরকারকে তো "ঐ বন্দোবস্ত চালু করার জন্য কোন ত্যাগই স্বীকার করতে হয়নি।" পুরো চাপটাই পড়েছিল "চরম দারিদ্র্যে দীর্ণ" প্রজাদের ওপর। "আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন প্রচুর ফসল ফলে আর এই প্রাচুর্যের কারণে ফসলের দাম খুব কমে যায়, তখন জমিদারদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের সবটুকু ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় তারা।" "আক্রার বছরে নিজেদের জীবনধারণের জন্য ফসলের একটা অংশ হয়ত তারা রেখে দিতে পারে, কিন্তু যেটুকু পরিবারের সারা বছরের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।" "সকলেই জানেন যে··· ভূস্বামীরা ছাড়া এমন খুব কমজনই আছে (বা কেউই নেই) যারা সামান্যতম সম্পদ বা স্বাধীনতার অধিকারী, এমনকি জীবনের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও নেই এদের।" "দরিদ্রতর শ্রেণীর লোকদের শুধু নুন-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে···আমি হামেশাই দেখেছি।" তিনি আরও বলেছেন: "কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থাটা এইরকমই করুণ। এদের এই দুর্দশার কথা উল্লেখ করতেও আমি তীব্র বেদনা বোধ করি।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার উদারভাবে ছাড় দিয়েছিল ভূস্বামীদের। এ প্রসঙ্গে রামমোহন বলেন, "আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না কেন এই সুবিধাটা তাদের প্রজাদেরও দেওয়া হয়নি, কেন প্রত্যেক কৃষকের জন্য একটা নির্দিষ্ট খাজনা স্থির করে দিয়ে সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়নি ভূস্বামীদের·· কিংবা কৃষকদের এই শোচনীয় অবস্থার কথা জেনেও এখনও কেন সরকার সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের জন্য খাজনার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিচ্ছেন না···এবং ভবিষ্যতে কোনভাবে খাজনা বাড়ানোর চেষ্টাকে কেনই বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করছেন না।" এইটাই হচ্ছে বিষয়টার আসল জায়গা।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক পলিসিটা এখানে একেবারে নগ্ন হয়ে ধরা পড়েছে। পরের অনুচ্ছেদেই যুক্তিবাদী রামমোহন লিখছেন: "তবে, বিগত অন্তত চল্লিশ বছরের…চালু রেওয়াজ বন্ধ না করে এই বিপুল সংখ্যক প্রজার অবস্থা উন্নত করার ক্ষমতা সরকার এখন নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে কি না, সে ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু,আমার মতে, একটা অন্যায় নজির ও রেওয়াজ, তা সে যতদিনের পুরনোই হোক না কেন, তাকে ন্যায়ের মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়াটা কোন আলোকপ্রাপ্ত সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।"

বিভিন্ন জরুরী বিষয় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন রামমোহন: মজুরির স্বীকৃতি; জমিদার ও পুলিসের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা; রাজস্ব দিতে না-পারা তালুকগুলোর নিলামের ব্যাপারে নানারকম ষড়যন্ত্র; "রাজস্ব আদায়কারীদের হাতে কোনভাবেই শাসনকার্যের ক্ষমতা না দেওয়া" নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা; "কৃষির উন্নত পদ্ধতি" চালু করার জন্য ঔপনিবেশিকতার সপক্ষে উন্নাসিক ইউরোপিয়দের প্রচার; ১৮২৮-এর রেগুলেশন থ্রি-র বলে নিষ্কর জমি পুনর্গ্রহণ করে নেওয়ার দরুন "দেশবাসীর মধ্যে প্রবল আশঙ্কা ও অবিশ্বাস" দেখা দেওয়া; রাজস্ব বিভাগের খরচ কমানোর প্রয়োজনীয়তা; এবং ত্রাণের আশু ব্যবস্থা করার গুরুত্ব। "ভারতবর্ষের কৃষকদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আমি যাবতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

বিচারবিভাগের পরিচালন-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছিলেন, "ন্যায় বিচারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই যে পরিচালকবর্গ এবং তাঁদের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা।" "ইউরোপিয় বিচারকদের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা, অনুভূতি এবং চিন্তা ও কাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে অভ্যস্ত একটি জনগোষ্ঠীর মানুষদের বক্তব্য থেকে কোন দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারা মোটেই স্বাভাবিক নয়।" "আদালতের ভেতরে থেকে মামলার কার্যবিবরণী নথিবদ্ধ করার অধিকার সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের না থাকা"-র দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করে এদের উপস্থিতির পক্ষে দাঁড়ান রামমোহন। আরও বলেন, "আর এর ফলে জনমত কোনভাবেই মামলা-মকদ্দমার ওপর তত্ত্বাবধান চালানোর সুযোগ পাচ্ছে না।" কাজেই, "এদেশের মর্যাদাবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পক্ষে বিচারবিভাগের সাধারণ কার্যকলাপের ওপর আস্থাশীল না হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক।" "দুর্নীতি ঠেকানোর একমাত্র কার্যকরী উপায় হিসেবে জুরিদের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা দরকার", এবং এটা আরও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে "বহু প্রাচীন কাল থেকেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এদেশের মানুষের কাছে জুরিদের কর্মনীতিটা (কিছু কিছু পরিবর্তন সমেত) অনেক বেশি বোধ্য হয়ে উঠেছে।" এইসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেন, "সদর দেওয়ানি

আদালতের বিচারকদের হাতে হেবিয়াস কর্পাসের (বন্দীকে আদালতে হাজির করিয়ে তার বন্দিত্বের কারণ দেখান) আদেশপত্র জারি করার ক্ষমতাও থাকা উচিত।" অনেকটা বেন্থামের রীতি অনুযায়ী যুক্তি সাজিয়ে এগোতে এগোতে "ভারতবর্ষের জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি" এবং "দেওয়ানি দণ্ডবিধি" প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেছেন, যে দণ্ডবিধি রচনা করতে হবে স্বীকৃত নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে, যা হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং যা ব্যাখ্যা করার জন্য ধর্মীয় বইপত্রের সাহায্য নিতে হবে না।

বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে আমাদের চোখে পড়ে তরুণ সরকারি কর্মচারিদের ভারতে পাঠানোর বিরোধিতা করে রামমোহন বলছেন, এদের "এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলা হয় যেখানে এরা বাধ্য হয় প্রচুর ভুলভ্রান্তি করতে, ভুলে যায় অন্যান্য মানুষ ও অধীনস্থদের প্রতি নিজেদের কর্তব্য।" তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, যে-কোন আইন পাকাপাকিভাবে চালু করার আগে সে ব্যাপারে মতামত নেওয়ার জন্য আইনের খসড়াটি পেঁছে দেওয়া দরকার ভারতের দায়িত্বশীল মানুষদের হাতে, যাদের মধ্যে পড়ে "প্রধান প্রধান জমিদাররা," "সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা," মুফতি অর্থাৎ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতারা এবং "দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা।" সেই যুগের উদারনৈতিক উদ্দেশ্যটা স্পষ্টভাবে সুগ্রথিত হয়েছে রামমোহনের লেখায়: সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে "এদেশীয়রা যুক্ত হতে পারবে বর্তমান শাসনব্যবস্থার সঙ্গে, ফলে সুসংহত হয়ে উঠবে গোটা শাসনব্যবস্থাটাই, এবং তখন আর তা নিজের অধীনস্থ প্রজাদের মধ্যে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে স্রেফ **বলপ্রয়োগের জোরে** টিকে থাকবে না, তখন এটি পরিচালিত হবে এদেশের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও মর্যাদাবান শ্রেণীগুলির প্রভাবে এবং সাধারণ মানুষের সামগ্রিক শুভেচ্ছায়" (মোটা হরফ আমাদের)।

অতিরিক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব কিছুটা পাঁচমিশেলী ধরনের, কিন্তু সেগুলোও আপন দীপ্তিতে উজ্জ্বল। যেমন, ভারতীয়দের আহারে "কিছুটা পরিমাণ জান্তব খাদ্য (animal food) ব্যবহারের" প্রয়োজনীয়তা; "পৃথিবীর অন্য যে-কোন সুসভ্য জাতির মতো" ভারতীয়রাও যে "উন্নত হয়ে উঠতে সক্ষম"—তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা; ঈশ্বরহীন শিক্ষা বলে খ্রিশ্চানরা আপত্তি করা সত্ত্বেও কলকাতার হিন্দু কলেজে "অত্যন্ত সম্মানজনক ও মজবুত ভিত্তির ওপর" ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু করার প্রশংসা; এছাড়া তিনি স্বীকার করেন, বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার প্রতি "উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকেরা একেবারেই বিরূপ," কিন্তু স্বত্বভোগী শ্রেণীর ("ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা", "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন যারা নিজেদের জমিদারি শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করতে পারছে তারা", আর "ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভবিষ্যতে কী কী উন্নতি ঘটতে পারে তা উপলব্ধি করার মতো বুদ্ধিমত্তা যাদের আছে, তারা") মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই এর ঠিক

বিপরীত। রামমোহন বলছেন, ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষ "পূর্বতন অথবা বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন।"

ইংল্যান্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা তথ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে রামমোহনের ব্যাখ্যা-মূলক মন্তব্যগুলো বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, কেননা আজ পর্যন্ত এগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়নি। লবণের একচেটিয়ার ফলে মানুষের দুর্দশা এবং ভারতে ইউরোপিয়দের বসতি স্থাপনের মতো বিতর্কিত প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও সমান প্রণিধানযোগ্য।

এ-রকম ঋজু ভঙ্গীতে এবং এদেশের সমস্যা সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান নিয়ে উচ্চারিত পাঁচ প্রজন্ম আগেকার এক প্রতিভাবান পুরুষের বক্তব্য যে আমরা জানতে পারছি, তা আমাদের সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক।

ডেভিড হেয়ার

(১৭৭৫–১৮৪২)

জন্মসূত্রে স্কটিশ ডেভিড হেয়ার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা, চার দশকেরও বেশি (১৮০০-৪২) উৎসর্গ করেছিলেন বাংলার মানুষদের জন্য। উনিশ শতকে আমাদের পুনরুত্থান ও নবজাগরণের ভিত্তিস্বরূপ ছিল যে নতুন শিক্ষা, তার অন্যতম স্থপতি ছিলেন ডেভিড হেয়ার।

ডেভিড হেয়ারের জন্ম ১৭৭৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, খুব সম্ভবত লণ্ডনে। তাঁর বাবা ছিলেন লণ্ডনের একজন ঘড়ি নির্মাতা। ডেভিডের মা ছিলেন অ্যাবের্ডিন-এর মেয়ে। ভারতে আসার আগে মামার বাড়িতে প্রায়ই যেতেন তিনি। তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা কোনোদিন তাঁর মা-বাবার নাম জানতে পারেন নি—এ থেকেই বোঝা যায় কতটা স্বল্পভাষী ছিলেন ডেভিড হেয়ার।

তিন ভাই ছিল হেয়ারের। প্রথমজন জোসেফ, ব্যবসায়ী, থাকতেন ৪৮ বেডফোর্ড স্কোয়ার, লণ্ডনে। দ্বিতীয়জন আলেকজাণ্ডার (জেমস ?), ইনি ভারতে এসেছিলেন এবং জ্যানেট নামে একটি মেয়ে ছিল এঁর। আর তৃতীয়জনের নাম জন, ইনিও ভারতে এসেছিলেন, বাস করতেন লণ্ডনে জোসেফের সঙ্গেই। রোজালিণ্ড নামে একটি মেয়ে ছিল জনের।

রামমোহন রায় যখন ইংল্যাণ্ডে যান, তখন ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে তাঁর পরিবারের লোকেরা ডেভিডের বন্ধু রামমোহনের দেখাশোনা করেন। তাঁদের কাছে কিছুদিন থাকতেও হয়েছিল রামমোহনকে। স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভ্‌-এ রামমোহন শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লে ডেভিড হেয়ারের এক ভাইঝিই তাঁর দেখাশোনা করেন। ১৮৩৩ সালে ১৮ অক্টোবর রামমোহনের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন হেয়ার পরিবারের সকলেই।

ডেভিড নিজে ছিলেন আজীবন অকৃতদার।

তিনি মানবদরদী ছিলেন, মননশীল পণ্ডিত নন। অবশ্য তখনকার স্কটল্যাণ্ডের উন্নত মনন তাঁর ওপর কিছু ছাপ নিশ্চয়ই ফেলেছিল। তিনি "নিশ্চয়ই বেশ ভাল সাদাসিধে শিক্ষালাভ করেছিলেন", অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন। শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাপত্র পড়েছিলেন। নিজস্ব একটা লাইব্রেরিও ছিল তাঁর। কথা বলা ও লেখার চমৎকার ক্ষমতা ছিল হেয়ারের, কিছুটা হিন্দি আর "ভাঙা-ভাঙা" বাংলাও শিখেছিলেন।

কলকাতায় এসে (১৮০০) ঘড়ির ব্যবসা শুরু করেন হেয়ার। পরের বছর ল্যারকিন্‌স্‌ লেন থেকে উঠে যান "গির্জার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।" এর কাছের একটি রাস্তা আজও তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর সহকারী এবং সম্ভবত আত্মীয় গ্রে-র হাতে নিজের চালু ব্যবসাটা তুলে দেন হেয়ার (১ জানুয়ারি,

১৮২০)। এই গ্রে-র সঙ্গেই তিনি হেয়ার স্ট্রীটের বাড়িতে আমৃত্যু বসবাস করে গেছেন। লাভের টাকা দিয়ে বর্তমান কলেজ স্কোয়ারের আশপাশে কিছু জমি-জায়গা কিনেছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের বদান্যতার ফলে ক্রমশই জড়িয়ে পড়েন ধারদেনায়। কিছুটা জমি সস্তায় বিক্রি করে দেন সংস্কৃত কলেজকে, কিছুটা দান করেন হিন্দু কলেজের গৃহ নির্মাণের জন্য।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে—এ বিতর্কের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় 'ক্যালকাটা খ্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকার ১৮৩২-এর একটি সংখ্যায়। ঐ পত্রিকায় ডিরোজিও-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে—১৮১৫ সালে রামমোহনের বাড়িতে বসে, রামমোহনের প্রস্তাবিত ধর্মীয় সংগঠনের "সংশোধনী" হিসেবে মহানগরীতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা পেশ করেন ডেভিড হেয়ার। পরবর্তীকালে হেয়ার নিজেই বলেছেন : "এদেশের বেশ কিছু ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমার মনে হয়েছিল একমাত্র শিক্ষাই পারে হিন্দুদের সুখী করে তুলতে।" হেয়ারের পরিকল্পনাটাকেই "জনৈক ভারতীয়" পেশ করেছিলেন হাইড ইস্ট-এর কাছে এবং ১৮১৬-র ১৪ মে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সভা ডাকেন হাইড ইস্ট। তাঁর কাছাকাছি সময়ের অনেকেই, যেমন কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮৬২), রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৪, ১৮৭৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮৭৭), মনে করতেন হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হেয়ারই। ঐ কলেজের প্রথম নিয়মাবিধি রচনার কাজেও সাহায্য করেছিলেন তিনি।

১৮১৭ সালের ৪ জুলাই তারিখে গঠিত 'স্কুল বুক সোসাইটি'-র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ডেভিড হেয়ার। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল "ইংরিজি এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ধর্মীয় বই বাদে বিদ্যালয় পাঠ্য অন্যান্য বইপত্র সস্তায় বা বিনামূল্যে সরবরাহ করা।" এই সংগঠনে বছরে ১০০ টাকা চাঁদা দিতেন তিনি।

১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠিত 'স্কুল সোসাইটি'-র অনেকটা দায়ভারই বহন করতেন হেয়ার। এই সংগঠনের সচিবও হয়েছিলেন তিনি (১৮২৩-৪২)। ১৮২৮ সালে স্কুল সোসাইটির তহবিলে তিনি ৬ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এই সংগঠন চালু বিদ্যালয়গুলোকে সাহায্য করত আর নতুন নতুন অবৈতনিক বিদ্যালয় চালু করত, যেমন চালু করেছিল ঠনঠনিয়ায় (আরপুলি) ও চাঁপাতলায় (পটলডাঙা)। ১৮৩৪ সালে এই দুটি বিদ্যালয় মিলিত হয়ে গড়ে ওঠে হেয়ার স্কুল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিককে পটলডাঙার বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন হেয়ার, কিন্তু গোঁড়া ধার্মিকদের চাপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই দুই "অগ্নিবর্ষী" যুবককে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮১৯-২০ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর তাঁর বিদ্যালয়গুলি থেকে তিরিশ জন অবৈতনিক স্কলার ছাত্রকে পাঠানো হত হিন্দু কলেজে। এই ছাত্ররাই ছিল হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ "অলঙ্কার।"

সারা দিনই বিভিন্ন স্কুল আর কলেজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন হেয়ার। এইসব

স্কুল-কলেজের ভিজিটর (১৮১৯), ইন্সপেক্টর (১৮২৪) এবং কমিটি সদস্য (১৮২৫) হয়েছিলেন তিনি। ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, প্রধান দ্যান্‌সেল্‌ম্‌-এর (D'Anselme) হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন ডিরোজিওকে এবং ইয়ং বেঙ্গলের এই বিপজ্জনক শিক্ষকটিকে বরখাস্ত করার সময় (১৮৩১) এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পাশে।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল হেয়ারের। তিনি ছিলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর অভিভাবক এবং 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-র পৃষ্ঠপোষক (১৮৩৮)। ডিরোজিওপন্থীদের বিভিন্ন জনসভায় যোগ দিয়েছেন তিনি : সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে (১৫ জানুয়ারি, ১৮৩৫), জুরি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দাবিতে (৮ জুলাই, ১৮৩৫), চুক্তিমাফিক শ্রমের (indentured labour) বিরুদ্ধে (১০ জুলাই, ১৮৩৫), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতার দাবিতে। পটলডাঙার একটি বাড়িতে কিছু কুলিকে এনে রাখা হয়েছিল মরিশাসে পাঠানোর জন্য। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন হেয়ার। মফস্বলের আদালতগুলোতে ইংরিজি ব্যবহার করার আবেদনপত্রে (১৮৩৫) এবং আইনগত সংস্কারের দাবিতে প্রচারকার্যেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি।

হেয়ারের বন্ধুত্বের প্রতিদান দিয়েছিলেন ডিরোজিওপন্থীরাও। হেয়ারের ৫৬-তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁরাই (৫৬৫ জন যুবক) প্রথম তাঁকে প্রকাশ্য সংবর্ধনা জানান, চিত্রিত করেন তাঁর প্রতিকৃতি (যা এখন হেয়ার স্কুলে আছে), ১৮৪৭ সালে নির্মাণ করেন হেয়ারের প্রতিমূর্তি (যা এখন আছে প্রেসিডেন্সি কলেজে), গঠন করেন 'হেয়ার পুরস্কার তহবিল' এবং হেয়ারের মৃত্যুর পর টানা ২৫ বছর তাঁর মৃত্যুদিনে আয়োজন করেন স্মরণসভার। এছাড়া, ডেভিড হেয়ারের প্রামাণ্য জীবনীও লেখেন জনৈক ডিরোজিওপন্থীই।

নিজের বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন হেয়ার। হিন্দু কলেজ প্রাঙ্গণে বাংলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য (১৪ জুন, ১৮৩৯) তাঁকে ডাকা হয়েছিল। 'দেশীয় নারীদের শিক্ষার জন্য মহিলাসমিতি'কে (১৮২৪) সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি।

যুগান্তকারী ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫) অধ্যক্ষ বলেছিলেন : "মিস্টার হেয়ার চেষ্টা না করলে হিন্দু চিকিৎসক সমাজ গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টা কিছুতেই সফল হতে পারত না।" ১৮৩৭ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত হেয়ার ছিলেন ঐ কলেজের সচিব ও কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যত তিনিই ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি আর এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি, অর্থদান করেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্‌ সোসাইটিতে।

নিজের দানশীলতার জন্যে যে আর্থিক সম্পদ গড়েছিলেন তিনি, তা থেকে

মুক্তি পেয়েছিলেন অনেক পরে—(এক) হাজার টাকা বেতনে কোর্ট অফ রিকোয়েস্টস্-এর তৃতীয় কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি (১৮৪০)। ১৮৪২ সালের ১ জুন আকস্মিকভাবে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান হেয়ার। এক বৃষ্টিভেজা ঝোড়ো দিনে হেয়ার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে শুরু হয় তাঁর শেষযাত্রা। পিছনে হেঁটে চলে ৫ হাজার ভারতীয়। কলেজ স্কোয়ারে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে, যেটা তাঁর আপন জায়গা।

সরকারি নথিপত্রে যে আবেগ নিতান্তই দুর্লভ, সেই আবেগের সঙ্গে জেম্স্ কার তাঁর 'রিভিয়্যু'-তে উল্লেখ করেছেন: "শিক্ষকদের কাজকর্মে এবং ছাত্রদের অগ্রগতিতে গভীর ঔৎসুক্য ছিল তাঁর, অবাধে মিশতেন ছাত্রদের সঙ্গে…যোগ দিতেন তাদের আমোদপ্রমোদে…প্রয়োজন হলে…তাদের পরামর্শ দিতেন… সাহায্য করতেন আর এইসব কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রদের অতি প্রিয়জন, অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষক। ছাত্রদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাদের বাড়িতে যেতেন, তাদের জন্য ওষুধ নিয়ে আসতেন…এমনকি হিন্দু ঘরের মহিলারা পর্যন্ত নিজেদের রক্ষণশীলতার কথা ভুলে গিয়ে বাবা কিংবা ভাইয়ের মতো পরামর্শ নিত তাঁর কাছ থেকে।"

হেয়ারের নিজের ভাষায়: "নীতিগতভাবে আমি কখনোই নিজের দিকে অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করি না।" তিনি করেননি, কিন্তু অন্যেরা তাঁকে মনে রেখেছেন। রসিককৃষ্ণ তাঁর পালকিটাকে "চলন্ত ওষুধ-বিতরণ কেন্দ্র" নামে অভিহিত করেছিলেন। ভাবী ছাত্ররা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঐ পালকির পিছু পিছু ছুটত।

হেয়ারের আচার-অভ্যাস ছিল একান্তই সহজ-সরল। বাঙালী খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অনাড়ম্বর, সদালাপী এই মানুষটি যোগ দিতেন হিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে। হাঁটতে ভালবাসতেন। একবার এক রাত্রে ২৮ মাইল হেঁটেছিলেন।

যুক্তিবাদী মন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ডিরোজিওর দিকে। দুজনেই বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের সবথেকে বেশি করে দরকার "ইউরোপিয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার"। "সেকেলে গোঁড়ামির যে শেকল আজও এদেশের মানুষদের বেঁধে রেখেছে, তা ছুঁড়ে ফেলার জন্য" দুজনেই চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সততার ওপর জোর দিতেন। দুজনেই ছিলেন ছাত্রদের অতি প্রিয়। হেয়ারের ভাষায় ছাত্ররাই হচ্ছে "সংস্কারক এবং শিক্ষক"। এছাড়া ডিরোজিও ও হেয়ার দুজনেই ছিলেন "ঈশ্বরহীন" ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। "আধা-খৃশ্চান" ও যারা "আমার ছাত্রদের নষ্ট করে দেবে"—তাদেরকে নিজের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে আপত্তি ছিল হেয়ারের। এমনকি অনেকে তাঁকে "নাস্তিক" বলেও চিহ্নিত করেছে। গির্জাশাসিত খৃশ্চান ধর্মের প্রতি তাঁর "বদ্ধমূল বৈরিতা"-র কথা উল্লেখ করেছে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকা এবং তাঁকে কোন খৃশ্চান সমাধিক্ষেত্রে

সমাধিস্থ করা হয়নি।

'দ্য ইয়ং বেঙ্গল অ্যাড্রেস'-এ (১৮৩১) হেয়ার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "হিন্দু সমাজের মধ্যে এক নতুন জীবন সঞ্চারিত করেছেন তিনি, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরিণত হয়েছেন নির্বান্ধব মানুষদের বন্ধুতে এবং তাঁর ও আমাদের স্বদেশবাসীদের সামনে স্থাপন করেছেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" 'মেমোরিয়াল স্ট্যাচু'-তে (১৯৪৭) বলা হয় যে হেয়ার "পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করার পর স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ সানন্দে পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁর গৃহীত স্বদেশের (অর্থাৎ এদেশের) মঙ্গলের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য।"

১৮৩৫ সালে মেকলে বলেন: "ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা আজ আগ্রহী, তাঁদের মধ্যে মিস্টার হেয়ারই প্রথম কাজে নেমেছিলেন…এদেশের বাসিন্দাদের …ইংরিজি ভাষার চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য…কারণ এটাই ছিল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার সবথেকে উপযোগী পন্থা।"

হেয়ারের কাজের একটা স্থায়ী ফল হচ্ছে হিন্দু কলেজে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রচলন—যে কলেজকে প্রতিষ্ঠা করেছিল গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা, কিন্তু তা গড়ে উঠেছিল হেয়ারের হাতেই। ডিরোজিওপন্থী রাধানাথ শিকদার সঠিকভাবেই তাঁকে তুলনা করেছেন "শুকতারা"র সঙ্গে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

হিন্দু কলেজ ম্যানাস্ক্রিপ্ট রেকর্ড্স, ১৮৩১।

ক্যালকাটা খ্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার, মে-জুলাই, ১৮৩২।

প্যারীচাঁদ মিত্র: ডেভিড হেয়ার, ১৮৭৭।

শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী, ১৯০৩।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন: স্টাডিজ ইন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস, ১৯৫৮।

সুশীল গুপ্ত: ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, ১৯৫৯।

যোগেশচন্দ্র বাগল: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১৯৬৩।

রাধারমণ মিত্র: ডেভিড হেয়ার, ১৯৬৮।

ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত ইয়ং বেঙ্গলের (এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৭৭ সালে একে চিহ্নিত করেছিলেন 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে) চিন্তাধারার রেশ বজায় ছিল—শুরু হয়েছিল বিশের দশকের শেষদিকে আর স্তিমিত হয়ে এসেছিল মধ্য-চল্লিশ দশকের পর থেকে। এই চিন্তাধারার উদ্গাতা ছিলেন ডিরোজিও (১৮০৯-৩১), জ্ঞানী, প্রতিভাধর লেখক, র‍্যাডিক্যাল চিন্তাবিদ এবং নতুন শিক্ষার ধারায় এ-দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত শিক্ষক। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) নামটা যুক্ত করা একটু অসঙ্গতই হবে। ডিরোজিওর সঙ্গে নানা ব্যাপারেই পার্থক্য ছিল হেয়ারের। বস্তুতপক্ষে হেয়ার ঠিক পেশাদার শিক্ষক বা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, ছিলেন না জ্ঞানী বা প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতও। ডিরোজিওর মতো মেধা কিংবা খেয়ালীপনাও ছিল না হেয়ারের। খাদ্য ও আচার-অভ্যাসে হেয়ার প্রায় আধা-হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তবু এই দুজনের মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, যা ইয়ং বেঙ্গলের যথাযথ মূল্যায়নের মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

হেয়ার এবং ডিরোজিও দুজনেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতের পক্ষে সবথেকে প্রয়োজনীয় হচ্ছে "এদেশের মানুষের মধ্যে ইউরোপিয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।" দুজনেই ছিলেন চিন্তা ও আলাপ-আলোচনার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, দুজনেই নিজেদের অনুগামীদের মধ্যে সাহস ও সততা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন "যাতে করে তাঁদের দেশের লোকেদের মধ্যে তখনও চেপে বসে থাকা সেকেলে গোঁড়ামির শেকলটা ভেঙে ফেলা যায়।" তাঁদের চারপাশের মতো অন্যান্য নেতাদের না হয়ে তাঁরা দুজনেই ছিলেন "ঈশ্বরহীন" ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, ধর্মীয় রীতি বা নির্দেশে প্রায় বিশ্বাসহীন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও হেয়ার ও ডিরোজিও দুজনেই ছিলেন অবিচল আদর্শবাদী। ডিরোজিও এবং তাঁর মারাত্মক ছাত্রদের কাজকর্মের বিচারের সময় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হেয়ার, ঐ ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন: "তোমাদের দেশবাসীরা তোমাদেরকে তাদের সংস্কারক ও শিক্ষক বলে মনে করে"। আবার এই ডিরোজিওপন্থীরাই প্রথম প্রকাশ্যে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন হেয়ারকে, তাঁর স্মৃতিকে অমলিন রাখার প্রচেষ্টায় তারা ছিল একেবারে সামনের সারিতে—হেয়ারের মৃত্যুর পর টানা ২৫ বছর ধরে ১ জুন তারিখে তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন তাঁরা।

কলকাতার এক পর্তুগীজ-ভারতীয় মিশ্রণজাত ইউরেশীয় পরিবারের সন্তান হেনরি

লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮৩১ সালের 'হিন্দু কলেজ রেকর্ডস-এ মাঝে-মধ্যে লেখা হয়েছে ডি রোজিও, ম্যাক্সমুলার লিখেছেন ডি. রোজারিও)। তাঁর বাবা ছিলেন একটি ইংরেজ সওদাগরী সংস্থার অফিসার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ধর্মতলা এলাকায় স্কটিশ ড্রামন্ড পরিচালিত ইংরেজি শিক্ষার সুবিখ্যাত প্রাইভেট বিদ্যালয়টিতে পড়াশোনা করেছিলেন ডিরোজিও। ড্রামন্ড ছিলেন সুপণ্ডিত এবং কবি। স্বাধীন চিন্তায় প্রবল বিশ্বাসী এই মানুষটি দেশত্যাগী হয়ে এদেশে এসেছিলেন। ধরে নেওয়া যায় যে ড্রামন্ডের প্রভাবেই ডিরোজিওর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য ও দর্শনপ্রীতি, বার্ণসপ্রীতি, ফরাসি বিপ্লব ও ইংরেজ র‍্যাডিক্যাল মতবাদে বিশ্বাস।

বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বাবার অফিসে কিছুদিন কেরানির চাকরি করেন ডিরোজিও। তারপর কিছুদিন কাটিয়ে আসেন ভাগলপুরে তাঁর মাসি মিসেস উইলসনের বাড়িতে। এই ভাগলপুরে উন্মেষ ঘটে তাঁর লেখক সত্তার। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন, হাত দেন কবিতা রচনায় (স্থানীয় জন-শ্রুতির ভিত্তিতে 'ফকির অফ ঝাঙ্গীরা' এখানেই লেখেন)। কাশীপ্রসাদ ঘোষের আগেই তিনি দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেন (ফিরিঙ্গি সমাজের কারুর পক্ষে যা ছিল নিতান্তই অস্বাভাবিক):

স্বদেশ আমার! তোমার গৌরবময় অতীতে
এক বর্ণোজ্জ্বল দ্যুতি আবর্তিত হত তোমার ভ্রূলেখা ঘিরে,
তোমাকে উপাসনা করত এক দেবীর মতো—
কোথায় হারালো সেই গৌরব, সেই শ্রদ্ধা আজ?

অল্পবয়সেই কান্টের দর্শনের যে সমালোচনা করেছিলেন ডিরোজিও, তা "প্রতিভাবান দার্শনিকদের পক্ষেও ঈর্ষণীয়" ছিল। নীতিবোধ সংক্রান্ত দর্শন বিষয়ে একটি ফরাসি প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন তিনি। সেটি ছাপা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। নিজের খ্যাতির কারণে ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের উঁচু শ্রেণীগুলোর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন ডিরোজিও—তখনও তাঁর "কৈশোর" শেষ হয়নি (কিশোরীচাঁদ মিত্রর মতে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৮২৭ সালে, এডওয়ার্ডসের মতে ১৮২৮ সালে)। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি সম্পাদনা করেন 'হেসপেরাস' এবং 'ক্যালকাটা লিট্‌র‍্যারি গেজেট', কাজ করেন 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর সহকারি সম্পাদক হিসেবে এবং লেখালিখি করতে শুরু করেন 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন,' 'ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন,' 'বেঙ্গস অ্যানুয়াল,' 'ক্যালাইডোস্কোপ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়। একটি কবিতায় তিনি অভিনন্দন জানান নাভারিনোর যুদ্ধে গ্রীসের মুক্তিকে, আর-একটিতে স্বাগত জানান ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা নিবারণের আইনী পদক্ষেপকে।

ডিরোজিওর ব্যক্তিত্ব "হিন্দু কলেজের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নিজের চারপাশে 'চুম্বকের মতো' টেনে আনতেন এই তরুণ

শিক্ষকটি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দীর মধ্যে ছাত্রদের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে তাঁর আগে বা পরে আর কোন শিক্ষকই সক্ষম হন নি।" শুধু শ্রেণীকক্ষেই নয়, তার বাইরেও তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা ও সাহিত্যে "ছাত্রদের জ্ঞান বিস্তৃততর ও গভীরতর করে তোলা"-র চেষ্টা করতেন। এই নতুন চিন্তা-ভাবনা ছাত্রদের বন্ধনমুক্তি ঘটাত, উদ্বেলিত করত। কলেজের ছাত্ররা জড়ো হত ডিরোজিওর চারপাশে। এঁদের মধ্যে অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া আদর্শ বহন করে গেছেন। ডিরোজিওর শিক্ষাই ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ঐক্যসূত্র। তাঁর স্মৃতিই তাঁর ছাত্রদেরকে পরবর্তী জীবনেও পরস্পরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য ভালবাসা ও বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল। এইসব বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রদেরকে ডিরোজিও নিজে কী চোখে দেখতেন তা এই পঙক্তি-কটির মধ্যে ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে (যা আজও স্মরণ করে তাঁর কলেজ):

সতেজ ফুলদলের পাপড়ি মেলার মতো
তোমাদের মনের উন্মেষ লক্ষ করি আমি
আর দেখি ধীরে ধীরে খসে পড়ে তোমাদের
মননশক্তির যতকিছু বন্ধন।

আনন্দের জোয়ার ডাকে, যখন দেখি
ভবিষ্যতের দর্পণে তোমাদের
এখনও অনর্জিত খ্যাতির শিরোপা দোলে দোদুল—
তখন বুঝি, এ জীবনে ব্যর্থ নই আমি।

ছাত্রদের অবাধে বিতর্ক করতে ও যে-কোন রচনা বা রীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে উৎসাহ যোগাতেন ডিরোজিও। শেখাতেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, শেখাতেন "বেকন কর্তৃক উল্লিখিত কোন আইডলের (idol) দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হতে—সত্যের জন্য বাঁচতে, সত্যের জন্যই মরতে।" তাঁর ছাত্র রাধানাথ শিকদার ডিরোজিও সম্বন্ধে বলেছেন: "সত্যের সন্ধান ও কদভ্যাসের প্রতি ঘৃণার সেই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল একমাত্র তাঁরই অনুপ্রেরণায় আর এই মানসিকতা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনকই ছিল।" আর-একজন ছাত্র রামগোপাল ঘোষ ডিরোজিওর আদর্শকে সূত্রবদ্ধ করে বলেছিলেন: "যে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ চায় না, সে সংস্কারান্ধ; যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না, সে মূর্খ; আর যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না, সে দাস।"

কলকাতার ইণ্টালী এলাকায় ডিরোজিওর বাড়িতে অবাধ গতিবিধি ছিল তাঁর ছাত্রদের। এদের মধ্যে কয়েকজন নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়েও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে অল্প বয়সে বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেইসঙ্গেই ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করার মতো সাহস আর আন্তরিকতাও। তবে দুঃখের কথা হল, ইয়ং বেঙ্গলের অন্তত

কয়েকজন সদস্য নানারকম নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে আহত করতেন প্রতিবেশীদের অনুভূতিকে—পরবর্তীকালে নবীন ব্রাহ্ম বিদ্রোহীরা কখনোই যা করেন নি। হিন্দু সমাজকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা, যদিও গোটা ব্যাপারটাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি তাঁরা। কলেজ ম্যাগাজিনে মাধবচন্দ্র মল্লিক ঘোষণা করেছিলেন, "হিন্দু ধর্মকে আমরা ঘৃণা করি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।" কথাটা নিছকই অপরিপক্কতা প্রসূত অবজ্ঞার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ নিতে অস্বীকার করে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের "আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না" ঘোষণাটা ছিল সাহসী সততারই পরিচায়ক। অনেক ডিরোজিওপন্থীর মধ্যেই সুরাপানের আসক্তিটা ছিল তাদের দুর্বলতারই দ্যোতক। কিন্তু সেই সময়কার হিন্দু কলেজের অফিস-কর্মচারি হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটাও ভুলে যাওয়া যায় না—"ওরা প্রত্যেকেই ছিল সত্যের পূজারী। সত্যি বলতে কি, এই কলেজের ছাত্র আর সত্য, এ দুটো ছিল প্রায় সমার্থক।"

১৮২৮ সালে ডিরোজিও আর তাঁর ছাত্ররা গড়ে তোলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', আমাদের প্রথম বিতর্কসভা। এখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও ভবিতব্য, সদগুণ ও বদভ্যাস, দেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে-বিপক্ষে, মূর্তি-পুজো ও পুরোহিততন্ত্রের ক্ষতিকর দিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। প্রতি সপ্তাহে বসত দীর্ঘ অধিবেশনে। সভাপতিত্ব করতেন ডিরোজিও। তাঁর পরামর্শ মান্য করত সকলেই। সভার তরুণ বক্তাদের বিতর্কের দক্ষতা শহরের অনেক মান্যগণ্য লোককে আকৃষ্ট করেছিল। সাপ্তাহিক বিতর্কের উত্তেজক আসরে তাঁদের মধ্যে অনেকে হাজিরও থাকতেন। ১৮৩০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হিন্দুর কলেজের ছাত্ররা চালু করে 'পার্থেনন' পত্রিকা (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে 'এথেনিয়াম')। এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা, সুলভে ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, কুসংস্কারের সর্বনাশা প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। "জন্মসূত্রে হিন্দু কিন্তু শিক্ষাসূত্রে ইউরোপিয়" এই মুখপত্রটির দুটি সংখ্যা বেরোনোর পর কলেজের ভিজিটর এইচ. এইচ উইলসনের নির্দেশে প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়। ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর বিদ্যালয়ে অধিবিদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি ভাষণ দেন ডিরোজিও। এইসব ভাষণের শ্রোতা ছিল প্রায় চারশ তরুণ। এদের মধ্যে অনেকেই বেকন, লক, হিউম, স্মিথ, পেইন অথবা বেন্থামের নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতিতে র‍্যাডিক্যাল মনোভাবের একটা জোয়ার মাথা তুলছিল। ১৮৩০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়কালের অজস্র ঐতিহাসিক নজির উদ্ধৃত করে সেই সময়কার উপনিবেশ স্থাপন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র। ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর জুলাই বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপন

উপলক্ষ্যে টাউন হলে জমায়েত ২০০ জন মানুষ। ঐ বছরই বড়দিনে স্মৃতি-স্তম্ভের ওপর ফরাসি বিপ্লবের তেরঙা পতাকা উত্তোলন করা হয়। কারা এর উদ্যোক্তা ছিল, জানা যায় নি।

এইসব ঘটনায় সচকিত হয়ে উঠেছিল প্রাচীনপন্থীরা। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নানান গুজব : কোন জায়গায় মন্ত্র উচ্চারণ করার দরকার হলে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা নাকি ইলিয়াডের পঙক্তি আবৃত্তি করে; একজন ছাত্রকে মা কালীকে প্রণাম করতে বলা হলে সে নাকি বলেছে, "গুড মর্ণিং, ম্যাডাম।" বৃন্দাবন ঘোষাল নামে জনৈক গরীব ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সমাজের নেতাদের কাছে সরবরাহ করতেন এইসব গুজব, ডিরোজিও আর তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে হরেক রকম কুৎসার মশলা মিশিয়ে গুজবগুলোকে বেশ মুখরোচক করে তুলতেন। 'সংবাদ প্রভাকর' আর 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র মতো পত্রিকা সোরগোল তুলে বলতে শুরু করে— "দুর্বৃত্ত ফিরিঙ্গি"-দের নকল কবে চলেছে যে "নাস্তিক পশুরা", তাদের জন্য বিপন্ন হয়ে উঠছে আমাদের ধর্ম। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, যাতে "অত্যন্ত অশোভন ভাষায় আক্রমণ করা হয় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের চরিত্রকে।" এই চিঠির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয় কলেজ কমিটি। প্ররোচনাটা যে সবটাই ডিরোজিওপন্থীদের দিক থেকে আসে নি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সংবাদপত্রের প্রচার শুরু হওয়ার আগে থেকেই হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ১৮৩১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিরোজিও এবং প্রধান শিক্ষক দ্'্যাসেলম্-এর মধ্যে একটা বিবাদকে কোনমতে ধামাচাপা দিয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। একটা প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে ডিরোজিও প্রধান শিক্ষকের কাছে গেলে তিনি "ডিরোজিওকে আঘাত করার জন্য হাত তোলেন" এবং ডেভিড হেয়ার ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করলে তাঁকে অভিহিত করেন "ইতর মোসাহেব" বলে। অন্যান্য শিক্ষকদের বিক্ষোভে নাজেহাল হতে হয়েছিল প্রধান শিক্ষকটিকে। যথারীতি পারস্পরিক দুঃখপ্রকাশেই নিষ্পত্তি হয়েছিল ঘটনাটার। তবে এর কিছুদিনের মধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষ (প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে) "এদেশের ধর্মের মহান নীতিগুলির ওপর ছাত্রদের বিশ্বাস টলিয়ে দিতে পারেন; এমন সমস্ত আলোচনাকে যতটা সম্ভব প্রতিহত করা"-র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, "শোভনতা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণার বিরোধী কাজকর্মের" নিন্দা করে এবং "যে-সব সভায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে যোগদান" নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে, আর ডিরোজিওকে বরখাস্ত জন্য একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকার উদ্যোগ নেন কমিটি সদস্য রামকমল সেন। ১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত "হিন্দু কলেজের পরিচালকদের বিশেষ অধিবেশন"-এর কার্যবিবরণী সম্বলিত দলিলপত্রগুলো এখনও রক্ষিত আছে প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৫৫ সালে পুরনো হিন্দু কলেজেরই নাম হয়

প্রেসিডেন্সি কলেজ)। ঐ অধিবেশনে একটা স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা হয়। স্মারকলিপিটিতে বলা হয়েছিল, "সমস্ত অনিষ্টের মূল এবং মানুষের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার কারণস্বরূপ মিস্টার ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করতে হবে," "যে-সব ছাত্র প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের এবং এদেশের সনাতন প্রথাগুলির বিরোধিতা করছে···তাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করতে হবে," "কোন ছাত্র প্রকাশ্য বক্তৃতা শুনতে অথবা দেখতে গেলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে," "কী কী বই পড়তে হবে এবং প্রতিটা পড়ার জন্য বরাদ্দ থাকবে কতটা সময়, তা-ও স্থির করে দেওয়া দরকার।" ঐ স্মারকলিপিতে বলা হয়, ডিরোজিওর অশোভন আচরণের জন্যই বহু ছাত্র কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ১৮৩১-এর ৭ মে আর ১১ জুনের সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে—ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার পরও ছাত্রদের কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়া বন্ধ হয় নি।

ডিরোজিওকে "তরুণদের শিক্ষাদানের পক্ষে অযোগ্য" বলে ঘোষণা করার প্রস্তাবটা কমিটিতে ৬-৩ ভোটে খারিজ হয়ে যায়। তবে, "হিন্দুদের বর্তমান মানসিক অবস্থা"-র কথা ভেবে বরখাস্তও করা হয় তাঁকে। হিন্দুদের পক্ষ থেকে বলার সুযোগ না থাকায় ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার প্রশ্নে মতদানে বিরত থাকেন উইলসন ও ডেভিড হেয়ার। বরখাস্ত করাটাকে "একান্ত প্রয়োজনীয়" বলে মত প্রকাশ করেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গভর্ণর চন্দ্রকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্ত ব্যাপারটাকে "সুবিধাজনক" বলে উল্লেখ করেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন—ডিরোজিওকে বরখাস্ত করাটা একেবারেই "অপ্রয়োজনীয়।" ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবশ্য নেওয়া হয় নি।

উইলসনের পরামর্শে ২৫ এপ্রিল পদত্যাগপত্র পাঠান ডিরোজিও। ঐ পত্রে তিনি মন্তব্য করেন, "কোন কিছু যাচাই না করে, আমার কথা না শুনে, বিচারের প্রহসনটুকুও না করেই আপনারা বরখাস্ত করেছেন আমাকে।" তাঁর সম্বন্ধে যে-সব "বাজারী অভিযোগ" উঠেছিল, সেগুলোর ব্যাপারে উইলসনের জিজ্ঞাসার উত্তর দেন ডিরোজিও ২৬ এপ্রিল তারিখে। ছাত্রদের ঈশ্বর বিশ্বাস তিনি ভেঙে দিয়েছেন কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে ডিরোজিওর বক্তব্যটা বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাসে সঙ্গত কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে :

এই বিষয় নিয়ে কোন কথা বলাই যদি অন্যায় হয়, তাহলে আমি দোষী। কেননা এ বিষয়ে দার্শনিকদের সংশয়ের কথা আমি তাদের বলেছি, এটা স্বীকার করতে এতটুকুও ভীত বা লজ্জিত নই কারণ ঐ-সব সংশয়ের সমাধানের কথাও তাদের সামনে তুলে ধরেছি আমি। এই প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক করা কি কোথাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে ? যদি তা-ই হয় তাহলে প্রশ্নটির পক্ষে না বিপক্ষে কোন দিকেই যুক্তি দেওয়া উচিত নয়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে শুধু একটি

দিককে জানা এবং সেই দিকটির বিরোধী সবকিছু থেকে নিজেদের চোখ-কান সরিয়ে রাখা কি কোন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ?…
কিছুদিন তরুণদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলাম আমি। তাদেরকে ধূর্ত ও মূর্খ গোঁড়ামিবাদীতে পরিণত করাই কি আমার উচিত ছিল ?…তাই কলেজের বেশ কিছু ছাত্রকে হিউম্ লিখিত ক্লিন্থেস ও ফিলোর সুবিখ্যাত কথোপকথনের সারমর্মের সঙ্গে পরিচিত করে তোলাটাকে নিজের দায়িত্ব বলেই মনে করেছিলাম। ঐ কথোপকথনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সবথেকে সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত যুক্তি-গুলি উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই হিউমের বক্তব্যের যে তীক্ষ্ম উত্তর দিয়েছিলেন ডঃ রিড এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট, যে উত্তরগুলিকে আজ পর্যন্ত খণ্ডন করা যায় নি, তা-ও আমি পড়িয়েছি ছাত্রদের। এই হচ্ছে আমার অপরাধ…
আমাকে নাস্তিক কিংবা ধর্মে অবিশ্বাসী বলাটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কেন না ধর্ম নিয়ে যারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে ভাবতে চেয়েছে, তাদেরকে চিরদিন এইসব বিশেষণেই চিহ্নিত করা হয়েছে…

কলেজ ছাড়তে হয়েছিল ডিরোজিওকে, কিন্তু যুবকদের ওপর রয়েই গিয়েছিল তাঁর প্রভাব। কিছু বন্ধুর উচ্ছৃংখলতার অপরাধে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়্যারার' নামে একটা মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি-পন্থীরা ব্যবহারিক জীবনে কতভাবে লঙ্ঘন করে ধর্মকে, তা দেখানোর জন্য এই পত্রিকায় 'নির্যাতিত' (persecuted) রচনাটি লেখেন তিনি। রসিককৃষ্ণ মল্লিককে একবার তাঁর আত্মীয়রা ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দূরবর্তী কোন নিরাপদ জায়গায় পাঠানোর জন্য বেঁধে রাখে। সেখান থেকে পালিয়ে, বাবার বাড়ি ত্যাগ করে এসে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে আরেকটি মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন রসিককৃষ্ণ। হিন্দু কলেজ কমিটির ১৮৩১-এর ১১ জুন তারিখের কার্য-বিবরণীতে একটি আলোচ্য বিষয় ছিল—"একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা এবং তার সাহায্যে চাঁদা দেওয়ার জন্য রসিক কিষ্টো মল্লিকের পত্র।" মঞ্জুর হয়েছিল রসিককৃষ্ণের আবেদন।
এদিকে ডিরোজিও নিজেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একটা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন একই রকম আদর্শবাদী, আপোষহীন। নিজের পত্রিকায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে সোহার্দ্য গড়ে তোলার স্বপক্ষে প্রচার চালাতে শুরু করেন তিনি। সেই সঙ্গেই আক্রমণ করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দুর্গাপুজোকে, কারণ প্রসন্নকুমার নিজেকে একেশ্বরবাদী রামমোহনের অনুগামী বলে দাবি করতেন।
১৮৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলেরায় আক্রান্ত হন ডিরোজিও। ছুটে আসে

প্রিয় শিষ্যরা। এক সপ্তাহ ধরে চলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা। ২৬ ডিসেম্বর অনন্ত নিদ্রার গভীরে ডুবে যান আমাদের রেনেসাঁসের এই ঝড়ের পাখি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেও নানারকম বৈষয়িক কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। কারণ, ইউরোপের যে বিভিন্ন প্রবণতাগুলোর মধ্যে একইরকম বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল, সেগুলোর সঙ্গে তুলনীয় কোন আন্দোলনে কখনোই পরিণত হতে পারে নি। তাসত্ত্বেও ডিরোজিওর অকাল মৃত্যুর পরেও অন্তত বারটা বছর তাঁর প্রভাব নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

র‍্যাডিক্যাল মনোভাবের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছিল হামেশাই। শোনা যায়, ১৮৩২ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা টম্ পেইন্-এর 'এজ্ অফ রিজন্' কেনার জন্য বই পিছু ৮ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি ছিল এবং জনৈক প্রকাশক বই পিছু ৫ টাকা দরে ১০০ কপি বই বিক্রি করে। ১৮৩৬ সালে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় বলা হয়, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা "প্রত্যেকেই র‍্যাডিক্যাল, এরা বেন্থামের নীতির অনুগামী। 'টোরি' (tory) শব্দটাকেই তারা কলঙ্কজনক বলে মনে করে··· এরা সকলেই অ্যাডাম স্মিথের মতবাদে বিশ্বাসী।" ১৮৪৩ সালে "বিস্তর বাণিজ্যিক কাজে ব্যস্ত" জনৈক "বৃদ্ধ হিন্দু" ভারতীয়দের দুর্দশা সম্বন্ধে লিখিত একটি প্রবন্ধমালায় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

আরও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারও অভাব ছিল না ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে। ১৮৩৩ সালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক সমালোচনা করেন পুলিসের দুর্নীতির, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের অসহায় অবস্থার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেন এবং বণিক কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান দাবি করেন। ১৮৩৪-৩৫ সালে কোম্পানির সনদ সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন রসিককৃষ্ণ। ১৮৪২ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী এদেশে ফ্রান্সের ধাঁচে কারিগরী শিক্ষার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দেন। ১৮৪২ সালে যখন দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন এদেশে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে বক্তৃতা দিয়ে ফৌজদারি বালাখানার সভাগৃহ "কাঁপিয়ে তোলেন" রামগোপাল ঘোষ। এই বাগ্মিতার গুণে ১৮৪৭ সালে তিনি আখ্যাত হন 'ভারতের ডিমস্থিনিস' নামে। ১৮৪৯ সালের তথাকথিত "কালা আইন"-এর বিরুদ্ধে ইউরোপিয়রা হৈ-চৈ শুরু করলে ঐ আইনকে সমর্থন করে রামগোপাল 'রিমার্কস' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ আইনে ভারতবর্ষের ইউরোপিয়দের সাধারণ আইনের আওতায় না পড়ার রীতির উচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে "জুডিকেচার অ্যান্ড পুলিস" শীর্ষক একটি সুবিখ্যাত রচনায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তৎকালীন ব্যবস্থাটাকে "বলপ্রয়োগ ও দুর্নীতি"-র ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন এবং আমাদের সনাতন সমতা ধ্বংস

হওয়ার জন্য দায়ী করেন "উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উদ্ধত পুরোহিত"-দের। ১৮৪৬ সালে রায়তদের রক্ষা করার দাবি জানান প্যারীচাঁদ মিত্র। নিজের চিন্তাকে তত্ত্বের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সরকারের জন্ম দেয়, সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দেয় না" (ডিরোজিওর কাছে শেখা লক্-এর চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে) আর "দরিদ্র ও অসহায়দের পক্ষে সরকারের অবিরাম সাহায্য পাওয়া যতটা জরুরী, বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীদের পক্ষে ততটা জরুরী নয়।"

নিজেদের বক্তব্য প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে বেশ কয়েকটি পত্রিকা চালাতেন হিন্দু কলেজের এই ছাত্ররা। ডিরোজিওর জীবনের শেষ বছরে হিন্দুদের অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'এনকোয়্যারার' এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ করেন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। এই শেষোক্ত দ্বিভাষিক পত্রিকাটি চালু ছিল ১৮৪৪ সালে পর্যন্ত। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল "সরকার পরিচালনা ও ব্যবহার শাস্ত্রের বিজ্ঞান" সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া। ১৮৩৮ সাল নাগাদ 'হিন্দু পায়োনিয়ার' পত্রিকায় 'ভারতবর্ষ এবং বিদেশীরা' (India and Foreigners) শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সরকার পরিচালনায় বা দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজে এদেশের মানুষকে অংশ নিতে না দেওয়া আর অন্যায় "করের বিপুল বোঝা"-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এই নিবন্ধে। 'কুইল' (Quill) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। পত্রিকাটিতে সরকারি পলিসির সমালোচনা করা হত মুক্ত কণ্ঠে। ১৮৪২ সালে চালু 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর।' প্রতিযোগিতামূলক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা চালু করার জন্য প্রচার শুরু হয় এই পত্রিকায়। ১৮৪৩ সালে এই পত্রিকাতেই রাধানাথ শিকদার প্রকাশ করেন সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কুলিদের কাছ থেকে জোর করে কাজ আদায় করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করেছেন তিনি। বিধবা বিবাহকেও নীতিগত সমর্থন জানায় বেঙ্গল স্পেক্টেটর। ডিরোজিওপন্থীদের সভাসমিতি গড়ে তোলার কাজে কোন ভাটা পড়ে নি। পথিকৃৎ সংগঠন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' টিকে ছিল প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। ডিরোজিওর পর এর সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ডেভিড হেয়ার। সভা শেষ হওয়ার পর তিনি প্রায়শই সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় পায়চারি করতেন। এর পরে গড়ে ওঠে 'লিপি-লিখন সভা'। এই সংগঠনে ডিরোজিওপন্থীরা খাঁটি রেনেসাঁসীয় সাহিত্যের ধাঁচে মতামত বিনিময় করতেন পরস্পরের সঙ্গে। রামগোপাল ঘোষ ও রাধানাথ শিকদার নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনার কথা লিখে রেখে গেছেন দিনলিপির আকারে। রামগোপালের বাড়িটা পরিণত হয়েছিল বন্ধুদের জমায়েতের সদরদপ্তরে। ১৮৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, নেতৃত্বে থাকেন ডিরোজিওপন্থীরাই (সভাপতি তারাচাঁদ

চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ, সচিব প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী)। ঐ বছরের ১২ মার্চ থেকে কাজ শুরু হয় এই সভার। ডেভিড হেয়ারকে মনোনীত করা হয় সম্মানীয় পরিদর্শক হিসেবে। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৩-এর মধ্যে পঠিত রচনাপত্রের তিনটি খণ্ড প্রকাশ করে এই সভা। এর মধ্যে ছিল 'ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি এবং আইনগত ও সামাজিক সংস্কার (কৃষ্ণমোহন); 'নারীদের স্বার্থ" এবং 'হিন্দুস্থানের অবস্থা'—৫ ভাগে (প্যারীচাঁদ); 'বাঁকুড়ার চিত্র' (হরচন্দ্র ঘোষ); 'গন্তব্য প্রসঙ্গে', নতুন 'বানান পুস্তক' ও 'চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে—৪ ভাগে (গোবিন্দচন্দ্র বসাক)। ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী হিন্দু কলেজের সভাকক্ষে এই সভারই একটি অধিবেশনকে অধ্যক্ষ রিচার্ডসন রাজদ্রোহমূলক উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। এবং তখনই তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে থামিয়ে দিয়েছিলেন সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ঘটনাটা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এর আগে ১৮৩৯ সালেই চালু হয়েছিল একটা মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট। ১৮৪৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দু থিওফিলানথ্রপিক সোসাইটি' (সম্ভবত ডল্টনে-র চিন্তারই প্রতিফলন)। ডিরোজিওপন্থী সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক সংস্থা হলেও এগুলো রাজনীতির দিকেও আকৃষ্ট হয়েছিল। জর্জ টমসন বাঙালীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন "সুযোগসুবিধা পরিত্যাগ করা" এবং রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য, যা সংবাদপত্রের থেকেও ফলপ্রসূ। জর্জ টমসনের সভাগুলো উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের। ইয়ং বেঙ্গলকে সেই সময় তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নাম অনুসারে 'চক্রবর্তী গোষ্ঠী' বলেই সাধারণত চিহ্নিত করা হত। ১৮৪৩-এর ২০ এপ্রিল গঠিত হয় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। তার আগে "বিত্তের অভিজাতরা" যেমন সংগঠিত হয়েছিল ভূম্যধিকারী সভায়, তেমনি এই সংগঠনে সংগঠিত হয়েছিল "বুদ্ধিবৃত্তির অভিজাতরা।" পরবর্তীকালে এই সংগঠন মিশে যায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে (১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর যখন গঠিত হয় এই সংস্থা)। এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনই ছিল রাজনীতিমনস্ক শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রথম যুক্তফ্রন্ট। এই সময় ইয়ং বেঙ্গলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত একটি বিচিত্র ঘটনা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। অনেক পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বোম্বাইয়ের বন্ধুদের কাছ কাথিয়াওয়াড়ের জনৈক ডিরোজিওপন্থী সন্ন্যাসীর কথা শুনেছিলেন। এই সন্ন্যাসীটি সর্বদাই তাঁর মহান শিক্ষকের প্রশংসা করতেন এবং একবার খবরের কাগজে 'কাথিয়াওয়াড়ে অপশাসন' শীর্ষক কয়েকটি চিঠি লিখে সেখানকার রাজার অপশাসনের কথা প্রকাশ করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়, কিন্তু তীব্র আন্দোলনের ফলে সেখানকার রাজা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। শুধু তাই

নয়, তাঁর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতাও তুলে দেওয়া হয় এবং অধিকার দেওয়া হয় নিজের সহকারী বেছে নেওয়ার। কিন্তু সংস্কারমূলক কাজকর্মের পরে অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথা তোলে, নির্বাসিত হন সন্ন্যাসীটি। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ডিরোজিওপন্থীটির পরিচয় আমরা জানতে পারলাম না।

ইয়ং বেঙ্গলের প্রত্যেক সদস্যের জীবনী লিখতে বিস্তর জায়গা লেগে যাবে। তবে 'লাইফ অফ ডেভিড হেয়ার' বইটি থেকে মূল মণ্ডলীটির একটা তালিকা, জন্মমৃত্যুর সম্ভাব্য সাল সমেত, তুলে দেওয়া যেতে পারে: রসিক কৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮)—কলেজ জীবনে "অগ্নিবর্ষী" হিসেবে চিহ্নিত এই চারজন; হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৯), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) এবং প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)—প্রথম চারজনের থেকে একটু কম বিখ্যাত এই পাঁচজন; এছাড়া মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক ও অমৃতলাল মিত্র। এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে একটু বয়স্ক তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-৫৫) আর কিছুটা কনিষ্ঠ কিশোরীচাঁদ মিত্রর নাম। এঁরা প্রত্যেকেই উনিশ শতকের বাংলার সুপরিচিত নাম। এছাড়া, মাত্র তেইশ বছর বয়সেই ঝরে যাওয়া শিক্ষকটির জাদুকাঠির ছোঁয়া উজ্জীবিত করে তুলেছিল আরও অনেককেই।

জীবনের প্রথম থেকেই নিন্দিত হয়েছিলেন ডিরোজিওপন্থীরা। পরবর্তীকালে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভা স্বীকৃত হলেও সামগ্রিক ভাবে ইয়ং বেঙ্গলের প্রবণতাকে হেয় করে দেখানোটা প্রায় একটা রীতি হয়ে উঠেছে। ১৮৭৫ সালে রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "পাশ্চাত্যের আলো এদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।" ইয়ং বেঙ্গলের কাজকর্মকে অধিকাংশ জন এই চোখেই দেখেছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলাই যায় যে এক্ষেত্রে অধিকাংশের রায়টা বিকৃত রায়, যদি যে-কোন ঐতিহাসিক মূল্যায়নের মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন এসেই পড়ে।

সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, "শূকরের মাংস ও গোমাংসের মধ্যে দিয়ে পথ খোঁজা এবং সুরাপাত্রের মধ্যে দিয়ে উদারনীতিতে পৌঁছনোর চেষ্টা"—ডিরোজিওপন্থীদের এই কাজটাই সে আমলের মানুষেদের সবথেকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল চিরাচরিত প্রথার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার একটা উপায় মাত্র। বিকাশের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এ-রকম উপায় অবলম্বন করাটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। সনাতন সামাজিক রীতিগুলোর মধ্যে প্রায়শই যে ভণ্ডামি লুকিয়ে থাকে, তার থেকে এই ধরনের প্রথাবিরোধিতা অনেক বেশি কাম্য হয়ে উঠতেই পারে।

অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানার অভিযোগটাও বাড়াবাড়িরই নামান্তর। পাশ্চাত্যের

প্রাগ্রসর চিন্তার অপ্রত্যাশিত ভান্ডারের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচিত হওয়ার ঐতিহাসিক যুক্তিটা ছাড়াও আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার— পরবর্তীকালের বিস্তর 'অ্যাংলিসাইজড্' ভারতীয়ের মতো ডিরোজিওপন্থীরা নিজেদের দেশ কিংবা দেশবাসীর কথা ভুলে যাননি। স্বয়ং ডিরোজিও থেকে শুরু করে তাঁর ছাত্ররা পর্যন্ত সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি ১৮৩৭ সালের পর থেকে খ্রিশ্চান মিশনারি হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতেন ; তারাচাঁদ 'মনু'-র অনুবাদ করেন ; জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার একটা অংশ ছাপা হত বাংলাভাষায় ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাংলা গদ্যকে স্বাগত জানান রামগোপাল ; দুই অন্তরঙ্গ সুহৃদ প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ প্রকাশ করেন 'মাসিক পত্রিকা', সহজ-সরল কথ্য বাংলায় লিখিত এই পত্রিকাটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না সাধারণ গৃহবধূদের পক্ষেও সহজবোধ্য ছিল ; এছাড়া, কথ্য ও সাধু, উভয় শৈলীর ক্ষেত্রেই আমাদের সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখকে পরিণত হয়েছিলেন প্যারীচাঁদ (টেকচাঁদ ঠাকুর)।

ধর্মহীনতার অভিযোগটাও পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে ডিরোজিওপন্থীদের লক্ষ্য ছিল "হিন্দু ধর্মকে নিজেদের যুক্তির ওপর দাঁড় করানো।" ১৮৩২ সালেই মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমোহন খ্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। শিবচন্দ্র পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতির পদে এবং রামতনু লাহিড়ীও প্রায় এই বিশ্বাসেই উপনীত হয়েছিলেন। প্রথম দিকের ব্রাহ্ম মতবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিওপন্থীদের সমালোচনা মোটেই অযৌক্তিক ছিল না। কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম পরিণত হয়েছে "আধা-ধর্ম আধা-রাজনীতি"-তে ; রামগোপাল অভিযোগ করেছিলেন, ব্রাহ্মদের ধর্মান্তরবিরোধী প্রচারের মধ্যে ভণ্ডামি আছে ; তীক্ষ্ম মন্তব্য করেছিলেন রামতনু, "বেদান্তের অনুগামীরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন···আমি জানি মূর্তিপুজো বন্ধ হওয়া একান্ত দরকার, কিন্তু কোন ক্ষতিকর উপায়ে তা বন্ধ করার বিরোধী আমি···আমাদের সমাজ খ্রিশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বৈরিতার জন্ম দিয়েছে, কিন্তু এই বৈরিতা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়···সমস্ত ধর্মের উপাসকরা তাঁদের ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে যুক্তিবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন।" ডিরোজিওপন্থীদের ব্যক্তিগত সততার কথাও ভুলে যাওয়া যায় না—সরকারি কর্মচারি হিসেবে হরচন্দ্র ও রসিককৃষ্ণের আশ্চর্য সততা, প্রতিবেশীদের সেবায় উৎসর্গীকৃত শিবচন্দ্রের জীবন, সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়ার হুমকির সামনেও রামগোপালের নিজের বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে স্বীকার না করা, পারিবারিক বিরোধিতা সত্ত্বেও নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ না করার ব্যাপারে রাধানাথের অবিচল সিদ্ধান্ত, ঋষিপ্রতিম রামতনুর আনুষ্ঠানিকভাবে উপবীত পরিত্যাগের সাহসী পদক্ষেপ (১৮৫১ সালে)।

ইয়ং বেঙ্গলের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা শুধু তার একারই সীমাবদ্ধতা নয়, বরং আমাদের সমগ্র রেনেসাঁসেরই সীমাবদ্ধতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণমূলক চরিত্রটা বুঝে উঠতে পারেনি। মূলত নিজেদের আশু লাভের চিন্তাতেই মশগুল ছিল তারা। একটা আলাদা জগতের অধিবাসী এদেশের মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের "নবজাগরণ"-এর নেতাদের প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না অথবা তাদের অবস্থা সম্বন্ধে তেমন কোন ধারণাও ছিল না এই নেতাদের। হিন্দু ঐতিহ্য ও জীবনধারার প্রভাবে এঁরা আচ্ছন্ন থাকার ফলে দূরে সরে গিয়েছিল এদেশের মুসলমানরা। আমাদের রেনেসাঁসের এই দিকগুলো ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ইয়ং বেঙ্গল প্রবণতায় আসল ব্যর্থতা ছিল—যা হয়ত অনিবার্যই ছিল সেই পরিস্থিতিতে—লাগাতার আন্দোলন এবং উন্নয়নশীল ভাবাদর্শ গড়ে তোলার অক্ষমতা। এই প্রবণতার সবথেকে ইতিবাচক দিক হচ্ছে নির্ভীক যুক্তিবাদ এবং পাশ্চাত্য থেকে আগত নতুন চিন্তাভাবনার আন্তরিক উপলব্ধি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী অর্ধের ঐতিহ্যপ্রিয়তা, অতীন্দ্রিয়বাদ, ধার্মিকতা আর ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের স্রোতে এর অনেক কিছুই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তনটা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে লাভজনক হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হয়ত কিশোরীচাঁদ মিত্রের ১৮৬১ সালের চ্যালেঞ্জটিকে অন্তত সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখতে চাইব। কিশোরীচাঁদ ঘোষণা করেছিলেন: "হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তপ্রাণচঞ্চল সংস্কার করাই কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মতো প্রথম ভোরের আলো দেখতে এবং তাকে বুঝতে পেরেছিল··· প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কে আর কবে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে?···আমাদের বন্ধুদের বহিষ্কৃত হতে হয়েছে সমাজ থেকে, ভোগ করতে হয়েছে তার আনুষঙ্গিক ফলগুলিও·· মূর্তিপুজোর আচার-অনুষ্ঠান মেনে নেওয়াটা নীতি বিসর্জন দেওয়ারই পরিচায়ক। এগুলির দাসত্ব অস্বীকার করাটা হচ্ছে নিজেদের বিবেকের কাছে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।"

[স্থান সংকুলানের কারণে প্রামাণ্য রচনাপত্রের নাম এই লেখার মধ্যে বারবার উল্লেখ করা যায়নি। এগুলি হল: ১৮৩১ সালের 'হিন্দু কলেজ রেকর্ডস'; হিন্দু কলেজের ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮৬২) ও রাজনারায়ণ বসুর (১৮৭৬) রচনা থেকে—শেষোক্ত জনের রচনার চমৎকার সটীক সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন দেবীপদ ভট্টাচার্য; এডওয়ার্ডস, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক লিখিত ডিরোজিও ডেভিড হেয়ার ও রামতনু লাহিড়ীর প্রামাণ্য জীবনী; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং ডাঃ বি. বি. মজুমদারের 'হিস্ট্রি অফ পলিটিক্যাল থট ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ' গ্রন্থে তৎকালীন পত্রপত্রিকা সংক্রান্ত মূল্যবান আলোচনা। কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ' এবং বর্তমান লেখকের 'নোটস্ অন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস' থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ১৯৬৬ সালে পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় ডিরোজিও সম্পর্কে ম্যাজের (Madge) লিখিত পুস্তিকাটি এখন সহজলভ্য হয়ে গেছে। সত্য বলে স্বীকৃত কয়েকটি তথ্যের ভুল সংশোধন করা হয়েছে পুস্তকাটিতে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নব-জাগরণ

শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভার আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর স্বদেশ ও স্বকালের বিশাল পটভূমিকার কথা স্বতঃই মনে আসে। মানুষের কীর্তি মহীরুহের মতো আকাশে-আলোতে-বাতাসে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়ালেও মাটির সঙ্গে তার নিবিড় যোগটুকু হারাতে পারে না। সেই মাটির বন্ধন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হল উনিশ শতকের বাংলাদেশে নব-জাগরণের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র।

উৎসবের দিনে চিন্তাশীল বাঙালী তাই রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারবে না, করলে তার স্মৃতি হবে অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে পূর্বসূরীদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক তো বটেই, এটা আমাদের বিশেষ কর্তব্যও। আজ দেশে রবীন্দ্রনাথের যে-বন্দনা উঠছে সেখানে তিনি একক স্বমহিমায় দীপ্যমান; সেখানকার দৃষ্টির সামনে পশ্চাৎপট কিছু নেই। বাংলার বাইরে বাংলার নব-জাগরণ আজও অনাদৃত, অজ্ঞাত। বিশ্বকবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজস্ব দেশ-কাল সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ও সচেতন ছিলেন, পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনে তাঁর আগ্রহের অন্ত দেখি না, স্বজাতির সমসাময়িক ভাবনা-বেদনা কোনো দিন তাঁকে স্পর্শ না করে পারেনি।

বাংলার নব-জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে দুই দিক থেকে দেখা চলে। উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের তিনি শীর্ষমণি, তাঁরই মধ্যে সেই প্রেরণার সকল অঙ্গ যেন তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছিল, তার সকল সম্পদকে তিনি গৌরবমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের রেনেসাঁসের পরিপূর্তি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে। আবার একথাও সত্য যে সে-যুগের সকল চিন্তা, পরস্পরবিরোধী ভাবধারা, সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর মন কখনও জগৎ থেকে বিমুখ হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনায় ডুবে যেতে পারেনি—

"নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।"

রবীন্দ্র-মানসে নব-জাগরণের চিন্তাপ্রবাহের এই নির্নিমেষ অবিরাম প্রতিধ্বনি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আর, আমাদের রেনেসাঁসে দিকে দিকে যে সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথ এনে দিয়েছিলেন, উৎসবের মধ্যে সে-বিচার তো আজ অফুরন্ত।

বাংলার নব-জাগরণকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশানের কথা, গত পনেরো কুড়ি বছরে এর বহুল প্রচলন হয়েছে। নামকরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে ইওরোপে পনেরো-ষোলো শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনার একটা ইঙ্গিত।

দুয়ের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য বিস্তর। প্রথমত, আদি রেনেসাঁসে বুদ্ধির মুক্তি এসেছিল যুগান্তকারী বহুমুখী জাগরণের অঙ্গ হিসাবে, সেই জাগরণের মধ্যে দেখা গেল অকূল সমুদ্র উত্তরণ, ধর্মজগতে আমূল বিপ্লব, নব বিজ্ঞানের বিশ্ব-পরিচয়, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গঠন, পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন, বাণিজ্য-কৃষি-শিল্পে পুনর্বিন্যাস। এই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি এ রেনেসাঁসে সম্ভব ছিল না। এদেশে ব্রিটিশশাসন পুরাতন ব্যবস্থা চুরমার করার আয়োজন করে থাকলেও নূতন সমাজ গড়ে তোলার ইচ্ছা বা দায়িত্ব রইল তার আওতার বাইরে; অবসাদগ্রস্ত নির্জীব দেশবাসীর পক্ষেও অতখানি উদ্যম হাতের নাগালে আসে নি। দ্বিতীয় পার্থক্য দেখা যাবে রাষ্ট্রিক পরিবেষ্টনে। পশ্চিমী রেনেসাঁসের লীলাভূমি পশ্চিম ইওরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলিতে, এমনকি ইটালিও পরাধীন হয়ে পড়ে আন্দোলনের অবসানের যুগেই, প্রারম্ভে নয়। আমাদের জাগরণ এল বিদেশীর পদাশ্রয়ে, অর্ধকলোনিত্বের পত্রপুটে; তার ভিতর স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ কোথায়। বিজয়ীর প্রভুত্ব জাগরণের পথে আনুকূল্যের চাইতে বিঘ্নের সহায়ক হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তৃতীয় প্রভেদটাও নিশ্চয় সুদূরপ্রসারী। ইওরোপীয় রেনেসাঁসে প্রাণসঞ্চার করে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুত্থান; গ্রীক চিন্তা, গ্রীক আদর্শ, গ্রীক দৃষ্টি গড়ল নূতন হিউম্যানিস্ট মণ্ডলীগুলিকে; আধুনিক মনকে তৃপ্তি দেবার মতো সঙ্গতির অভাব ছিল না ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই অতীত চিন্তাধারার মধ্যে। আমাদের দেশে অতীত সভ্যতা-সম্পদ নূতন যুগের এতটা উপযোগী কিনা এ প্রশ্ন না তুললেও বাংলার রেনেসাঁসে উন্মেষক প্রেরণা এসেছিল সেকালের ভারত থেকে নয়, একালের নবজাগ্রত পশ্চিম থেকে। সেই পশ্চিমের বাহুবলেই আবার দেশ তখন মুহ্যমান, ভূলুণ্ঠিত।

স্পষ্টতই দেখা যায়, ইওরোপের তুলনায় বাংলার রেনেসাঁস ঘটনাচক্রে বাধ্য হল খণ্ডিত, আড়ষ্ট, কিছুটা অস্বাভাবিক রূপ নিতে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের নব-জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্য যৎকিঞ্চিৎ। একালের সমালোচকের চোখে ইওরোপের রেনেসাঁসও কিছু নিখুঁত নয়, তার উৎকর্ষও নিশ্চয় ছিল সীমিত। অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি, গ্রীক চৌহদ্দির বাইরে সকল গভীর চিন্তার প্রতি অবজ্ঞা, সংস্কৃতিবান ও সাধারণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদরেখা প্রভৃতি দুর্বল-তারই পরিচায়ক। তাছাড়া, কোনো সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় পূর্ববর্তী যুগের পশ্চাদভূমিতে, তারই তুলনায়। আঠারো শতকের বাংলার মানস-জগৎ ও সমাজ-জীবনের মান এমন কিছু ছিল না যে আমাদের রেনেসাঁসকে

উন্নাসিক কায়দায় অশ্রদ্ধা করা চলে। বাংলার নব-জাগরণের অতিরঞ্জিত ছবি আঁকা অথবা তাকে তাচ্ছিল্য-জ্ঞানে অস্বীকার করা, এই দুই-ই হল ঐতিহাসিক বাস্তব বিচার থেকে বিচ্যুতি। যুগবিশেষের কীর্তি যেমন অসীম নয়, তার আপেক্ষিক মূল্যটাও তেমনি মূল্যই বটে।

৩

বাংলার রেনেসাঁসকে সচরাচর দেখা হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি হিসাবে, চিন্তা ও উদ্যমের কাহিনী হিসাবে, সর্বাঙ্গীণ জাগরণের নিদর্শন হিসাবে, দেশের নবজন্মের প্রতীক হিসাবে। প্রবাহের নানা ধারকের কৃতিত্ব এর মধ্যে পাশাপাশি স্থান পায়, নানা চিন্তা চিহ্নিত হয় পরস্পরের পরিপূরক রূপে। বহু ঢেউ-এর সমষ্টি একটা স্রোত চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সকল বৈচিত্র্য সেখানে একধর্মী, জাতীয়-জাগরণধর্মী। ফুলের মালার প্রতিটি ফুল আমাদের আদরের ধন, গৌরবের সামগ্রী।

এটা এক ধরনের দেখা বইকি। এতে আমাদের চোখ থাকে সামগ্রিক প্রকাশের দিকে, জাগ্রত শক্তির পরিচয়ের দিকে, মোট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাটার দিকে। একই যুগে কত লোক কত কথায় মুখর হয়ে উঠেছে, কত ধরনের কর্মের পত্তন করেছে, সকলের মিলনে চিত্তজগতে নব-জাগরণ পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে পেরেছে।

এই ছবি নিশ্চয় একটা ঐতিহাসিক বিচার, কিন্তু বাহ্যিক বিচার মাত্র। চিন্তার জাগরণে একই পর্যায়ে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধারার প্রকাশটাও কিন্তু স্বাভাবিক, তাদের মধ্যে বিরোধ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। কাজেই সমসাময়িক সংশিলষ্ট লোকের কাছে এদের মধ্যে মূল্যবিচার করে একটা বাছাই অনিবার্য। তাই বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত হয়ে যুগ-মানসের মধ্যে অন্তরঙ্গ প্রবেশের চেষ্টা করলে চোখে পড়বে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত, বাস্তব জীবনের সংঘাত। জীবনের ধরনই হল এই। কোন্‌টা ঠিক পথ এই নিয়ে পদে পদে তর্ক ওঠে, বিশ্বাসের ভেদাভেদ ও প্রচেষ্টার পরস্পর-বিরোধিতা প্রতি মুহূর্তে লোককে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা কিছু সমর্থন করে, অন্য কিছু হয় তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত।

পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিককেও এই মূল্যবিচার রেহাই দেয় না। তাঁকে দেখতে হয় আলোচ্য কালের কোন্‌ ধারা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছে, কোন্‌ দৃষ্টি-ভঙ্গী হয়ে পড়েছে অচল। দূর থেকে গোটা ফুলের মালার সৌন্দর্যটা কিছু মিথ্যা নয়, কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এড়ানো যায় না। স্রোতের এক প্রবাহের বদলে চোখে আসে বিপরীতধর্মী আবর্ত।

৪

আমাদের নব-জাগরণে অন্তর্বিরোধ বিশ্লেষণ করতে গেলে যে-দুটি প্রধান ধারা

চোখে পড়ে, যাদের সুরের ঝংকার স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তাদের নাম দেওয়া যাক পশ্চিমী দৃষ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান। ইংরেজীতে বলা যেতে পারে Westernism ও Orientalism।

এর অনুরূপ অবস্থা আমরা দেখি উনিশ শতকে রুশদেশের ইতিহাসে। সেখানে পশ্চিমপন্থী ওয়েস্টার্নাররা চেয়েছিলেন পশ্চিম ইওরোপের চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে তার উপর ভবিষ্যৎ রুশ সমাজের প্রতিষ্ঠা। আর ঐতিহ্যভক্ত স্লাভোফিলেরা অর্থাৎ স্লাভজাতির ভক্তবৃন্দ প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে কিছুটা সংস্কৃত করে নিয়ে তার ভিতরেই সন্ধান করেছিলেন আগামী দিনের উপযুক্ত ভিত্তি। মাসারিক প্রভৃতির লেখায় এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবরণ অনেকের কাছেই অপরিচিত নয়।

বিরোধী দুই ধারা নির্দেশ করার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাংলার জাগরণের প্রতিভূদের পরিষ্কার দুই দলে ভাগ করে ফেলা হচ্ছে। সুস্পষ্ট দুই দল নির্ণয় হয়তো-বা উনিশ শতাব্দীর রুশদেশে সম্ভব ছিল; বাংলার রেনেসাঁসে স্পষ্ট দুটি গোষ্ঠীর সন্ধান অনেকটা পণ্ডশ্রম হবে। এখানে দেখি একই লোকের চিন্তায় দুটি ঝোঁকেরই পরিচয় রয়েছে, বিভিন্ন পর্বে, এমনকি মাঝে মাঝে একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার সূচনায় যাঁরা কোৎ-মিলের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন তাঁরাই আবার পরবর্তীকালে প্রাচীন আদর্শের আশ্রয় খুঁজলেন—

"তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।"

নব-জাগরণে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সুরই যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সাড়া তুলেছিল একথাও অবিদিত নয়। সুতরাং পশ্চিমী দৃষ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান বলতে আমরা বুঝব দুটি অমূর্ত বা অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ ধারণা, দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নয়। অমূর্ত ধারণা রূপ গ্রহণ করে বিশ্লেষকের চোখে ঝোঁক বা ট্রেন্ড্ হিসাবে। বাস্তব জীবনে এর প্রকাশ সরল নয়, বহুধা বিচিত্র।

অথচ পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের আদর্শগত পার্থক্যটা অগ্রাহ্য করা চলে না। উভয় ধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করলে কথাটা পরিষ্কার হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শের প্রকাশ ব্যক্তিবিশেষের মনে সমান প্রবল বা সম্পূর্ণ না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাংলার নবযুগে পশ্চিমী ধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় সমাজ-সংস্কার পরিকল্পনায়। প্রচলিত সমাজ-বিধির মধ্যে অন্যায়, অবিচার, অন্ধ সংস্কারের দিকে চোখ পড়তে থাকে; সতীদাহ, আমরণ বৈধব্য, বহুবিবাহ, নারীর অবনত অবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা তোলে; সমাজের পুনর্গঠন ঈপ্সিত হয়

এমন পথে যাকে আধুনিক পশ্চিমী পথের অনুবর্তন হিসাবে দেখাটা অন্যায় নয়। আমরা যে মনোভাবকে প্রাচ্যাভিমানী বলছি সেটা সব সময় সামাজিক কুপ্রথার সমর্থক অথবা এ বিষয়ে উদাসীন তা নয়। তবে তার প্রভাবে মনে হত ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী নয়, সংস্কার ধীরে ধীরে আপনা থেকে আসবে, উত্তেজিত বা বিচলিত হওয়াটা বিসদৃশ, হয়তো-বা প্রাচীন প্রথার সপক্ষেও কিছু বলার আছে। বিশেষত আইন দিয়ে সমাজ-সংস্কার বরদাস্ত করা প্রাচ্যাভিমানের কাছে সম্ভব ছিল না। প্রধান যুক্তি, আইনকর্তা তো বিদেশী শাসক। অবশ্য, সেই বিদেশী শক্তিরই নির্দিষ্ট আইন-কানুন জীবন-যাত্রার অপরাপর ক্ষেত্রে মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি দেখি না।

সমাজ-সংস্কার থেকে এগিয়ে গিয়ে পেঁছিনো যায় যুক্তিবাদে। সংস্কারের সপক্ষে শাস্ত্রোক্তি প্রয়োগ করা হত—যেমন দেখি রামমোহন বা বিদ্যাসাগরে; কিন্তু প্রধান প্রেরণা নিশ্চয় এসেছিল যুক্তি থেকে, তারপর খোঁজা হত শাস্ত্রের সমর্থন। প্রাচীন আচার, ব্যবস্থা, ধারণা, বিশ্বাসকে যুক্তির আলোতে টেনে আনার প্রবণতা স্পষ্টই চোখে পড়ে; যুক্তিবিচারটাও মূলত পশ্চিমী শিক্ষার প্রয়োগ। সেই শিক্ষা থেকে উৎসারিত যুক্তিবাদ যে তরুণ মনকে কতখানি অভিভূত করেছিল তার নিদর্শন পাই 'ইয়ং বেঙ্গলে'।

কিন্তু যুক্তিবাদ আসলে বুদ্ধির নির্বিশেষ বিচার নয়, নিরাসক্ত সত্যের সন্ধান নয়। ইতিহাসে যুক্তিবাদ চিরদিনই আশ্রয় করেছে নূতন কোনো মূল্যবোধকে, প্রচলিত ঐতিহ্যের বিপক্ষে নূতন আদর্শের অভিযানকে। বাংলাদেশে পশ্চিমী দৃষ্টির যুক্তিবাদ গড়ে উঠল পশ্চিমের মানবতাবাদকে অবলম্বন করে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বানে। "কালান্তর" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছিলেন বার্নসের অমর উক্তি; A man's a man for a' that; বলা বাহুল্য, বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকটাই এর মধ্যে প্রকাশ খুঁজেছিল। বাংলার পশ্চিমী দৃষ্টি অনুভব করল যে আধ্যাত্মিক মুক্তি আমাদের যতই কাম্য হোক না কেন, প্রাচীন প্রাচ্য-সমাজে মানুষকে নির্বিশেষ মানুষের মর্যাদা দেওয়ার আগ্রহ নেই।

সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ উনিশ শতকে ইওরোপ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছিল বলেই এ সব কিছু সমর্থনের ঝোঁকটাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার সার্থকতা আছে। এই স্রোতের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল আমাদের রেনেসাঁসের অপর ধারা—অর্থাৎ প্রাচ্যাভিমান।

এর প্রথম আশ্রয় হল প্রাচীন গৌরবের উপাসনা। ইওরোপীয় প্রভুত্বের প্রতিবাদে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই দিকে প্রবাহিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। পশ্চিমী পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের সভ্যতাসম্পদ আবিষ্কার করছিলেন, তার সঙ্গে আবহমান প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন উপলব্ধি এসে সম্মিলিত হল। ইওরোপের গুরুগিরির প্রতিবাদে রব উঠল—আমরাই বা কিসে কম। "অতীত গৌরব-কাহিনী" বাণীর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজল বিক্ষুব্ধ বিচলিত মন, চিত্তাকাশে উজ্জ্বল

আত্মসম্মানের ধ্বজা।

যে-প্রাচীন গৌরবের দিকেই কেবল উনিশ শতকের দৃষ্টি ফিরেছিল, ঘটনাক্রমে সে-গৌরব কিন্তু হিন্দুসভ্যতার। হিন্দুর সামাজিক ঐতিহ্য আবার আগে থাকতেই ছিল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, পশ্চিমী ঝড় তাকে বিশেষ কাবু করতে পারেনি। দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠল আমাদের প্রাচ্যাভিমানীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—হিন্দুত্ববোধ। আত্মরক্ষার দিক থেকে হিন্দুত্বের ছত্রছায়ার সার্থকতা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার মধ্যস্থিত দুর্বলতার দিকটা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দু, কিন্তু অহিন্দুর সংখ্যাও সামান্য নয়। অহিন্দুর মনে আঘাত নব-জাগরণকে সহজেই ব্যাহত করতে পারে। সংখ্যাধিক হিন্দু সম্প্রদায় কিছু দৃঢ়সম্বন্ধ একীভূত শক্তি নয়; হিন্দুসমাজ শতবিভক্ত, উচ্চ-নীচ অগণিত স্তরে গ্রথিত সমাজ। হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব অসামান্য বলে স্বীকার করলেও তাই পশ্চিমপন্থীর মনে হওয়া অনিবার্য যে তার অনেক কিছুই বর্জনীয়। ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ জাগ্রত ভারতকে হিন্দু-অহিন্দুত্বের ঊর্ধ্বে উঠে মানব-অধিকারকে আশ্রয় করতে হবে, পশ্চিমী দৃষ্টির ন্যায্য পরিণতি এই দিকে।

প্রাচ্যাভিমানের মধ্যে তৃতীয় দিক দেখতে পাই ভক্তি-প্রবণতার মধ্যে—যেটা হল এদেশে চিরাচরিত ধর্মসাধনার অন্তরঙ্গ অঙ্গ। পশ্চিমী দৃষ্টি স্বভাবতই ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রতি সন্দেহের ভাব পোষণ করে, কারণ যুক্তি ভক্তির বিপরীত পথ। প্রাচ্যাভিমানীর ভক্তির উপর জোর দেওয়া ধর্মবোধের সমার্থক মনে করি না। ধর্মের শান্ত সমাহিত ব্যক্তিগত রূপ পশ্চিমীভাবের পরিপন্থী নয়। কিন্তু রাম-মোহন-দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম এবং শতাব্দীর শেষভাগের ভক্তিমার্গের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য আছে। রামকৃষ্ণের নিজস্ব ভক্তিসাধনাকেও পশ্চিমী মন শ্রদ্ধা করতে পারে। কিন্তু ভক্তি সমাজ-জীবনে প্রবলবেগে প্রবাহিত হলে সংস্কার-কামনা, যুক্তিপ্রয়োগ, মানব-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতির থেকে জনমন বিক্ষিপ্ত হওয়াটাই সম্ভব। সুতরাং প্রাচ্যপ্রত্যয় ভক্তিকে আশ্রয় করে দেশে পশ্চিমী ভাবের প্রতিরোধকেই শক্তিশালী করতে চেয়েছিল বললে অন্যায় হবে না।

বাংলার রেনেসাঁসের এই দুই প্রধান ধারা—পশ্চিমী দৃষ্টি আর প্রাচ্যাভিমান—কোনোটাকেই অবজ্ঞা করা চলে না। কারণ দুটিই বাস্তব জীবনধারার প্রকাশ, ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে কোনোটাই বঞ্চিত নয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে, আমাদের নব-জাগরণের অন্তত দুটি প্রধান অঙ্গ আলোচ্য দুই ধারার কাছেই ঋণী। প্রথম, সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রাচুর্য, রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে প্রথমে যার কথা মনে আসে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশিকতার উন্মেষ ও অগ্রগমন, ব্যাপক ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণের সঙ্গে যার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। স্বাদেশিকতা এবং সংস্কৃতিচর্চা সমানে পুষ্টিলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে। কিন্তু সুপরিচিত এই সম্মিলিত জয়যাত্রা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়।

চিন্তাজগতের অন্তর্ভুক্ত যে দুই ধারাকে এখানে বিরোধী শক্তি হিসাবে চিত্রিত করা

হল, তাদের অবজ্ঞা না করার অর্থ হল, আসল রূপ ও বিকৃতির মধ্যে সীমারেখা টানা। বিকৃতি দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সে-বিকৃতি আসলের প্রতিরূপ নয় বলেই অগ্রাহ্য। সেকালের শিক্ষিত যুব-সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ ও মদ্যপান, অনাচার কিংবা ব্যভিচার, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ইংরেজী হাবভাবের অনুকরণ, "সাহেবিয়ানা" ইত্যাদিকে পশ্চিমী দৃষ্টির পরিচয় হিসাবে প্রতিপন্ন করাটা হাস্যাস্পদ। পশ্চিমী ধারার বিশিষ্ট প্রতিনিধি মধুসূদন সে যুগের বাবু-সভ্যতাকে বিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন। প্রাচ্যাভিমানেরও বিকৃতি দেখি অহিন্দুকে উৎপীড়নের মধ্যে অথবা হিন্দু আচারকে বিজ্ঞানের অধুনাতম আবিষ্কারের সঙ্গে একার্থ করে দেখার ভিতরে। কবিতা ও কৌতুকনাট্যে এর প্রতি শ্লেষবর্ষণ রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রের স্মরণে আসবে।

কিন্তু বিকৃতি বাদ দিলেও অমূর্ত ধারণা-দুটির পরস্পর-বিরোধিতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য অনেকে আমাদের রেনেসাঁসে সমন্বয় খোঁজেন, এবং ইচ্ছামতো পেয়েও থাকেন। সমন্বয় ধরা পড়ে বারবার—রামমোহনে, বঙ্কিমচন্দ্রে, রবীন্দ্রনাথে—শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দেহই জাগে। দুটি বিরোধী ধারার সমন্বয় পাওয়া যায় তখনই—যখন উভয়কে ছাপিয়ে নূতন তৃতীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের সমাজে তৃতীয়ের উত্তরণটুকু কোথায়? বারবার তার আবশ্যকই বা হয় কি করে? আসলে এমন সমন্বয় অনেকটা আপোসরফার অনুরূপ, বিরোধী বিভিন্ন ঝোঁকের সহাবস্থান মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে, এমনকি একই পর্বে, বিরোধী অমূর্ত দুই ধারণারই ছায়া ফেলাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু সনাতন ঐতিহ্য রক্ষা ও সংস্কার, হিন্দুত্বের গৌরব এবং ধর্ম-সমাজ-নিরপেক্ষ মানব-অধিকারের দাবি, ভক্তি আর যুক্তি—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সহজ বুদ্ধির অগম্য।

অথচ ইতিহাস যেহেতু ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা, সেই কারণে সমাজে বিরোধী চিন্তার সন্ধান পেলে কিছু মূল্যবিচার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যা ঘটে সেটাই যথার্থ, সব কিছুরই সার্থকতা আছে, "তোমরা সবাই ভালো"—ইতিহাস অন্তত এই পথে চলতে পারে না। পরস্পরবিরোধী ঝোঁককে উপহাস করা চলে না, বিভিন্ন ধারার ঐতিহাসিক স্বাভাবিক বাস্তব কারণ থাকে, প্রত্যেকের স্বরূপ অনুধাবন আবশ্যক। কিন্তু ইতিহাসের গতির দিক থেকে প্রভেদ নির্ণয়েরও প্রয়োজন আছে।

নিছক শিল্পসৃষ্টি এবং রাষ্ট্রিক আন্দোলনের প্রকৃত বিকাশকে আমরা এই আলোচনার বাইরে রেখেছি বলে সামাজিক আদর্শের সংঘাতটাই এখানে আমাদের বিচার্য। এক্ষেত্রে লেখকের মতামত এতক্ষণে পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী দৃষ্টিকে আমি প্রাচ্যাভিমানের উপর স্থান দিই দুই কারণে। প্রথমত, এই জাগরণের মূল প্রেরণা আসে নূতনের আগমনে; প্রাচীন রক্ষণশীলতা ঠিক তার আদি উৎস ছিল না,

হওয়াটাও হত অস্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই, "(পশ্চিমী) সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল।" রেনেসাঁসের গঠনকার্যে প্রাচ্যাভিমানের দান অস্বীকার না করেও বলা চলে যে তার প্রাণসঞ্চার হয়েছিল পশ্চিমী চিন্তার আবাহনে। দ্বিতীয়ত, আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে-ভারতবর্ষ বিরাজ করছে, তার বাহ্যিক আকার যে রূপই নিক না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই। যে সমাজবাদ আমাদের কাম্য ন্যায্যত তার সঙ্গতি পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে-পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।

৫

রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলার নব-জাগৃতি কি ঢেউ তুলেছিল, পশ্চমী প্রত্যয় ও প্রাচ্যাভিমান তাঁর লেখায় কিভাবে ঝংকার এনেছিল, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নিশ্চয় অন্যায় হবে না। তাঁর বক্তব্যের সরস স্বচ্ছতা, তাঁর অনুপম ভাষা আমাদের শক্তির নাগালের বাইরে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নিজের বাণী শোনাটাও পরম লাভ। সকল উদ্ধৃতি সমস্ত পাঠকের কাছে সমান পরিচিত নাও হতে পারে।

বলা বাহুল্য, উক্তিগুলি সংগৃহীত হয়েছে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে। লেখাগুলিকে সাজানো হয়েছে অনেকটা ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ; "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।" ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'—১৯২৯)। তাছাড়া তারিখ অনুসারে সাজালে তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশের কিছুটা পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য সংবেদনশীল কবির চিত্তে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন বিরোধী সুর ধ্বনিত হতে পারে। তবু পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের সমাবেশে ভাবধারার স্তরভেদ ও পর্যায়ান্তরের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলার নব-জাগরণকে যে ভাবে দেখেছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিচার করতে চেয়েছিলেন, আজকের দিনে সেটা নিশ্চয় আমাদের শিক্ষণীয়। রচনাবলীর "অবতরণিকায়" তিনি স্বয়ং লিখে গেছেন : "আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন।"

৬

আদি পর্বে, জীবনের প্রথম কুড়ি বছরে, রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার অধিকাংশই বর্জন করা হয়েছিল তাঁরই ইচ্ছানুসারে। বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে সে-সময়ে তাঁর মনে বিশেষ সমস্যার উদয় না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু যে-পরিবারে

তিনি মানুষ, যে-পিতৃবিশ্বাসে তাঁর উত্তরাধিকার, তার মধ্যে একদিকে যেমন তীব্র পশ্চিমী ভাব ছিল অনুপস্থিত, অন্যদিকে তেমনি সেই ব্রাহ্ম আবহাওয়া দেশাচার ও প্রচলিত-সংস্কার-প্রীতি থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল বলা যায়। 'এক-চোখো সংস্কার' প্রবন্ধে ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "যখন সমাজের কোন নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সাহায্য না করিবে, তখন নিয়মরক্ষার জন্য যে সে নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে।—একদল লোক বিলাপ করিবেই।—সত্যযুগ কোন কালে বর্তমান ছিল না, চিরকাল অতীত ছিল।"

প্রাচ্যাভিমানের প্রথম একটা ঢেউ রবীন্দ্রনাথের ১৮৮২-১৮৮৫ সালের লেখায় চোখে পড়ে। প্রাচ্যপ্রত্যয়ের একটা বড়ো উৎস ছিল ভারতে থিওসফি আন্দোলন, কলিকাতায় তার পত্তন হয় সম্ভবত ১৮৮২ সালে। ঠাকুরবংশীয় তরুণদের উপর রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবও কিছু সামান্য ছিল না।

'মেঘনাদবধ সমালোচনায়' (১৮৮২) রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে আক্রমণ করেন দেশের ঐতিহ্যকে অপমান করার জন্য। 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১৮৮৩) তিনি লিখলেন : "প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা।··· অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি তাহার মূল্য দেখিতে না পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়া-ধর্ম কোনখানে থাকে তাহাই আমি ভাবি।···আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থ-স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানে পাপে-তাপে-শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি।"

১৮৮৫ সালে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছিলেন যে রামমোহনের "প্রধান মহত্ত্ব" এই যে "তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিলেন··· যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল।" "ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। ···ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা ; জিহোভা, গড্ অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন।" এখানে ভারতের সঙ্গে হিন্দু ভারতের সমীকরণ লক্ষণীয়।

সেই বৎসরেই লেখা 'সমস্যা'তে আমরা পড়ি :

"বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরেজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটির সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না।···সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্ত-ক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য।···সকল অবস্থাতেই আইনপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে।" একই প্রবন্ধে তিনি অবশ্য লিখেছিলেন যে "পরিবার-বিশেষে" বাল্যবিবাহের অবসান এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন কাম্য।

পরবর্তী ১৩ বৎসরে (১৮৮৬-১৮৯৮) যুবক রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পাশ্চিমী প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল বললে বোধহয় অন্যায় হবে না।

১৮৮৪ সাল আন্দাজ শশধর তর্কচূড়ামণির আবির্ভাবে নব্য হিন্দুয়ানি মাথা তুলতে আরম্ভ করে। এই ঝোঁক যে রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর শ্লেষাত্মক রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। হাস্যকৌতুকের 'আর্য ও অনার্য" লেখা হয় ১৮৮৬ সালে; 'গুরুবাক্যের' তারিখ ১৮৮৭। ১৮৮৭ সালের 'চিঠিপত্রে' পাই: "আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য-ভৃগু-গৌতমের জানা ছিল…আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে এ বড়ো দুঃখের বিষয়…।" ১৮৯১ সালের 'প্রত্নতত্ত্বে' পড়ি: "আমরা হিন্দু… পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।" কবিতার মধ্যে সুপরিচিত 'কড়ি ও কোমলে'র 'পত্র' (১৮৮৬)—"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলি ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে"; 'ধর্মপ্রচার' (১৮৮৮)—"হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা, খৃষ্টানি হবে মাটি" ইত্যাদি।

অবশ্য এই বিদ্রূপের লক্ষ্য প্রাচ্যভাবের বিকৃতি মাত্র। কিন্তু খাঁটি প্রাচ্যাভিমানের পরিবর্তন-বিমুখতার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরেছিলেন। ১৮৮২ সালেরই কবিতা 'পরিত্যক্ত':

"বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর গুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?"

১৮৮৭ সালের 'চিঠিপত্র' এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য:

"স্বদেশ যেমন একটা আছে, স্বকালও তেমনি একটা আছে।…সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল।…আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানবজাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে।…এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই তো আনন্দ।…সহসা যখন নূতন ভাবের প্রভাব উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে… তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহর পাইবার জো নাই। অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।" যুবকের চিঠির উত্তরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণ শেষ পর্যন্ত লেখেন: "তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও।"

'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ (১৮৮৭) :

"চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, হিন্দুবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য কোনও জাতির বিবাহে দেখা যায় না।...তবে এদেশে বহুবিবাহ কিরূপে সম্ভব হইত।...বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়... বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচনা করিবার অধিকার আছে।...ইংরেজী আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী ; ইংরেজী শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজী ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই। জলে প্রবেশ করিয়া মাছ ধরিতে গেলে ভিজিতেও হইবে।"

এর সমর্থনে 'মুসলমান মহিলা'র (১৮৯১) উল্লেখ করা উচিত :

"একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে ; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।"

সেই বৎসরই লেখা হয় 'প্রাচ্যসমাজ' প্রবন্ধ :

"য়ুরোপে এসিয়ার প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এসিয়াতে তাহা নাই।...তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙিয়া আসে, পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপর স্বাধীন বুদ্ধি জয়লাভ করে।...যে সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীন বুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক।"

'কর্মের উমেদার' (১৮৯২) প্রবন্ধে রয়েছে :

"আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি। মনু-পরাশর-ভৃগু-নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ...মাঝে ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। বহু দিবসের পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না।"

সেই বৎসরে লেখা 'আদিম সম্বল'-এ আছে :

"মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।...এখন কথা এই আমরা নব্য বাঙালীরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি কী হিসাবে দেখিব।

যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর একবার পাল্‌টাইয়া আরম্ভ করিব ?…যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষাকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদ-বেদনা সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।"

'আচারের অত্যাচার' (১৮৯২) থেকে আসছে এই উদ্ধৃতি ঃ

"হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র 'হিন্দু' হইব, মানুষ হইব না।…আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা-আচার বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।"

'সমুদ্রযাত্রা' (১৮৯৩) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ

"স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।…লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না।…আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয় ‥তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধ-বিধি ছিল কি না।…দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।—আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে।—মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ।—নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে।—ইংরেজী শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না। এও কি কখনও সম্ভব হয়।"

১৮৯৩ সালে লেখা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে পড়া যায় ঃ

"জড়ের নিকট হইতে পলায়নপূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রসাদে রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলে আর তো মানুষের অবমাননা থাকে না।" অন্যত্র ঃ "যাহারা মনুষ্য প্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে।"

'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' লেখা হয় ১৮৯৪ সালে ঃ

"হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় (ভারতহিতৈষী হ্যামারগ্রেন

সাহেবের) ইহাতে কোনো কোনো হিন্দু পত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন।
—এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে, অবশেষে আমাদের শ্মশানও কি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব।"

বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর অবিস্মরণীয়। তিনি যে মনেপ্রাণে পশ্চিমী ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা অস্বীকার করা শক্ত। অথচ বাহিরের দিকে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। ইংরেজী পোশাক, খাবার, সাহেবী ধরনে চলা-ফেরা, ব্যবহারিক জীবনে বিদেশীপনা, ইংরেজীতে চিঠি লেখা কিংবা সেই মাধ্যমে শিক্ষালাভ—বহিরঙ্গ এই চিহ্নগুলি যে পশ্চিমী দৃষ্টির আসল পরিচায়ক নয়, এই সত্যটাই বিদ্যাসাগরে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ('বিদ্যাসাগর-চরিত', ১৮৯৫) : "পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে (তিনি) আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন—তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে নির্বাসন-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না।
—এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্‌কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।"

এরই আগের বৎসর রামমোহনকে নূতন ভাবধারার প্রবর্তক হিসাবে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ('বঙ্কিমচন্দ্র,' ১৮৯৪) :
"বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।"

এই সময়ের দু-একটি কবিতার উল্লেখ করা যায়। যেমন—'দুই উপমা' (১৮৯৬) :

"যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।...
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।"

অথবা—'সতী' (১৮৯৭) :

"যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।"

১৮৯৮ সালের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই পর্যায় শেষ করব :

"এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনো মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।" ('কোট বা চাপকান')

"ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি ; কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।" ('অযোগ্য ভক্তি')

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলেছি তার এই ধরনের প্রকাশ সম্বন্ধে কথা উঠতে পারে যে একে পশ্চিমী বলবার সার্থকতা কি? এ-জাতীয় সুর কি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে পাওয়া যায় না? কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে উনিশ শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারের সমালোচনার আসল প্রেরণা ও প্রবৃত্তি আসছিল পশ্চিমী ভাবাদর্শ থেকেই, দেশাভিমান থেকে নয়। প্রাচ্য-প্রীতির স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বরঞ্চ গোটা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরা, বিচারবুদ্ধি অনুসারে তাকে গ্রহণ বর্জন না করে। সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রবক্তাই ছিলেন যুগপ্রবর্তক রামমোহন। সমন্বয়-সাধন অপেক্ষা এটাই তাঁর প্রকৃত অবদান।

৮

ইতিমধ্যে দেশে শুরু হয়েছিল হাওয়া-বদল, এক্সট্রিমিজ্‌ম্‌-এর তরঙ্গ দেশ-মানসে আছড়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উপর তার প্রবল প্রভাবের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ সালের প্রৌঢ় বয়সের রচনায়।

জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে এক্সট্রিমিজ্‌ম্‌-এর দান অসামান্য একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইতিহাসে অগ্রগামী আন্দোলনেও অন্তর্বিরোধ থাকে। তার মধ্যে যদি পিছনের টান বলে কোনো কিছুকে স্বীকার করতে হয়, তবে সেই টান সাময়িক সাফল্যের হেতু হলেও পরের দিনে দৌর্বল্য ও অবসাদের সোপান হয়ে ওঠাটাও বিচিত্র নয়। স্বদেশী যুগের (১৯০৫-এর বেশ কিছু আগে থাকতেই তার সূচনা) বিরাট ঐতিহাসিক রাষ্ট্রিক জাগরণের মধ্যে প্রাচ্যাভিমানের একটা প্রবল উত্তাপ লক্ষণীয়। নিঃসন্দেহে তখনকার জাগরণে এটা একটা বাস্তব চালক-শক্তি ছিল। প্রাচ্যাভিমানের দুর্বলতাটুকুও তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল বললে অন্যায় হবে না, ভবিষ্যতে সে তার প্রাপ্য মূল্য আদায় করে নিতে ছাড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের মনে একটা অশান্তি এই পর্ব আরম্ভ হবার আগে থাকতেই দেখা যায়। আত্মশক্তি আবাহনের কথা বলছি না, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আগাগোড়া সে-ভাব বিদ্যমান, সেখানে পর্যায়ভেদের কথা ওঠে না। ১৮৯৭ সালে কবিতায় আহত মন ছায়া ফেলেছে দেখি:

"যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।"

"ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে।"

আন্তরিক অনুভূতি থেকে বিশ্বাসের দিকে যাত্রা বোধহয় অস্বাভাবিক নয়। তারই নিদর্শন এখানে :

"জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতি হিসাবে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না।...য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনো কালেই ছিল না বলিয়া যে জাতিবন্ধ নহে, সে কথা ঠিক নহে।" (প্রসঙ্গ-কথা' ২-১৮৯৮)

১৯০১ সালের 'নৈবেদ্য'তে আগের মতোই "তুচ্ছ আচার", "নিরর্থ আচার"-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেই বৎসরেই 'ব্যাধি ও প্রতিকারে' চোখে পড়বে :

"আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্য জগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি।...মনে করিয়াছিলাম এই পাশ্চাত্ত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতা-বিজেতার ভেদ থাকিবে না...ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি কিসের জন্য...ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।"

অবশ্য আসল সমস্যা এইখানেই। চিরন্তন আদর্শকে আঁকড়ে থাকলে যুগো-পযোগী হওয়া সম্ভব কি? নূতন আদর্শকে দেশের অবস্থার সঙ্গে খানিকটা খাপ খাওয়ানোটাই কি শ্রেয়স্কর পথ নয়?

১৯০১ সালেই লেখা হয় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' :

"আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।...আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না।"

১৯০১ সালের অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্যপ্রত্যয় প্রকাশ পেল :

"বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্যদিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না।" ('সমাজভেদ')

"অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা পেট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ।...সামাজিক উন্নতিতে মানুষের

চরিত্রগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারও সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না।" ('বিরোধ-মূলক আদর্শ')

"সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।" ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব।" "বিপুল হিন্দু-সভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ')

১৯০১ সালে 'নেশন কি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা চলে : নেশন=প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ+বর্তমান পারস্পরিক সম্মতি, অথবা অতীত গৌরব+বর্তমান এক ইচ্ছা। কিন্তু সব নেশনের মূল্যবান অতীত তো নাও থাকতে পারে, অতীতে অগৌরবও অসম্ভব নয়। ভবিষ্যতে পুনর্গঠনের স্বপ্নটুকু এখানে বাদ পড়েছে।

প্রাচ্যাভিমান প্রবলতর হয়ে উঠল ১৯০২ সালে :

"মন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ।...পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই ...সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভালো। আমরা যাহারা ইংরেজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগর-লহরী-সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না।" ('নববর্ষ')

"অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গাতেই খাটে কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলট-পালট হইয়া যায়।" ('বারোয়ারি-মঙ্গল')

এর মূল সুরটি একেবারে স্লাভোফিল।

"ইংরাজের পক্ষে তাঁহার প্রেস্টিজ যেরূপ মূল্যবান ব্রাহ্মণের পক্ষেও তাঁহার নিজের প্রেস্টিজ সেইরূপ।—আমাদের দেশে সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের পক্ষেও ইহার আবশ্যক আছে।...ধর্ম এবং জ্ঞানার্জন, যুদ্ধ এবং রাজকার্য, বাণিজ্য এবং শিল্পচর্চা, সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম। ইহার কোনো-টাকেই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিকেই ধর্মগৌরব কুলগৌরব দান করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধও করা হয়, অথচ বিশেষ উৎকর্ষ সাধনেরও অবসর দেওয়া হয়।...এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা।...অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।...আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, তবে তো আমাদের আনন্দের দিন।" ('ব্রাহ্মণ', ১৯০২)

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে (১৯০২) প্রশ্ন আছে, "কারুখচিত কবরচূড়া" অথবা "মসজিদের পাষাণমণ্ডপ" ইত্যাদিকে "ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি ?" সেই বৎসরেরই 'অত্যুক্তি'তে রয়েছে : "অনেকদিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতী সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।"

মহর্ষি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "পিতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন।" ('মহর্ষির জন্মোৎসব', ১৯০৪) সেই যুগেরই লেখা 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে কবি প্রণাম নিবেদন করলেন "বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে" যিনি "সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ" করতেন। (১৯০২)

সুবিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' লেখা হয় ১৯০৪ সালে। এর মধ্যকার আত্মশক্তির আবাহন আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করব স্টেট থেকে সমাজের পৃথকীকরণটাকে। বিদেশী শাসকের সঙ্গে দেশী সমাজের অসহযোগের ধারণাটা নিশ্চয়ই অগ্রগতির সহায়ক, কিন্তু এখানে সমাজ যদি ধর্মনিরপেক্ষ সকল দেশবাসীর সংগঠন না হয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মাশ্রয়ী অতীত সমাজকে বোঝায় তবে ততদূর পর্যন্ত তাকে হিন্দুত্বের দিকে পিছনের টান বলেই স্বীকার করতে হবে। তার ঐতিহাসিক কারণ ছিল, কিন্তু তাছাড়াও তাতে ছিল ভবিষ্যতের বিঘ্ন। নিচের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষণীয় :

"সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি (পৃথিবীতে) চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।"

একমাস পরে লেখা 'স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট' থেকে :

"কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি ··যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবার-রক্ষার চেষ্টা কেন। খ্রীস্টান সমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাক্কা দিতেছে।··· মনই সমাজের মস্তিষ্ক ; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া ?·· বিলাতী সভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি।" পরে আছে যে পরকে আপন করা একাকার করা নয়, "পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।"

'সফলতার সদুপায়' লেখা হল ১৯০৫ সালে ঝড় ফেটে পড়ার ঠিক প্রাক্কালে :

"যে পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয় সে পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু পরদিনেই আর নহে।" এখানে "জাতি" নিশ্চয় ধর্মাশ্রয়ী সমাজের সূচক। সেই জন্যই 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে (১৯০৫) প্রস্তাব করা হয় যে যে-কর্তৃসভার হাতে দেশের কর্মশক্তিকে সংগঠিত করতে হবে তার অধিনায়ক থাকুক একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। কিন্তু এই পথে চললে দেশকে কল্পনা করতে হয় ধর্মসমাজের ফেডারেশন হিসাবে।

বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় এই সময়কার 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধতেও (১৯০৫):

"আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এই-খানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই।"

১৯০৫-১৯০৬ সালে বাংলা দেশে যে আলোড়ন হয়, ঐতিহাসিক সেই অভিযানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে সামনে। স্বভাবতই সেই উম্মাদনাময় দিনগুলিতে ঝোঁক পড়েছিল সমবেত সংগ্রামের উপর, আদর্শ আলোচনার ও তর্কবিতর্কের সময় তখন নয়। সেদিনের আবেগ কবি লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'বিজয়া সম্মিলনে' (১৯০৫):

"যদি বিদ্যুৎ চকিত হইয়া থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না…যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো…অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।"

এ তো সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রার আহ্বান, কিন্তু এর মধ্যে দেশগঠনের আদর্শ, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্ত্য, এবং বিভিন্ন আদর্শের মূল্যবিচার নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু স্বদেশী অভ্যুত্থানের প্রাথমিক চিন্তার পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচ্যাভিমানের আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন তার প্রমাণ রইল উপরের উদ্ধৃতি-গুলিতে।

৯

১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আর একটা মোড় ফিরবার নিদর্শন পাওয়া যাবে। এর পর দশ বৎসর ধরে বন্যার মতো যে-রচনাস্রোত দেশকে প্লাবিত করে তা হল পরিণত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তার মধ্যে প্রাচ্যাভিমান থেকে যে-দিকে তাঁর মুখ ফিরেছে, সে হল হিন্দুত্ব নয়, নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন, যাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই।

'গীতাঞ্জলি'র তিনটি সুপরিচিত কবিতায় এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে: "হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে," "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন", আর "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান", ১৯১০ সালে পর

পর তিন দিন এই কবিতা তিনটি লেখা হয়। এর আগের পর্বেই (১৯০৬) 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে এর পূর্বাভাস পাওয়া যাবে; "হে আমার স্বদেশ...তোমার ...আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।" এই প্রতীক্ষা ভবিষ্যতের নূতন ভারতের প্রতীক্ষা, অতীতের আবাহন নয়।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের অপসরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখানে সে-তর্কে নামবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা প্রবল ঝোঁক ছিল প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমী দৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তনের। স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি হয়তো বা অবিচার করেছিলেন, কিন্তু পোলিটিকাল অভিযান তাঁর নিজের কাজ ছিল না, তিনি স্বভাবতই বিচরণ করতেন ভাবনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে। স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি পরেও যে উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাবনা কনফারেন্সে অভিভাষণ (১৯০৮), কংগ্রেসে প্রকাশ্য বক্তৃতা (১৯১৭), নাইট্‌হুড ত্যাগ (১৯১৯), হিজলী বন্দী-হত্যার প্রতিবাদ (১৯৩১) ইত্যাদি। আসল কথা, স্বদেশী উত্তাল অভ্যুদয়ের মুহূর্তের পর রবীন্দ্রনাথের মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে পোলিটিকাল এজিটেশন তাঁর কর্মক্ষেত্র নয়। সেই সঙ্গে প্রাচ্যাভিমানের সীমাবদ্ধতা উত্তরোত্তর তাঁকে পীড়া দিতে থাকে, তিনি মুক্তি খোঁজেন পশ্চিমী দৃষ্টির আলোতে।

মুক্তির পরিচয় নিয়ে এল তাঁর অমর উপন্যাস 'গোরা' (১৯০৭-১৯০৯)—সাহিত্যসৃষ্টিতে সমসাময়িক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র হিসাবে যার উৎকর্ষ এ দেশে আজও অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। 'গোরা'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমরা পড়ি:

"জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।... মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে...যে দিন চলে গেছে সেই দিনে কি কখনো ফিরে যাওয়া যায়? বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়... মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব?...সমাজ যদি কালের গতিতে বাধা দেয় তা হলে সমাজকে যে আঘাত পেতেই হবে।...সত্যের পরীক্ষা যে কোনো এক প্রাচীনকালে একদল মনীষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকে-বুকে যায় তা নয়... (আমাদের) সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।"

যাঁদের মনে হবে এ সব কথা তো স্বতঃসিদ্ধ তাঁদের প্রতি জিজ্ঞাসা এটিই যে, নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় আজকের দিনেও তাঁরা কার্যত এই সব মেনে চলেন কি না? না, রবীন্দ্রনাথেরই আর এক উক্তি আজও সত্য—"আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া

স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লান বদনে বলিতে পারে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'।" ('শিক্ষাবিধি' —১৯১২)
উপন্যাসের নায়ক গোরা প্রচণ্ড প্রাচ্যাভিমানী, কিন্তু "পল্লীর মধ্যে…নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল।" উপন্যাসের শেষে গোরার উক্তি অবিস্মরণীয়: "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।…সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।"
১৯০৮ সালের 'পূর্ব ও পশ্চিম' এরই প্রতিধ্বনি করেছে: "অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস।" এই প্রবন্ধে রামমোহনের ভূমিকার পূর্ণ উপলব্ধি লক্ষণীয়: "রামমোহন রায়…মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই।"
বাংলা দেশে পশ্চিমী হাওয়াকে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে (১৯০৭) লিখলেন: "য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির উপর অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি মধুসূদনকে প্রাপ্য সম্মান দিলেন এই বলে: "মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নয়, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।… ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।"

১৯০৭ সালের 'বাস্তব' প্রবন্ধে লেখা আছে:
"বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি।…বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেন না স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়।"
১৯০৮ সালের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

"চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না… যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। …ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে-সহিষ্ণুতা, যে-সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।…জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।" ('পাবনা অভিভাষণ')।

"আমাদের দেশেও একটু নাড়া দিলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? একত্র সংগঠনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্ব চেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।…কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এত দূরে বিস্তৃত করো, যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।" ('পথ ও পাথেয়')

"ব্যবস্থাবন্ধ ভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না।… যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।… যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়?… সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বকীয় করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।… ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে।" ('সমস্যা')

(স্বদেশী উপলক্ষে) "আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম।… ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ-কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দিই নাই…এমন অবস্থায় 'ভাই' শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না…জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি—দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই।" ('সদুপায়')

আপত্তি উঠিতে পারে যে জনসংযোগ পশ্চিমী দৃষ্টি.হবে.কেন, প্রাচ্যাভিমানীরাই

তো তার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপকভাবে স্বদেশী আমলে। এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এদেশীয় সাহেবিয়ানা আর পশ্চিমী দৃষ্টি এক নয়, তফাত খোসার সঙ্গে সারবস্তুর। প্রাচ্যপ্রত্যয়ের স্বভাবজাত অতীত-(হিন্দু) গৌরব, হিন্দুত্ববোধ ইচ্ছা সত্ত্বেও অহিন্দুকে টানতে পারেনি, হিন্দুকেও করে তুলেছে অসহিষ্ণু; আর ভক্তিভাব বাস্তব সমস্যা থেকে লোকের চোখ ফিরিয়েছে খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিত্বের মুক্তি-সাধনার দিকে। তাই অমূর্ত আদর্শের দিক থেকে জনসংযোগ পশ্চমী ভাবেরই বেশী কাছে, কারণ সে-প্রত্যয় জোর দিচ্ছে মানুষ হিসাবে মানুষের অধিকারের উপর, তার যুক্তিবাদ ধর্মের গোঁড়ামিকে আঘাত করছে, তার সমাজ-সংস্কার নিপীড়িতদের মুক্তি চাইছে।

'গোরা'র পর 'অচলায়তন' (১৯১১), প্রতিষ্ঠিত আচার-সংস্কারের উপর সাক্ষাৎ আক্রমণ। সেই বৎসর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়…দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে…আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে …আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই …বাস রে! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি?"

পরিণত আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথ আগেকার দিনের প্রাচ্যাভিমানের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শুধু রূপকে নয়, প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে স্পষ্ট প্রবন্ধে:

"মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়।…আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই, অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো।…আর্য ও অনার্য অসংবদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি; ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলি-লুণ্ঠিত… শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব করিয়া থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই · হিন্দুসমাজেই উচ্চ-নীচ নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে।…আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।" ('ধর্মের অধিকার', ১৯১২)

"বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য।"

('ধর্মশিক্ষা', ১৯১২)

এই ১৯১২ সালেই কিন্তু 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই সংস্কৃত রূপ, কিছু অহিন্দু ব্রাহ্ম হলেও সেই আদি উৎসকে অস্বীকার করা চলে না।

১৯১২ সালের অন্য অনেক লেখায় তিনি ইওরোপাগত আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। যেমন :

"য়ুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।" ('যাত্রার-পূর্ব-পত্র')

"য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম—গতির বেগে সে আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে।" ('ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী')

"একথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ সকল সমাজের সেরা · গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই।...আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে।" ('লক্ষ্য ও শিক্ষা')

১৯১৪ সালে এল 'বলাকা' তার গতির বন্দনা নিয়ে। তার মধ্যে ধ্বনিত হল এগিয়ে চলার ডাক·· "আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে।" কবিতা অবশ্য কবিতাই, কিন্তু কবির একটা দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যেও ধরা পড়ে, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, 'বলাকা'য় প্রকাশ্যে।

কবিতার থেকে প্রবন্ধেতে নেমে 'লোকহিতে' আমরা দেখি (১৯১৪) :

"সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।·· নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা।"

সমাজের পুনর্গঠন ছাড়া, অতীতকে পূজা করে এই পরিবর্তন অবশ্য সম্ভব নয়। এই পর্ব শেষ করা যাক 'ঘরে-বাইরে'-র উল্লেখে। এর তারিখ হল ১৯১৫-১৯১৬—

"স্ত্রী। ওটা কি একটা যুক্তি। ওটা কি একটা সত্য। ওই কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?...ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি—ভগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরম্ আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না...আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়·· ভারতবর্ষ

যদি সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।...নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই।...মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।...এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপর হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি—"

প্রাচ্যাভিমানী হয়তো বলবেন, এর মধ্যে অনেক কিছু আমরাও বলে থাকি। ব্যক্তিবিশেষ তা বলতে পারেন, কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা দেশে প্রাচ্যপ্রত্যয়ের ঐতিহাসিক প্রকাশের অমূর্ত অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ রূপটির সঙ্গে এই সব বিশ্বাস খাপ খায় না; দুয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধ অগ্রাহ্য করা ন্যায়সঙ্গতভাবে অসম্ভব। শুধু ন্যায়ের তর্ক নয়, আজকের দিনে স্বাধীন ভারতেও কি এ বিরোধ অবসান হয়েছে? প্রাচ্যাভিমান আজও সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ দেশের গতি পশ্চিমী সভ্যতার দিকে।

১০

জাগরণ একটা প্রক্রিয়া বলে কোনো না কোনো সময়ে তাতে ছেদ টানতে হবে। ইওরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব আজ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকলেও ষোল সতেরো শতকে আমরা তার সীমারেখা নির্দেশ করি। বাংলার রেনেসাঁসকেও প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে টেনে আনবার সার্থকতা দেখি না, যদিও তার জের আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত। রামমোহনে যার সূত্রপাত, ঠিক এক শতাব্দী পরে তার যবনিকা পড়লে আপত্তি করা যায় না।

তার পরেও শতাব্দীর এক পাদ কাল জুড়ে রবীন্দ্র-রচনা উৎসারিত হয়েছিল, রবীন্দ্র-প্রতিভা সেতুবন্ধন করেছে দুই যুগের মধ্যে। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলব যে 'গোরা-অচলায়তন-বলাকা-ঘরে বাইরে'র পর্বের দৃষ্টি থেকে তিনি আর মুখ ফেরাননি।

শেষ পর্ব সূচনা করেছিল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭)। সেখানে আছে:
"এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে,...গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে—'যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে', অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার ঘর-দালানে বসিয়া বলিতেছে, 'যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা-নাপিত বন্ধ', আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকো'।...বুড়ী এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি কালেজের তরুণ ছাত্ররাও

এই বহুড়ীতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন।"

'রাশিয়ার চিঠি'তে (১৯৩০) নূতনের আবিষ্কারের আনন্দ এত সুপরিচিত যে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'কালান্তরে' (১৯৩৩) স্বীকৃতি আছে: "বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত—প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি—য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোন চির-প্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।" 'সভ্যতার সংকটে' (১৯৪১) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কশাঘাত করেছিলেন পশ্চিমী দৃষ্টিকে নয়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনে তার বিকৃতিটাকে, ইংরেজ রাজত্বের মঙ্গলময় রূপের অতি প্রাচীন বিশ্বাসকে। তা নয়তো পশ্চিমের সৃষ্টি নব রাশিয়া ও নবীন জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের দুরবস্থার তুলনার উপর জোর দিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে পশ্চিমীদৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত। তাঁর প্রগতি-শীলতার একটা বড়ো লক্ষণ এই যে বার্ধক্যের চিরায়ত পশ্চাদ্‌গমন তাঁকে স্পর্শ করল না। পরিণত জীবনের শেষার্ধেরও বেশী জুড়ে বিরাজ করল ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

(বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বার্ষিকী, ১১ মার্চ, ১৯৭৫)

১

আজ এই স্মরণীয় দিনে আমাকে সম্মানিত অতিথি রূপে আহ্বান করে আপনারা যে সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি এর উপযুক্ত নই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের সময় আমি এখানে প্রায় পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা করার সুযোগ পেলেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সদস্য হবার সৌভাগ্য আমার জোটেনি। ১৯৬০ আন্দাজ যখন আমি এর সভ্য হতে চেয়েছিলাম তখন শুনলাম দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে পরিষদের সংগ্রামোজ্জ্বল দিনগুলিতে অবশ্য ঘটনাচক্রে আমি দূরেই থেকে গিয়েছিলাম, তার ঐতিহ্যের অংশীদার হতে পারিনি। আমি তাই বহিরাগত মাত্র, আমি কিছু বলতে পারি কেবল ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে রাখি বার্ধক্যের বাচালতার জন্য, আর ঐতিহাসিক আলোচনায় যদি কোনও অপ্রীতিকর মন্তব্য এসে পড়ে তাও আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

জাতীয় পরিষদের আদর্শের বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করব। এর সূচনা দেখতে পাই উনিশ শতকের জীবনেই।

প্রথমে মনে পড়ে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতির আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস। তখন দেশের সমস্ত ব্যাপারে বিদেশী প্রভুত্ব কায়েমী হয়ে বসেছিল, শিক্ষাও তার ব্যাতিক্রম ছিল না। জাতীয় মনোভাবের উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই তাই অতি স্বাভাবিকরূপে একটা তাগিদ জেগে উঠছিল যে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর স্বদেশী কর্তৃত্ব বিস্তার করতে হবে, কারণ দেশের শিক্ষা দেশবাসীর হাতেই থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত, একটা ধারণা ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে যে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে দেশবাসীর প্রকৃত প্রয়োজনকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, বিদেশের উপযোগী ধ্যান-ধারণা অপসারিত করে শিক্ষার বিষয়কে স্বদেশের উপযুক্ত রূপ দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বিদেশী কর্তৃত্ব নয়, বিদেশী ধাঁচটাও বদলানো দরকার।

তৃতীয়ত, উনিশ শতকে আমাদের অনেক শিক্ষাবিদদের মনে হতে থাকল যে, দেশে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটা কারিগিরি-বৈজ্ঞানিক ঝোঁক আনতে হবে, নতুবা দেশের শিল্পোন্নতি অসম্ভব, দেশবাসী বহির্বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না, নিমজ্জিত থাকবে অতীতের অনুন্নত অন্ধকারে। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি অবশ্য পশ্চিমেরই দান, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাকে আয়ত্ত করা, তার সদ্ব্যবহার অতি আবশ্যক। অথচ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমস্ত জোর পড়েছিল বিজ্ঞানবর্জিত বিদ্যার উপর। বিদেশী প্রভুদের ঝোঁক ছিল উচ্চ-মধ্য শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি উপার্জনী বৃত্তির সুযোগ এনে দেওয়া—শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, সরকারি ও

বাণিজ্যিক কর্মচারী সৃষ্টি করা—আর নিম্ন-মধ্য শ্রেণী থেকে কেরানি সংগ্রহ। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অথবা ব্যবহারিক টেক্‌নলজি তাই সেদিন ছিল অবহেলিত। স্বদেশী শিক্ষাবিদ অনেকে চাইলেন এ অভাব দূর করতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত খুলে দিতে।

চতুর্থত, শিক্ষার মাধ্যম। তখনকার দিনে স্কুলে-কলেজে শিক্ষার বাহন ছিল বিদেশী ইংরেজি ভাষা ; যদিও এটা সুবিদিত সত্য যে মাতৃভাষার শিক্ষা ভিন্ন ছাত্রেরা অধীত বিদ্যা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে না, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয় না। অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে তখন পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না, তারা শেখে না-বুঝেও তোতা-পাখীর মতো আবৃত্তি করতে। তাছাড়া ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে একটা দুস্তর পার্থক্য, এক অশেষ ব্যবধান। আমাদের কোনও কোনও মনীষী তাই উনিশ শতকেই চেয়েছিলেন মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে।

নূতন আদর্শের শেষ অঙ্গ হল জনশিক্ষার প্রচলন। সেদিনের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্য, যারা উপরের স্তরের বাসিন্দা। কিন্তু জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমস্ত জাতিটাই থেকে যাবে পশ্চাৎপদ এক সমষ্টি মাত্র। চিন্তাশীল কেউ কেউ তাই চাইছিলেন জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার।

১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তার কৃতিত্ব দেখি এইখানে ; অন্তত পূর্ণাবয়ব আদর্শের মধ্যে। কাগজে-কলমে স্থান পেল উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গই—ইংরেজিতে যাদের বলা যায় : national control, national content, technological-scientific bias, vernacular medium, এবং mass-education। আজ এই বিশেষ দিনে পূর্বসূরীদের স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদিও তাঁরা জোর দিয়েছিলেন প্রধানত সামগ্রিক আদর্শের উপর নয়, তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলির উপর। গোটা আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ অবশ্য জাতীয় পরিষদের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

স্বয়ং রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে বড়লাটের প্রতি তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমাদের প্রয়োজন হল—'Useful sciences'—'আবশ্যকী বিজ্ঞান-শিক্ষা', যেমন গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা। তখনকার হিন্দু কলেজে এই ধরনের শিক্ষার সামান্য চেষ্টা চোখে পড়লেও আমাদের দেশে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা হয়ে উঠল ভাষা ও সাহিত্যচর্চামূলক। কর্তৃপক্ষ সেদিন রামমোহনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন, অর্ধশতাব্দী পরেও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি।

প্রথম দিকে ইংরেজি মাধ্যম ছাড়া উচ্চশিক্ষা সম্ভব ছিল মনে হয় না, জনগণের ভাষাগুলি তখনও অপরিণত। কিন্তু মেকলের পরে উনিশ শতকের শেষ পাদে কি বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে পারত না? ইতিমধ্যে আমাদের

সাহিত্যিকদের হাতে কি বাংলা ভাষা পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি? বাংলা মাধ্যম এল না, তার কারণ বিদেশী শাসকদের ঔদাসীন্য, আর আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা হয়ে পড়েছিলেন গতানুগতিক ব্যবস্থায় অতি-অভ্যস্ত। তথাপি উনিশ শতকের কিছু কিছু মনীষী বাংলা ভাষায় শিক্ষা সমর্থন করেন। যে-ডিরোজিওপন্থীদের নকল-ইংরেজ মনে করা হয় তাঁদেরও অনেকে বাংলা পত্রিকা চালাতেন; তাঁদেরই একজন, উদয়চন্দ্র আঢ্য, ১৮৩৮ সালে বাংলা ভাষার পক্ষে জোর সমর্থন জানান। ১৮৪০ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রবর্তন করেন তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান।

জাতীয় মনোভাব বিস্তারের আর এক দিক দেখা যায় নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল স্কুলে (১৮৭০)। 'ন্যাশনাল স্কুল' কথাটির প্রথম ব্যবহার সম্ভবত এইখানে।

বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জোর দিলেন অন্য এক দিকে—জনশিক্ষা বিস্তারের উপর। ১৮৭২ ও ১৮৭৮ সালে তাঁর লেখাতে দেখতে পাই এক তীব্র চেতনা যে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং শিক্ষাবঞ্চিত জনগণের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংকোচন করে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব তিনি সজোরে সমর্থন করেন। ১৮৮৬ সালে প্রমথনাথ বসু লিখলেন এক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা, তার বিষয় ছিল টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিস্তার। পর বৎসর থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের প্রায়-বার্ষিক প্রস্তাবমালা, যার লক্ষ্য ছিল টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য আন্দোলন।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলায় উচ্চশিক্ষা ও বাংলা মাধ্যমের দাবি প্রবল হয়ে উঠল। ভাইস-চ্যান্সেলার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত ১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে সমাবর্তন ভাষণে বাংলা ভাষায় সপক্ষে সরব হয়েছিলেন। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরও মত ছিল তাই। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগান্তকারী প্রবন্ধ—'শিক্ষার হের-ফের'। তিনি বললেন যে, বিদেশী মাধ্যম শিক্ষিতদের তফাৎ করে রাখে সাধারণ লোক থেকে, অথচ শিক্ষাও থেকে যায় অসম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাবর্জিত মুখস্থ বিদ্যা মাত্র। বাংলা মাধ্যমের বিপক্ষে যত কিছু যুক্তি আজ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে তার সব কটা খণ্ডন করেছিল এই রচনাটি।

১৮৯৫ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগবত চতুষ্পাঠি গঠন করলেন, উদ্দেশ্য ছিল বাছাই করা একদল কর্মী প্রস্তুত করা, যারা আত্মনিয়োগ করবে স্বদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাজে। তিনি 'ডন' পত্রিকা শুরু করেন ১৮৯৭ সালে, এর বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। পর বৎসর বিলেত থেকে সার জর্জ বাড্উড তাঁকে এক প্রসিদ্ধ পত্র লেখেন যাতে বলা হয় যে ভারতে শিক্ষায় পশ্চিমী বিজ্ঞান ও টেকনলজিকে নিশ্চয়ই অঙ্গীভূত করা দরকার,

কিন্তু জোর দিতে হবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি-সম্পদের উপর। আর সে জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশী কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য উপায় নেই। ১৮৯৯ সালে সতীশচন্দ্র চিঠিটি প্রচার করেন 'ডন' পত্রিকায়। সন্দেহ নেই যে সতীশচন্দ্রের হাতে গড়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উপর এই বিদেশী চিঠি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে শুরু করলেন তাঁর প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়। প্রথমে একে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল। সে পর্যায়ে সক্রিয় কর্মী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কিন্তু এর স্থায়ী রূপটায় ফুটে ওঠে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, শিশুশিক্ষায় যার মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল যে, শিক্ষা হবে প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে; আবাসিক ব্যবস্থার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য গড়ে তুলতে হবে; বিদ্যালয়ের জীবন চলবে সরল সহজ বিলাসবিহীন ছন্দে; সঙ্গীত ও চারুকলার আবহাওয়া এনে দেবে সৌন্দর্যের পরিবেশ; শিক্ষা চলবে বাংলা মাধ্যমে।

এদিকে 'ডন' পত্রিকা তার নির্দিষ্ট কাজ পালন করে চলেছিল নিরলসভাবে। ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র গড়লেন 'ডন সোসাইটি'। তিনি জোর দিলেন সৃজনশীল মৌলিক চিন্তার দিকে, গবেষণার উপর। শহরের কৃতী ছাত্রেরা আসতে লাগলেন তাঁর সংগঠনের মধ্যে।

১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অপর এক দিকে। জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি জোর দিলেন কয়েকটি সহজ উপায়ের উপর। জনবহুল মেলাগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। যাত্রা, কথকতা, ম্যাজিক লণ্ঠনসহ বক্তৃতা কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয় অথচ জনপ্রিয়। জনশিক্ষার কাজে এই সবের প্রয়োগ হল তাঁর পরামর্শ।

পক্ষান্তরে ১৯০৪ সালেই যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এক সমিতি গড়েছিলেন যার লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষা বিস্তার। তিনি একটা ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করলেন; এর সাহায্যে শিল্প-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠানো শুরু হয়েছিল। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' ও সতীশচন্দ্রের 'ডন' পত্রিকায় প্রচুর আলোচনা দেখতে পাই, বিষয়বস্তু ছিল জন-শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাব্য উপায়। বহু চিন্তাশীল লোক এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ধাক্কায় স্বভাবতই জোর পড়েছিল স্বাধীন শিক্ষার উপর। রব উঠেছিল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিনিয়ে নিতে হবে বিদেশীর হাত থেকে। ১৯০৫ সালে জুলাই মাসে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী তোলে। বিদেশী কর্তৃত্বাধীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকে বলতে লাগল গোলদিঘির গোলামখানা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ঘোষিত আদর্শ আকাশ থেকে পড়েনি, তার বিভিন্ন অঙ্গ উনিশ শতকের চিন্তায় নানা দিকে প্রকাশ পাওয়া চোখে পড়ে। ইতিহাসের রীতিই হল এই। তবু নানা অঙ্গকে একসূত্রে বাঁধাটাও স্মরণীয় ঘটনা। স্বীকার করতে হবে কার্জন প্রমুখ ইংরেজ শাসকদের সদম্ভ আস্ফালন এখানে catalyst-এর কাজ করেছিল।

১৯০৪ সালে লাট কার্জন চালু করলেন তাঁর নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন। শিক্ষার মান উন্নয়নের অছিলায় তিনি আসলে চেয়েছিলেন শিক্ষা-সংকোচন, অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস, শিক্ষিত রাজদ্রোহীদের কোণঠাসা করে ফেলা। শ্লেষ বিদ্রূপে তিনি বাঙ্গালীদের অপমান করতে ছাড়েননি।

আর ১৯০৫ সালে এল পার্টিশন, বাংলার অঙ্গচ্ছেদ। ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করেছেন যে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল শাসনের কাজ সরল করা নয়, বাঙ্গালীদেরই দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা—পৃথক শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রত্যুত্তরে বহুদিনের সঞ্চিত আবেগ সেদিন ফেটে পড়েছিল প্রচণ্ড আলোড়নে, ইতিহাসে যার নাম স্বদেশী আন্দোলন।

১৯০৫ সালে অক্টোবর ও নভেম্বরে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-দমনের খড়্গাঘাত নেমে আসে কার্লাইল ও লায়ন সার্কুলারে, এর কিছু পরে রিজলি সার্কুলারে। স্বদেশী-ভাবাপন্ন ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হল—বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার। প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বহিষ্কৃত হয়েছিল তিন শতের বেশি ছাত্র। পূর্ববঙ্গের এক বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত পদচ্যুত হয়েছিলেন—কালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

ব্রিটিশ আঘাতের জবাব আসতে যে দেরি হয়নি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস।

১৯০৫ সালের আগস্টে আক্রমণের আশংকা থেকেই ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটা তহবিল স্থাপন করেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং ডাক্তার এস. কে. মল্লিক। সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-বর্জনের আবেদন প্রচারিত হয় কৃতী ছাত্রদের ডাকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশান স্কলার বিনয়কুমার সরকার।

কার্লাইল সার্কুলারের উত্তরে এল ৪ঠা নভেম্বর ১৯০৫-এ শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি। শচীন্দ্রপ্রসাদ ও রমাকান্ত রায় রংপুরে গিয়ে প্রথম ন্যাশনাল স্কুল উদ্বোধন করলেন ৮ই নভেম্বর। কলকাতায় তখন অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছিল ছাত্র-সমাবেশ—ফিল্ড্ ও অ্যাকাডেমি ক্লাবের মাঠে ও গোলদিঘিতে। জাতীয় শিক্ষার সাহায্যে ৯ই নভেম্বর সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন, ১৭ই নভেম্বরের সভায় পান্তির মাঠে কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'রাজা' আখ্যায় ভূষিত করে। কয়েক দিনের মধ্যে সতীশ-

চন্দ্রের অন্তরঙ্গ মনোমোহন ভট্টাচার্যের মারফৎ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী কিছু পরে দিয়েছিলেন আড়াই লক্ষ টাকা। রাজোচিত এই তিন দান জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আর্থিক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় বলা চলে।

১১ই নভেম্বর ১৯০৫-এর ছাত্রসভা সেদিনের এক প্রখ্যাত নেতা আশুতোষ চৌধুরীকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। ১৪ই তিনি নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের আহ্বান করলেন এক বিশেষ বৈঠকে। ১৬ই নভেম্বর গণ্যমান্যদের এই সভায় গঠিত হয় এক অস্থায়ী সমিতি যার উপর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভার দেওয়া হল। যে মডারেট নেতারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রথম প্রভাব দেখা গেল একটি ব্যাপারে—পরীক্ষা বর্জনের আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত দুই পথই খোলা রাখার ইচ্ছা এতে প্রকাশ পায়। চরমপন্থীরা যে এটা পছন্দ করেননি তার প্রমাণ ২৪শে ও ২৬শে নভেম্বরের জনসভা যাতে বক্তৃতা দেন বিপিনচন্দ্র পাল ও লিয়াকত হোসেন। প্রথম থেকেই আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই চোখে পড়বার মতন ব্যাপার।

নেতাদের দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১০ই ডিসেম্বর। সেদিন কিন্তু আবার আর এক কমিটি গঠিত হল বাস্তব ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য। নেতাদের কাজ চলছিল আশ্চর্যজনক মন্থর গতিতে—তাঁদের কাজের ধরনধারনই সম্ভবত এই ধাঁচে চলে। অবশেষে তৃতীয় ও চূড়ান্ত বৈঠক হল একেবারে ৯২ দিন পর—১১ মার্চ, ১৯০৬ সালে। সেদিন শেষ পর্যন্ত গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, যার বার্ষিকী হিসাবে প্রতি বৎসর এই দিনটিই পালন করা হয়ে থাকে।

৪

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা-পত্রে পূর্ব-কথিত পাঁচটি অঙ্গই একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, যদিও জন-শিক্ষার উপর সাক্ষাৎভাবে জোর পড়েনি। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বল্লেন যে, শিক্ষাকে করতে হবে চিত্তাকর্ষক, সহজবোধ্য, বাস্তব, এবং প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় কম সময়সাপেক্ষ। বলা হল যে জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সংগ্রাম না করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এর মধ্যেও কি মডারেট নেতাদের প্রভাব ছিল ?

পরিষদের মধ্যেই কয়েকদিনের মধ্যে একটা চিড় দেখা দেয়। অধিকাংশ সদস্যের মতে শিক্ষা চলবে ত্রিধারায়—সাহিত্যাশ্রিত, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং টেক্‌নলজি-(three dimensional : literary, scientific, technical)। সংখ্যাল্পদের মত ছিল যে যুগপৎ ত্রিধারায় শিক্ষা বড় বেশী উচ্চাশার পরিচয় ; আপাতত বেছে নিতে হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি, অর্থাৎ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা দরকার দেশের প্রধান স্বার্থ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যাপারে, অবশ্য তার জন্য

কিছুটা বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

১৯০৭ সালের ২৫শে জুলাই শেষোক্ত দল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন—টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা সংগঠন সমিতি। এঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিত্তবান তারকনাথ পালিত। তাঁর অর্থসাহায্যে তাঁরই ৯২, আপার সার্কুলার রোড ভবনে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের পত্তন হয়; প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমথনাথ বসু। বলা যায় যে এই ইন্‌স্টিটিউটের সাক্ষাৎ বংশধর হল সুবিখ্যাত যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

অপরদিকে সংখ্যাধিক দল বৌবাজারে খুললেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল, ত্রিধারায় শিক্ষা দেবার জন্য। প্রথম অধ্যক্ষ স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ, আর প্রথম দুতিন বৎসর কর্ণধার ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁদের ত্রিধারার উত্তরসাধক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নয় কি?

দুভাগে বিভক্ত হবার পিছনে কি জাতীয় শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোনও কারণ ছিল? সমসাময়িক কিছু চিঠিপত্রে (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখের লেখা) এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ডায়েরিতেও ইঙ্গিত পাই যে জাতীয় পরিষদ থেকে বাদ দেওয়া হয় কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে—তালিকাতেও কয়েকটি প্রত্যাশিত নাম দেখি না, যেমন কৃষ্ণকুমার মিত্র ('সঞ্জীবনী' সম্পাদক, যিনি কলকাতায় প্রথম স্কুল খোলেন বহিষ্কৃত ছাত্রদের জন্য), শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু (অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা), ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ইত্যাদি। বাদ-পড়াদের মধ্যে আবার অনেকে ছিলেন ব্রাহ্ম।

আমার শিক্ষক হারাণচন্দ্র চাকলাদারের প্রবন্ধে (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে) এর একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছি। শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাড়াও মতভেদ দেখা দিয়েছিল নাকি ধর্মশিক্ষা নিয়ে। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মবন্ধুরা সম্ভবত ভয় পেয়েছিলেন যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি একটা ঝোঁক প্রকাশ পাবে, ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠবে। লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত পরিষদে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠলেন না। আশঙ্কার পিছনে কিছুটা যুক্তি থাকাও বিচিত্র নয়।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোড়া থেকে ধর্মপ্রবণ ছিলেন সন্দেহ নেই, পরে সংসার ত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় তিনিই ছিলেন কাণ্ডারী। ভাগবত চতুষ্পাঠির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—'হিন্দু চিন্তা, জীবন ও আচরণের সম্যক শিক্ষা দান'। 'ডন' পত্রিকা তার অন্যতম আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে—'হিন্দু জীবন, চিন্তা ও ধর্মের সবিশেষ অনুধাবন'। সতীশচন্দ্রের বন্ধু বার্ডউড তাঁর চিঠিতে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষ বলতে তিনি বোঝেন 'হিন্দু ভারত,' তার অনুশীলন করা উচিত নিজস্ব 'আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির' সম্পদ। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা 'আর্য জ্ঞান' সাধনার কথা বলেছিল। আর জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা-পত্রে দেখতে পাই ধর্মশিক্ষার প্রস্তাব।

হয়ত বিচলিত হবার বিশেষ কিছু ছিল না। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অবশ্য তাঁর দানে একটা সর্ত করেন যে বার্ষিক সুদের এক-দশমাংশ খরচ করতে হবে হিন্দু ছাত্রদের ধর্মশিক্ষায়। সেই মতন ব্যবস্থাও হয়েছিল; পরবর্তী আর এক দাতার দানে গীতা অধ্যয়নে কৃতিত্বের জন্য বিশেষ পুরস্কারের প্রবর্তন হয়; হিন্দু ছাত্রদের ধর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা-ও দিতে হ'ত। কিন্তু পরিষদ প্রস্তুত ছিল অন্য ধর্মাবলম্বীদের-ও নিজ নিজ ধর্মে শিক্ষা দিতে, যদি সে-জন্য নির্দিষ্ট দান পাওয়া যেত। সংখ্যাল্প অন্য ধর্মের অনুগামীদের হয় অর্থবল ছিল না, কিম্বা এ সম্বন্ধে ছিল আগ্রহের অভাব। আবার কারও কারও হয়ত মত ছিল যে শিক্ষাক্রমের সঙ্গে ধর্মমতকে মিশিয়ে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

৫

জাতীয় শিক্ষা চলল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে। বৌবাজারে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ ও স্কুল ত্রিধারায় শিক্ষার প্রচেষ্টা করল। আর ৯২, আপার সার্কুলার রোড (পরে যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করে) বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট বলা যায় দেড়-ধারায় শিক্ষা চালায় (টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা ও কিছুটা বিজ্ঞান)।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে প্রথম বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, তিনি পদত্যাগ করেন সক্রিয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে। তাঁর কর্মভার নিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিন্তু কিছুদিন বাদে তিনিও সরে গেলেন কি কারণে জানি না, হয়ত বা ধর্মজীবনের তাগিদেই। ভিড় করে এসেছিলেন কৃতী শিক্ষকেরা, যাদের মধ্যে দেখি মারাঠি-বাঙ্গালী সখারাম গণেশ দেউস্করকে; ধর্মানন্দ কোশাম্বিকে (যাঁর পুত্র আমাদের যুগের প্রখ্যাত পণ্ডিত কোশাম্বি); রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয়কুমার সরকার, হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রভৃতিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্র-স্রোত শুকিয়ে গেল। প্রাথমিক রিপোর্টগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন লোপ পেয়েছিল মরীচিকার মধ্যে। এমন কি নন্-কো অপারেশনের যুগে প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভের সময় পর্যন্ত ছাত্রের দল জাতীয় পরিষদের দিকে ভিড়ল না।

পক্ষান্তরে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট সফল হয় অনেকাংশে। বিনয়কুমার সরকার একে মিস্ত্রির তৈরির কারখানা বলে উপহাস করলেও মনে হয় সংকীর্ণতর পথে চলার কিছুটা সুবিধা আছে। স্পষ্টতই লোকের বেশি আগ্রহ ছিল ব্যবহারিক টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার দিকে, বাস্তব প্রয়োজনের দিকে। সেদিন ব্যাপকতর শিক্ষার পরিকল্পনা হয়ত বা কিছুটা ধোঁয়াটে মনে হয়েছিল। আর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা অবশ্য তখন অন্যত্র সহজলভ্য ছিল না।

১৯১০ সালে দুই শাখা ঘটনার চাপে—কেমন স্থানাভাবে—একত্র হয়ে যেতে বাধ্য হয়। দুটি প্রতিষ্ঠান মিলিত হল ৯২, আপার সার্কুলার রোডে, জাতীয়

শিক্ষা পরিষদের কর্তৃত্বেই। প্রধান কাজ 'মিস্ত্রির বানানো', তবে তার সঙ্গে রইল নানা বিষয়ে অধ্যাপকের পদ, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা, কিছুটা গবেষণার কাজ, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য লোক পাঠানো ইত্যাদি।

১৮০৬-এর উচ্চ আশা অনেকটা ব্যর্থ হয়ে গেল স্বীকার করতে হবে। অবশ্য, স্বদেশী আন্দোলনের সকল দিক সম্বন্ধেই কথাটা প্রযোজ্য। জাতীয় শিক্ষার আশাভঙ্গের কারণ কি?

প্রথমে মনে রাখতে হবে একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা। ন্যাশন্যাল ডিগ্রির বাজারে কোনও মূল্য ছিল না, এতে দুঃস্থ বাঙালীর চাকরি জোটানো ছিল অসম্ভব। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার তকমার বরং কিছুটা দাম ছিল, অন্যত্র কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুন। কিন্তু সেখানেও বিপদ। স্বদেশী আমলে প্রচণ্ড আশা জেগেছিল যে দেশে এবার প্রভূত শিল্পোন্নতি হবে, শিল্পে প্রচুর চাকরি জুটবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, শিল্পোন্নতিও বিশেষ কিছু এগোতে পারল না।

দ্বিতীয় কথা, দেশের বিরাট বেসরকারি কলেজগুলি জাতীয় শিক্ষার ডাকে সাড়া দেয় নি। আন্দোলনে প্রবল প্রত্যাশা ছিল যে অসংখ্য ছাত্র সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন পতাকার নিচে সমবেত হবে। এরা শেষ পর্যন্ত গোলাম-খানার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামখানার মধ্যেও আমূল বদল এসে পড়ে, সেখানে নায়ক হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কখনই জাতীয় শিক্ষার আওতায় আসেন নি, তাঁর পরিকল্পনা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন করে ঢেলে সাজানো। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর সহায় হয়। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র থেকে রূপান্তরিত উচ্চ শিক্ষাদানের কেন্দ্রে, বাংলা ও ভারতীয় অন্য ভাষা চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা হল; ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় হয়ে উঠল পরিমার্জিত ও সম্প্রসারিত। তারকনাথ পালিত ও পরে রাসবিহারী ঘোষের বিপুল দান সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে প্রথম প্রকৃত বিজ্ঞান কলেজ। দিকে দিকে গবেষণার পথ খুলে গেল; বহু সুপণ্ডিত আমন্ত্রিত হয়ে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করলেন; আর সরকারি কর্তৃত্ব থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অনেকাংশে মুক্ত করাও সম্ভব হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট ঢেউও বিশ্ববিদ্যালয়কে টলাতে পারেনি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কীর্তি কিন্তু কিছু পরের কথা অথচ ১৯১০-এর আগেই জাতীয় শিক্ষা অভিযান স্তিমিত হয়ে আসে। এর একটা কারণ কি পরিষদ-নেতাদের রক্ষণশীলতা? ১৯০৬ সালে ছাত্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ার পরমুহূর্তে জাতীয় পরিষদ যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে নি, হয়ত বা মডারেট নেতাদের অতি সাবধানতার জন্য। অনুকূল সময় পার হয়ে গেলে সাফল্য দুষ্কর হয়ে ওঠে। মফঃস্বলে বহু জাতীয় নূতন স্কুল চরমপন্থী প্রভাবের আওতায় পড়ল—তারা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্বীকৃতি পর্যন্ত চাইল না।

তাদের পরিচালিত করতে থাকল স্থানীয় লোকেরা, অথবা পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত বিপ্লবী সমিতিগুলি—যার জন্যে বিদেশী সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে (জাতীয় পরিষদকে সরকার আমলেই আনে নি)। পরিষদের কর্ণধারেরা মফঃস্বল স্কুলে রাজনীতি আটকাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন, যে জন্য একদা তাঁদের বিজ্ঞপ্তিকে অরবিন্দ ঘোষ 'স্বদেশী রিজলি সার্কুলার' বলে বিদ্রূপ করেন। এই জন্যই কি অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর প্রখ্যাত ব্রজমোহন কলেজকে জাতীয় পরিষদের ছত্রছায়ায় আনতে চান নি?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে প্রবীন বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো পরবর্তী লেখায় জাতীয় পরিষদের তথাকথিত দুর্বলতার সমালোচনা করেছিলেন। হেমচন্দ্র অবশ্য তীব্র মন্তব্যে পারদর্শী ছিলেন, কাউকে রেহাই দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না, তাঁর লেখাও সমসাময়িক নয়, অনেকটা afterthought মাত্র। তবু তাঁকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। হেমচন্দ্রের মতে জাতীয় শিক্ষা সেদিন খুব নূতন কিছু এনে দিতে পারে নি; দেশের প্রকৃত প্রয়োজন ঠিক ধরা পড়ল না; প্রচলিত ব্যবস্থারই অনুকরণ করা হয়েছিল অনেকটা; অযথা অতীত-পূজা প্রশ্রয় পেয়েছিল; আর মাতৃভাষার মাধ্যম হয়েছিল প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলিত। আত্ম-সমালোচনার সময় তাঁর কটু উক্তিও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

৬

অথচ ইতিহাসে আদর্শ সব সময়ই বাস্তব অবস্থার চাপে কিছুটা সংকুচিত হতে বাধ্য, উচ্চ আশা কখনই ঠিক পূর্ণ হয় না। আমাদের প্রত্যাশাকেও তাই নিচু তারে বাঁধতে হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অনেক কিছুই করে উঠতে পারেনি; পেরেছিল বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু সেদিন যতটা পাওয়া গেল তাই বা উপেক্ষা করি কোন্ যুক্তিতে? আমরা কি ভুলতে পারি বিদেশী সরকারের আয়ত্তের বাইরে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার প্রবল সাহসিক সংগ্রাম, দেশ-বাসীর আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তোলার কঠিন লড়াই, অন্তত কিছুটা আংশিক সাফল্য, স্বতন্ত্র টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার দীপটুকু বছরের পর বছর জ্বালিয়ে রাখা, নেতাদের বাদ দিয়েও সাধারণ কর্মীদের অশেষ আত্মত্যাগ? এই বা সামান্য কি? ইতিহাস কি একে ভুলতে পারে?

আজ স্মরণ করি একদল বীর শিক্ষক ও ছাত্রকে যাঁরা সাংসারিক স্বার্থকে ত্যাগ করার জোর দেখাতে পেরেছিলেন (কজন পারে?), জাতীয় শিক্ষার আদর্শের গর্বিত রূপটি অন্তত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, অশেষ কষ্টের ভিতর জ্ঞানের রাজ্যে খানিকটা সম্পদ জোটাতে পেরেছিলেন। শত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ইতিহাসে তাঁরা অমর। আজ প্রকৃত জিজ্ঞাসা এই যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি তাঁদের সাধনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হতে পারছে? না পারলে বার্ষিকী উৎসব আজ অর্থহীন।

সম্পূর্ণতার খাতিরে ১৯১০-এর পরবর্তী দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। তারকনাথ পালিত বিমুখ হলে তাঁর বাড়ী ছেড়ে শিক্ষা পরিষদ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলি আশ্রয় পায় মানিকতলা পঞ্চবটি ভিলাতে (অক্টোবর ১৯১২)। সালে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজকে একটা ক্ষীণ সংস্করণে রূপান্তরিত করতে হল, নাম হল বেঙ্গল ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি। ১৯২০-তে এটাকেও উঠিয়ে দিতে হল, বাকি থাকল কেবল টেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউট। এটা বাঁচানোও হয়ত দুঃসাধ্য হত যদি রাসবিহারী ঘোষ বারো লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি না দিতেন (১৯২১)। এবার মোড় ফেরে বলা চলে। ১৯২২ সালে কলকাতা করপোরেশন শহরের উপকণ্ঠে একেবারে একশো বিঘা জমির দখল দেয় ইন্স্টিটিউট্‌কে নিজস্ব আবাস ও কর্মক্ষেত্র জোগাবার জন্য—এই জমিতে জাতীয় পরিষদের ষোড়শ বার্ষিকীর দিন অরবিন্দ ভবনের পত্তন হল, যে-গৃহ আজও সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯২৪-এ ইন্স্টিটিউট অবশেষে আশ্রয় পেল নিজের জমিতে, নিজস্ব আলয়ে। ১৯২৭ সালে আরম্ভ হয় করপোরেশনের বার্ষিক অনুদান—এ টাকা সংগ্রহে সহায় ছিলেন ইতিহাসবিদ নরেন্দ্রনাথ লাহা। ১৯২৮-এ টেক্‌নিক্যাল ইন্স্টিটিউট নামান্তরিত হয় যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্‌নলজিতে। পরিচালনার ভার অবশ্য ১৯১০ থেকেই ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উপর। ১৯২৯ সালে করপোরেশন থেকে আরও জমি পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করে ; তার ছাপ সরকারী স্বীকৃতি থেকেও শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত থাকেনি ; এমন কি কোনও কোনও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাকে মেনে নিতে আরম্ভ করল। দেশ স্বাধীন হবার পর সম্ভব হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদি পরিকল্পনার পুনরুজ্জীবন। ১৯৫৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা একে বাস্তব রূপ দিল বলা চলে।

৭

কয়েকটা প্রশ্ন ও সমস্যা তুলে আজকের আলোচনা শেষ করি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আজও বর্তমান ; বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতেও তার অশেষ গুরুত্ব। পরিষদের সংগঠনকে কি আরও প্রসারিত করা চলে না ? অনেকে মনে করেন যে এটা একটা সীমিত গোষ্ঠী মাত্র। অতীতে একেবারে গোড়াতে এই ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। সংগঠন বিস্তারিত করলে নিশ্চয়ই কিছুটা বিপদের ঝুঁকি থাকে। কিন্তু সঙ্কুচিত রাখলেই কি বিপদ কাটে ?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যদি আদি ত্রিধারার বাহক হয় তবে বিভিন্ন ধারা বা ফ্যাকাল্‌টিকে তুল্য মর্যাদা দেওয়া উচিত নয় কি ? আমাদের সময়ে অন্তত চোখে পড়ত যে অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান এঞ্জিনিয়ারিং শাখার একটা ঝোঁক আছে গোটা প্রতিষ্ঠানের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপনের।

আদিযুগে একটা ধারণা ছিল—বিভিন্ন ধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও

পারস্পরিক সাহচর্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনায় দেখেছিলাম এক সুন্দর ব্যবস্থা—যেমন আর্টস্-এর ছাত্রদের কিছুটা বিজ্ঞান শিক্ষা ; বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজিতে কিছুটা ইতিহাস প্রভৃতি শেখানো। তখন একে বলা হত General Knowledge। এই বিশেষত্ব আজ লোপ পেয়েছে কথাটা কি সত্য ? সত্য হলে একে পশ্চাদপসরণ বলতেই হবে।

শেষ প্রশ্ন—বাংলা মাধ্যমের কি হল ? বিশ্বাস করি না যে বাংলায় সব কিছু শেখানো আজও অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ বসু উচ্চ গণিত শেখাতেন কি করে ? বিদেশী শব্দ প্রয়োজন মত বাংলা বানানে ব্যবহার করা একেবারেই শক্ত নয়। বিজ্ঞানের Symbol-গুলি তো আন্তর্জাতিক হরফে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। ইউরোপে এক দেশের টেক্‌নিক্যাল শব্দ অন্য ভাষায় চলে কি করে ? ভাষার বিশেষত্ব হল ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, কিছু কিছু বিশেষণ, বাক্য সংগঠন। প্রয়োজন মতো বিদেশী বিশেষ্য আহরণ করতে কোন বাধাই নেই। ইংরেজি আবশ্যিক ভাবে শেখা এখনও অপরিহার্য জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের জন্য। কিন্তু প্রয়োজনীয় হাতিয়ার রূপে আবশ্যিক ভাষা শেখা আর শিক্ষার বাহন এক বস্তু নয়। মনে পড়ে ইউনিভার্সিটির প্রথম খসড়া নিয়মাবলীতে দেখেছিলাম—ইংরেজিকে বাহন রাখতে হবে—'pending the introduction of Bengali as a medium।' Pending কি চিরকাল pending-ই থাকবে ? অবাঙালীরা সরল basic বাংলায় শিক্ষা নিতে পারবে না কেন ? আমাদের ছাত্রদের মতন তাদেরও ইংরেজি জ্ঞানই বা কতটুকু ? প্যারিসে গিয়ে কি আমরা আশা করি ইংরেজি-বাংলা-হিন্দিতে শেখানো ? পাঠ্যপুস্তকের অভাব। কিন্তু বাংলা মাধ্যম চালু হলেই পাঠ্য বই আসতে থাকবে, হয়ত বা বন্যার মতন। আরও আপত্তি শোনা যায়, কিন্তু এটাও সত্য যে জলে না নামলে সাঁতার শেখা অসম্ভব। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম দিনের আদর্শগত সাহস কি আজও ফিরিয়ে আনা চলবে না ?

প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহ হয়েছে তিনটি গ্রন্থ থেকে : (১) 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক' (২) উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় : 'জাতীয় শিক্ষার ইতিহাস' (৩) সুমিত সরকার : 'বাংলার স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩—১৯০৮)'।

তথ্য সাজানো ও মন্তব্য লেখকের।

অজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মচরিত

গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনী দেশী ও বিদেশী পাঠক মহলে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রশংসা ও নিন্দার বাদানুবাদ শোনা গিয়েছে নানাদিকে। তাই বইখানি হাতে আসামাত্র আদ্যোপান্ত দুইবার পড়ে দেখবার লোভ সামলানো গেল না। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই গ্রন্থ অনেকাংশে অসামান্য।

প্রথমেই চোখে পড়ে গ্রন্থকারের ভাষার দীপ্তি, লেখার প্রসাদগুণ, প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা। অনেকের মনে নীরদবাবুর ইংরাজি ঠিক আধুনিক ইংরাজ লেখকের পর্যায়ে পড়ে না, আমার মনে হয় এখানে সে-প্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর। লেখক যদি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলেই তাঁর স্টাইল সার্থক, প্রচলিত রীতি থেকে পৃথক হলেও সার্থক। নীরদবাবুর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য আছে পাঠককে তিনি স্পর্শ এমন কি অভিভূত করতে পারেন।

মৌলিক স্বকীয় চিন্তার যে-ছাপ আলোচ্য গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তাকেও অসাধারণ বলা উচিত। নির্ভীকভাবে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, প্রচলিত সংস্কারকে তার আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হন নি, জাত্যাভিমান ও আত্মতুষ্টির ভাবকে করেছেন অগ্রাহ্য, সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভূত অনেক গলদকে দিনের আলোতে টেনে আনতে চেয়েছেন। স্তোকবাক্যে আমরা অনেক সময় মন ভোলাই, বক্তৃতা ও কথায় প্যাঁচচুড়ের স্রোতে ভেসে চলি, নির্মম সমালোচনার কশাঘাতকে তাই শ্রদ্ধা করাই সঙ্গত। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনাতেও নীরদবাবু সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি অধ্যায়ের উল্লেখ করব—ভারতীয় রেনেসাঁসের জয়যাত্রা, মহানগরী কলিকাতা, ও জ্ঞানচর্চার উদ্বোধন শীর্ষক রচনাগুলি নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য।

ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ পাঠককে আকর্ষণ করে। গ্রন্থকার পাশ্চাত্ত্য জগতে 'অজ্ঞাত ভারতীয়' হতে পারেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রণশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা একেবারে অবিদিত নয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলের বাইরেও তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নিশ্চয় অপরিচিত পাঠক পর্যন্ত সহজে ভুলতে পারবে না। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্বদাই কৌতূহল জাগায়, লোক-চক্ষুর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আত্মচরিতের উদ্দেশ্য যদি আত্মপ্রকাশ হয় তবে এখানে লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে, এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ছাপার অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত নীরদবাবুর লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এই লেখা আত্মজীবনের ঘটনাসমষ্টি নয়; ব্যক্তিগত নয়,

---

* Autobiography of an Unknown Indian—by Niradchandra Chaudhuri (McMillan & Co.)

জাতীয় ইতিহাসই তাঁর আলোচনার বস্তু। বহু পরিশ্রমে ও বহু আয়াসে তিনি আমাদের অজ্ঞানতার মোহ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি এই যে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিমেঘমুক্ত স্থির সিদ্ধান্ত। (গ্রন্থের ১২৯, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫১৩ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু সুলিখিত মৌলিক ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হলেই কি সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য হয়ে দাঁড়ায়? সত্যের মাপকাঠি বস্তুনিষ্ঠা, অসাধারণত্ব নয়। মতভেদ অবশ্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য, কিন্তু গ্রন্থকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, নীরদবাবুর মতবাদ আংশিক একদেশদর্শী ও অনেকটা কল্পনাবিলাসী। তাঁর আত্মজীবনীর সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের আগাগোড়া একটা সুর ধ্বনিত হয়েছে—বাংলা তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতীয় জীবন আজ অধঃপতনের পথে চলেছে, নতুন প্রাণের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ইয়োরোপে স্পেংলার যে-বিভীষিকা দেখেছিলেন তারই অনুবর্তনে গ্রন্থকার তাঁর নিজের দেশে দেখছেন অবসান ও পতনের করাল ছায়া। মাথার উপরে ধ্বংস নেমে আসছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, যা কিছু মূল্যবান তাই আজ নষ্টপ্রায় (৪৮, ১২৯ পৃষ্ঠা)। প্রকৃত অবনতির যুগে আমরা বাস করছি, পুরুষত্ব আজ নিষ্প্রভ, সমালোচনার শক্তি লোপ পেয়েছে, চারিদিকে ক্ষয়ের চিহ্ন এগিয়ে আসছে (৩৬৪, ৩৩৪, ৪৪৪, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)। গ্রন্থকারের চোখে এই অধঃপতন কোনও সাবেকী স্বর্ণযুগের থেকে আধুনিক জগতের বিচ্যুতি নয়। সমাজের স্থিতিশক্তির পতন স্পষ্ট হয়েছে ১৯১৯-এর পর থেকে, ১৯৩০-এর পরে কলিকাতা আর তাঁর মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি (৪০৩, ২৫৯ পৃষ্ঠা)। তাঁর যৌবনের যুগেই বাংলার জীবনে নেমেছে অভিশাপ, সে-দুর্দশা সারা ভারতে সাম্প্রতিক বর্বরতার পুনরাবির্ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া (১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা)। পূর্ববর্তী যে-যুগের তুলনায় এই অধঃপতন সে-যুগ হল উনিশ শতকের পুনর্জাগরণের যুগ, বাংলার রেনেসাঁসের আমল, যার পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছিল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অর্ধ শতাব্দীতে। (২২১ পৃষ্ঠা)।

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের এই মূল্যনির্দেশ বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে অতিরঞ্জিত নয় কি? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ব্রিটিশ আমলে আমাদের মধ্যশ্রেণীর কীর্তির দুর্বলতার দিকটা অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্ধকলোনির জীবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে-জাগরণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপুটে যে-প্রাণস্পন্দন, তাকে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সমান পর্যায়ে তোলা দুরাশা বৈ কি। জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য, জন্মগত স্ববিরোধিতা আমাদের রেনেসাঁসকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' থেকে সংস্কৃতিবান বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যে-ছবি গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভাবটাই মনে উদয় হয় না কি? তার মধ্যে কি-

আমরা ইয়োরোপের পনের ষোল শতকের দুর্ধর্ষ মনের পরিচয় পাই? উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক নেতাদের মতন সিপাহী বিদ্রোহকে তিনি পুরাতন প্রতিক্রিয়া সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। মার্ক্সের দৃষ্টিতে তার যে-সবল দিকটা ধরা পড়েছিল, নীরদবাবুর চোখে তা অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

এখানে অবশ্য বলা যায় যে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় না হলেও আমাদের রেনেসাঁসই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলাধার। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মেনে নিলেও তার ক্ষীণপ্রাণভাব, স্ববিরোধিতা, স্বল্পপ্রসার ও মাত্র আংশিক উৎকর্ষের বিচার না করলে আমাদের কেবল কয়েকটা বাঁধা বুলির আশ্রয় নিতে হবে।

বাংলার রেনেসাঁসকে অতিরঞ্জিত করে গ্রন্থকার সাম্প্রতিক অধঃপতনের যে-চিত্র এঁকেছেন তাকেও একদেশদর্শী অতিকথন বলা চলে। গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে ভারতে নতুন কিছুই মাথা তোলে নি এ হল গায়ের জোরে প্রচার। গান্ধীজীর আমলে জনজাগরণ, দুঃসাহসিক ও স্বার্থত্যাগী বিপ্লবী অভিযান, পরবর্তী যুগে শ্রমিক বা কিষান আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংগ্রাম, কোনও কিছুই নীরদবাবুর সভ্যতার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাঁর মতে এ সমস্তই জাতীয় পতনের নির্দেশক। উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিত্র শক্তি গ্রন্থকারকে শ্রদ্ধায় অবনমিত করেছে দেখতে পাই। কিন্তু কোন্ যুক্তিতে আমরা এ যুগের অনেক মানুষের উদ্যম প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করব? আদর্শের ডাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন, অসীম সাহসে দুঃখকষ্টবরণ, সহযোগিতা, অধ্যবসায়, সংগঠনের শক্তি—এমন সাধনার অভিজ্ঞতা কি আমাদের চোখে পড়ে না, আজ কি তার এমনই অভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে? নীরদবাবুর অভিজ্ঞতায় এমন দৃষ্টান্তের পরিচয় না থাকলে সেটা তাঁরই দুর্ভাগ্য, জাতির নয়। আর সংস্কৃতিকে যদি দেয়াল-ঘেরা সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলেও কি বাংলা সাহিত্য ও ভারতীয় চিন্তা গত পঁচিশ বছরে অনেকটা পুষ্টিলাভ করে নি? কেবল কয়েকজন মহারথীর আবির্ভাবেই জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনা, নতুন ভাবধারা ইত্যাদির বিস্তারও সংস্কৃতির একটা দিক।

ভূমিকাতে গ্রন্থকার অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য সাধারণ সূত্রের সন্ধান, ব্যতিক্রমের নয়। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ যার প্রভাবে আসে তা কি ব্যতিক্রম না সাধারণ নিয়ম? গত দুই-তিন দশকের অনেক কিছু আলোড়নকে অযথা স্ফীত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশক্তির স্পন্দনকে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত। নৈতিক, মানসিক ও ব্যবহারিক পতনের যে-দৃশ্য গ্রন্থকারকে ব্যথিত করেছে, তার মধ্যে অনেকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সত্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের

অধোগমন, সমস্ত জাতির নয়। উপরতলার একটা স্তরের মধ্যে নীরদবাবু তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রকৃত হিউম্যানিস্টের মতন দৃষ্টি প্রসারিত করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, একটা গোষ্ঠীর অধোগতি সারা জাতির পতনের সমার্থক নয়। অবশ্য এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা, ইতিহাসকে দেখবার রকমফের। জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবুর অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা লক্ষণীয়। লোকের ভিড়কে তিনি শুধু অপছন্দ করেন তাই নয় (২৬০ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনে তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন গণঅভ্যুত্থানে নয়, সামরিক সুসম্বদ্ধ বিদ্রোহে (২৪৯ পৃষ্ঠা)। গান্ধীযুগে জনবিক্ষোভ তাঁর মনে এনেছিল ক্রোধ (৪০৭ পৃষ্ঠা)। ছাত্রাবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললেও মনে হয় যে সাবেকী কোনও ঐতিহাসিকের মতন জনতা তাঁর কাছে canaille মাত্র। শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের কথা নয়, ইতিহাস আলোচনাতেও তিনি এই দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন।

ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনায় গ্রন্থকার বাস্তবনিষ্ঠ পন্থার আদর্শ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠাও যে অচল অনড় পদার্থ নয়, আদর্শ যে শুধু কথায় কাটে না সে-সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ নন। তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যেন গ্রীক ঐতিহাসিক থিউকিডিডিস জাতি বা দলমত প্রভাবের ঊর্ধ্বে (৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিম্বা যেন বিশপ স্টাবসকে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে পারে নি (৩৫১ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে কোনও ঐতিহাসিক একথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। যে ফরাসী ঐতিহাসিকের বাণী তিনি একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ইতিহাস কথা বলছে, তাঁর সেই দম্ভ আজ আর কেউ শিরোধার্য করে না। দেশ-কাল-শ্রেণী-নির্বিচারে ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দাবি নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা উনিশ শতকের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যে-মতে মনে হত যে রাষ্ট্র একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি অথবা বুদ্ধিবাদ বুঝি সামাজিক পরিবেশের ঊর্ধ্বস্থিত সনাতনী এক প্রক্রিয়া। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে অগ্রাহ্য করবার কথা উঠছে না, কিন্তু ঐতিহাসিকের ফতোয়া মাত্রকেই বিচারের বাইরে রাখা চলে না।

সুতরাং নীরদবাবুর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বস্তুনিষ্ঠার কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রয়োজন। আধুনিক যুগে ইয়োরোপের যে-জয়যাত্রা শুরু হল তার পিছনে ইসলাম-বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রভাব গ্রন্থকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন (৫০৬ পৃষ্ঠা) অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আর্থিক প্রেরণা যে ইয়োরোপীয়দের মুসলিম-বর্জিত আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপর তিনি জোর দিলেন না। স্পেংলারের প্রতিধ্বনি করে তিনি গোটা ইয়োরোপীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রায় বলে মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ পৃষ্ঠা), কিন্তু ইয়োরোপের অনেকাংশে প্রাণ-শক্তির জোয়ার তাঁর নজরে পড়ে নি কেন না ইয়োরেশিয়ার অনেকটাই নাকি আজ সত্যভ্রষ্ট—বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের এই নমুনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর

চার্চিলের মতন 'জিনিয়াস' নাকি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য চূর্ণ করে দিতে পারতেন (৩২০ পৃষ্ঠা)। আর আমাদের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল সূর্যস্বরূপ আমেরিকার চারিদিকে গ্রহের মতন প্রদক্ষিণ (৫১০ পৃষ্ঠা)। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত আশা ভরসার কথা বোঝা সহজ, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনার পাদটীকা হিসাবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর নির্বিচার অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

দেশের ইতিহাসের আলোচনাতেও তেমনি বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব দেখি না। গ্রন্থকার ধরে নিয়েছেন যে গোষ্ঠীগত হিন্দু আত্মপ্রত্যয় জাতীয়তাবোধের নামান্তর (৪০৯ পৃষ্ঠা); সেই যুক্তিতে তাহলে মধ্যযুগের ইয়োরোপে ক্রিশ্চান সত্তাকেও জাতীয় মনোভাব আখ্যা দিতে হয়। হিন্দু-সাধারণের চোখে নাকি দেবদেবীরা মানুষের উৎকোচের নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ পৃষ্ঠা), অথচ সকল ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আনা সম্ভব। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ লেখকের কাছে স্বাভাবিক সত্য, এ দেশে দুই জাতির তত্ত্ব তিনি ঐতিহাসিক 'ফ্যাক্ট' বলে গণ্য করেছেন (২৩১ পৃষ্ঠা), আবার বাংলা-দেশের সাম্প্রতিক দ্বিখণ্ডন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অন্যায় ও অস্বাভাবিক—এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত ও উদার মনে হয়েছে, গান্ধীবাদকে তিনি দেখেছেন প্রাচীন প্রতিক্রিয়া ও অন্ধসংস্কারের স্তূপ হিসাবে, দ্বিতীয়ের প্রভাবে তাঁর মতে প্রথমটির সুকুমার ঔদার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (৩৩৫, ৪৪১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু জাতীয় মধ্যশ্রেণীর বিবর্তনের দুই পর্যায়ের প্রতীক এই দুই যুগের মধ্যে যে-সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে তার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠার নামে এই ভাবে পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদী বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ।

নীরদবাবুর ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণ হয়েছে অতিরঞ্জিত, সামাজিক স্তর-বিশেষের সাম্প্রতিক অধোগতি সমগ্র জাতির পতনে রূপান্তরিত হয়েছে, আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতায় সমাজবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়েছে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, স্বদেশের সমাজবিবর্তন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এখানে তাঁর গুরু টয়েনবি।

ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে টয়েনবি মূলত ধর্মগত সংস্কৃতির প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে তাই ইয়োরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিককাল একই পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজের রূপগ্রহণ করেছে। এইরূপে নির্দিষ্ট সমাজগুলির উত্থান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ সূত্র নির্ণয় তাঁর লক্ষ্য। নীরদবাবুও ভারতের ইতিহাসে তিনটি সংশ্লিষ্ট অথচ তাঁর মতে স্বতন্ত্র সভ্যতার সন্ধান পেয়েছেন—হিন্দু, ইসলামি ও ইয়োরোপীয়। প্রত্যেক সভ্যতার লীলাস্থল ভারতের মাটি হলেও সৃষ্টিকর্তা হল বহির্জগতের একটা প্রবল আলোড়ন—

অর্থাৎ আর্যজাতির দিগ্বিজয়, ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্য-বিস্তার। সুতরাং ভারতে পর পর তিনটি সভ্যতার চালক ও শাসক-শক্তি হল বহিস্তর বিদেশী সংস্কৃতি। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরাজি পর পর তিন পর্যায়ের তিন সংস্কৃতির বাহন। খাস সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতের তিন সভ্যতাকে ক্রমশ নিম্নগামী বলা চলে, রাষ্ট্র-সংগঠনের দিক দিয়ে তারা আবার ধাপে ধাপে উচ্চতর হয়েছে—কিন্তু আসল সত্তা ও স্বভাবের বিচারের প্রত্যেকেই বিদেশী, শুধু বহিরাগত নয়। প্রতি পর্যায়ে সভ্যতার বাহন হল বিদেশী শাসক ও সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর ও অনুচরেরা। দেশের অধিকাংশ লোক মনে মনে তখনকার সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারে নি, সর্বদাই সভ্যতার সঙ্গে 'অসভ্যতা'র একটা লড়াই চলেছে। এখানে অমার্জিত অসভ্য লোকেরা অবশ্য হল জনসাধারণ, টয়েন্‌বির ভাষায় আভ্যন্তরীণ প্রলেটেরিয়াট। কালক্রমে এক একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে—প্রধানত দেশের নির্মম জলবায়ু আবহাওয়ার চাপে, খানিকটা বিদেশী সৃষ্টিকর্তার অবসাদ ও শক্তিক্ষয়ে। চালক ও শাসক শক্তির পতন এসেছে 'অসভ্য' জনসাধারণের চাপে নয়, কারণ এই সাধারণ লোক সর্বদাই সভ্যতার বাহনদের তুলনায় নিকৃষ্টতর, দেশের গুণে তারা আরও বেশী নির্জীব। তবে একটা সভ্যতার যখনই সংকট এসেছে তখনই এই সাধারণ লোকে হট্টগোলের সৃষ্টি করে, সে-বিশৃঙ্খলা যেন সিংহচর্মাবৃত গর্দভের আস্ফালন। সভ্যতার পুনর্জন্ম আসতে পারে আবার কোনও বিদেশী সংস্কৃতির প্রসারে। গ্রন্থকার-নির্দিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসের ছক বা প্যাটার্ন্ হল এই।

প্যাটার্নের মাহাত্ম্যই এই যে তাতে একটা মনের ছবি আঁকা চলে, যে-তথ্য ছকে পড়ে না তাকে অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট, বিপরীতমুখী তথ্যের আপেক্ষিক বিচারের প্রয়োজন থাকে না। তাই বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির সম্ভাবনা গ্রন্থকার এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্যজাতির আগমন পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই লক্ষণীয়, তবু হিন্দু সভ্যতা হল বিদেশী আর্যমার্কা অথচ অন্যান্য অনুরূপ অঞ্চলে টয়েন্‌বি নির্দিষ্ট হেলেনিক, পশ্চিম ইয়োরোপীয়, পূর্ব ইয়োরোপীয়, ইরানী ইত্যাদি সমাজে আর্যপ্রভাব আর বিদেশী রইল না—এও কম বিচিত্র নয়। বৈদিক ও পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বহিরাগত এক ধাক্কার ফল—দেশের মাটি ও সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা বিরোধের—এ তত্ত্বও চমকপ্রদ। গোটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তিটা কোন্ বিদেশী অনুপ্রেরণায় তাও রয়ে গেল অব্যক্ত। নীরদবাবু ব্যাখ্যায় ভারতে বহিরাগত ধাক্কাগুলি বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যার First Causeকে মনে আনে। ভারতীয় আর্য সমাজে বহির্বিশ্বের উপর নির্ভর নগণ্য, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের সঙ্গে ধর্ম ও আইনগত যোগটা প্রত্যক্ষ কিন্তু সেইজন্য টয়েন্‌বি পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান সমষ্টিকে এক সমাজের অন্তর্গত করতে ভরসা পান নি। খাঁটী মুসলমান ধর্ম ভাষা, রীতি-নীতি যদি মধ্যযুগীয়

ভারত সভ্যতার প্রধান নির্দেশক হয়, তবে সে-যুগের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে দেখবার প্রয়োজন কোথায় ? মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাবকে এভাবে তুচ্ছ করে দেখবার অর্থ কি ?

হিন্দু ও মুসলমান আমলকে ব্যাপ্ত করে এক ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রন্থকার-কল্পিত দুই পৃথক সমাজের থিওরির চাইতে কম শক্তিশালী নয়। কারণ ভারতীয় জনগণের জীবন যাত্রার ধরন, গ্রামসংগঠন, সমাজসংস্থান মোটামুটি একই ধরনের থেকে যায় বহুদিন ধরে। প্রচলিত মতে সে-সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে আজও বিদ্যমান। আর যদি বিরাট আর্থিক পরিবর্তনে সামাজিক আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যায় বলে স্বীকার করি, তবে ব্রিটিশ শাসনের প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়ায় নূতন ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে এ কথা বলা চলে। গ্রন্থকারের নির্দিষ্ট তিনটি পৃথক সভ্যতার অস্তিত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত হিসাবেই চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা।

আসলে মনে হয় ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে গৌণ কথা। গ্রন্থকারের মনের নিবিড় অনুভূতিকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার ইচ্ছা থেকে তার উৎপত্তি। কাম্য আদর্শের সন্ধানে প্রথম তিনি নিজেকে একটা চিন্তাজগতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তার দেশীয় উপাদান ছিল বাংলার নবজাগরণের রঙীন ছবি আর বিদেশী আশ্রয় ও পটভূমিকা হল ইয়োরোপীয় ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা দিক। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে জগৎ ভগ্নপ্রায়, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও অবসন্ন, নূতনের পদক্ষেপে ইয়োরোপও আজ আবর্তের মধ্যে এবং গ্রন্থকারের চোখে পথভ্রষ্টপ্রায়। এ অবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর মনে বাজছে যুগাবসানের সুর। যেহেতু সাধারণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্খ বর্বর জনতা মাত্র, সেই জন্য ভারত কিম্বা ইয়োরোপে আশার রেখা তাঁর কাছে অজ্ঞাত। নিজস্ব প্রাথমিক স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় এমন প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি তাই অনিবার্যভাবে দেখতে পান একমাত্র ধনিকতন্ত্রী আমেরিকায়। নীরদবাবু তাই পথ চেয়ে আছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক্ষায়—এই বিদেশী শক্তিই নাকি ভারত-উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ইতিহাস-দর্শন রচিত। ভারতীয় সভ্যতার অনুপ্রেরণা যদি বিদেশী সংস্কৃতিতে আরোপ করা যায় তাহলে ত্রাণকর্তা আমেরিকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমেরিকা তো ইয়োরোপীয় সভ্যতারই সন্তান। সুতরাং গ্রন্থকারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের তৃতীয় অর্থাৎ ইন্দো-ইয়োরোপীয় সভ্যতার এখনও সমাপ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমরা জোয়ার-ভাটার খেলা দেখছি মাত্র। আমেরিকার ইন্‌জেক্‌শনে আমাদের নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হবে। অতএব মাভৈঃ।

নীরদবাবু সান্ত্বনালাভ করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিত্র, এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁর স্থিরসিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী।

॥ পরিচয় : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ (১৯৫২) ॥

সংযোজনী টীকা

১। বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে

'বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। অনেকেই তীব্র সমালোচনা করেছেন লেখাটার, বিশেষত শিক্ষাজগতের বিদ্বজ্জনরা। এখন লিখতে বসলে আমি নিজেও লেখাটাকে হয়ত ঢেলে সাজাতাম। কিন্তু তাসত্ত্বেও পুস্তিকাটির প্রতিটা পুনর্মুদ্রণেই আমি মূল লেখাটার কোন পরিবর্তন করিনি বিশেষ কিছু কারণে।

এই ছোট পুস্তিকাটিতেই বাংলার রেনেসাঁস (Bengal Renaissance) অভিধাটা প্রথম ব্যবহৃত হয় (বাংলায় রেনেসাঁস : Renaissance in Bengal কিংবা বাঙালীর রেনেসাঁস : Bengali Renaissance ইত্যাদির বদলে)। তার পর থেকে বিভিন্ন লেখাপত্রে এই অভিধাটাই সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পুস্তিকাটি প্রথমবার ছাপা হওয়ার সময় এর বেশ কিছু অনুশিরোনাম বসিয়েছিলেন আমার বন্ধু মোহন কুমারমঙ্গলম। তাঁর স্মৃতিতে ঐ অনুশিরোনামগুলোও আর পাল্টাইনি আমি।

ডেভিড কফ্ উদারতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এই লেখাটাই উনিশ শতকের বাংলার 'নবজাগরণ'-এর কালবিভাগের প্রথম প্রচেষ্টা।

পুস্তিকাটি পণ্ডিতদের জন্য লেখা নয় বা কোন গবেষণার ভিত্তিতেও এটি রচিত হয়নি—সহজলভ্য কিছু রচনাপত্র থেকেই সংগৃহীত হয়েছে লেখাটার মালমশলা। উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপটটা জানা দরকার ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের এবং তাদের জন্যই লিখিত হয়েছিল এই পুস্তিকা। গত শতাব্দীর ঘটনাবলীর মার্কসবাদী বিশ্লেষণ করাও এর উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা ছিল ঐ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের জন্য মোটামুটি একটা চিত্র হাজির করা। যতই অপ্রতুলভাবে হোক না কেন, দুটো উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছিল—আমার দাবি শুধু এটুকুই।

ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে যে সাদৃশ্যটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, সেটা নিয়েই সবথেকে বেশি সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সাদৃশ্য সাদৃশ্যই, প্রতিরূপ নয়। নতুন কোন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, একটা নবজাগরণ বোঝানোর জন্য খোদ ইউরোপের ইতিহাসেও বারবার ব্যবহৃত হয়েছে রেনেসাঁস শব্দটা। যেমন, দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বা ক্যারোলিনীয় রেনেসাঁস—কিন্তু এই আন্দোলনগুলোকে কখনোই মহান রেনেসাঁসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা বা তুলনা করা হয় না।

আবার, খোদ ইতালীয় রেনেসাঁসেরও নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলই আর ইউরোপের ঐতিহাসিকদের তা অজানা নয়। ক্ল্যাসিকাল অতীতকে অতিরিক্ত মহিমান্বিত করে দেখানো এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার প্রতি ঘৃণার মধ্যেই এর নজির খুঁজে পাওয়া যায়। 'ইতালীয় রেনেসাঁসও মূলত মননশীল এলিটদের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল।

আমাদের রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতাগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলেও ১৯৪৬ সালে 'নোটস অন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস' লেখার সময় সেগুলোর কথা আমি উল্লেখ করিনি। ব্যাপারটা হয়ত চটজলদি অতি সরলীকরণ হয়ে গেছে। পরের দশকে, অর্থাৎ আজকের এই সমালোচনাগুলো শুরু হওয়ার আগেই কয়েকটি প্রবন্ধ এই সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি আমি, এখন মূল পুস্তিকাটির সঙ্গে এই প্রবন্ধগুলোও একসঙ্গে ছাপা হলো। আমার মতে বাংলার রেনেসাঁসের প্রধান সীমাবদ্ধতা তিনটি: (১) আমাদের নবজাগরণের প্রতিনিধিস্থানীয়দের অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনকে প্রগতির সমার্থক হিসেবে দেখেছিলেন। আধা-ঔপনিবেশিক পরাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বাঁধনে যে আমাদের বেঁধে রেখেছিল ইংরেজরা, সেটার ওপর তাঁরা জোর দেননি। (২) এদেশের ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের রেনেসাঁসের কর্ণধারদের দূরত্ব ছিল যোজন সমান। নিজেদের একটা আলাদা জগতেই বাস করতেন তাঁরা। (৩) আমাদের আন্দোলনের আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে হিন্দুসুলভ প্রবণতাটা ছিল একান্তই স্পষ্ট; ফলে দূরে সরে গিয়েছিল মুসলিমরা। এর ফল খুব ভাল হয়নি। সুবিধে হয়েছিল বিদেশী ইংরেজ শাসকদেরই।

পুস্তিকাটি যাদের জন্য লেখা, তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাদের রেনেসাঁসের প্রধান নায়কদের মহৎ কীর্তিগুলোই তুলে ধরা হয়েছে এই রচনায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই যুগের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জটিলতা, রেনেসাঁসের প্রধান নায়কদের ভুলত্রুটি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো আমি স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে গেছি।

২। 'রামমোহন রায়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা' প্রসঙ্গে

প্রবন্ধটির একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধনের ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পর্যালোচনার জন্য যে তথ্যগুলো পেশ করেছিলেন রামমোহন, শুধু সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাই রামমোহন রায়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে তার সামগ্রিকতায় বিচার করা হয়নি প্রবন্ধটিতে, অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেছে।

৩। 'ডেভিড হেয়ার' প্রসঙ্গে

আধুনিক ঐতিহাসিকরা ডেভিড হেয়ারের বিভিন্ন ভুলত্রুটির দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করেছেন। ব্যবসায়িক কাজকর্মে তার নৈতিক সততা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, শিক্ষাগত সুবিধালাভের জন্য যে-সব "প্রত্যাশী তরুণরা" তাঁর পিছনে ছুটত তাদের ব্যাপারে হেয়ারের একটা পৃষ্ঠপোষকতার ভান বা পিঠ চাপড়ানোর মনোভাব ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর দানগ্রহীতা এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছ থেকে যে সংশয়াতীত শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন ডেভিড হেয়ার, এ প্রবন্ধে সেটাই

তুলে ধরা হয়েছে। সে যুগের ইতিহাসের বাস্তব সত্য এটা। একে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই।

৪। 'ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল' প্রসঙ্গে

অল্পবয়সে নানান কথা শুনতে শুনতে আমাদের ধারণা হয়েছিল—ডিরোজিও এবং ডিরোজিওপন্থীরা ছিলেন অন্ধ ইংরেজিয়ানায় নিমজ্জিত একদল পথভ্রষ্ট মানুষ, আমাদের স্বদেশ ও দেশবাসীদের ব্যাপারে উদাসীন, ব্যক্তিগত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল এবং অসংযমী। এই প্রবন্ধে তাঁদের আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট যুক্তিভিত্তিক আদর্শবাদ, তাঁদের সাহস এবং ব্যক্তিগত সততার পক্ষসমর্থন করা হয়েছে। বর্তমানে কোন কোন মহলের ধারণা যে তাঁদের পক্ষসমর্থন করার অতি উৎসাহে আমি তাঁদের ওপর এমন সব আধুনিক বিপ্লবীসুলভ গুণাবলী আরোপ করেছি, যেগুলো তাঁদের প্রকৃত চরিত্রের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। আসলে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে দূরে এসে পড়লে ঐতিহাসিক ভারসাম্য রক্ষা করা বেশ দুরূহই হয়ে ওঠে, কেননা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের একটা নিজস্ব ধারণা থাকেই।